বুনোগাঙের চর



শ্যামল বৈদ্য

বুনোগাঙের চর

ভাষা
আগরতলা, ত্রিপুরা

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০১১
গ্রন্থস্বত্ব ঃ মেঘবিকা বৈদ্য
অক্ষর বিন্যাস ঃ ইনফোপ্রিন্ট, কৃষ্ণনগর, নতুনপল্লি, আগরতলা।

বুনোগাঙের চর

BUNOGANGER CHAR

A Bengali Novel

by Shyamal Baidya

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্ণধন আচার্য

'ভাষা'র পক্ষে প্রকাশ করেছেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী,
'শান্তি কুটির', কৃষ্ণনগর, নতুনপল্লি, আগরতলা-৭৯৯০০১, ত্রিপুরা থেকে।
মুদ্রণ কমলা প্রেস, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৬।
e-mail : bhasatripura@rediffmail.com
web : www.bhasa.co.in
ISBN : 81-8306-070-6
মূল্য ১২৫ টাকা।

আমার বাবা

গোপিকা রঞ্জন বৈদ্য-র পুণ্য স্মৃতিতে।

উপন্যাসটির সংলাপ বাংলা চলিত ভাষায় লেখা হয়েছে। কিন্তু যে অঞ্চলের কাহিনি এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে সেখানকার কথ্য ভাষা এটা নয়। উল্লেখিত অঞ্চলের যে সময়টাকে ফ্রেমে ধরা হয়েছে, সেইসময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা উদ্বাস্তুরা বাংলাভাষায় কথা বলতেন বটে। তবে সিলেট, নোয়াখালি, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলের লোকেদের ভাষা বাংলা হলেও উচ্চারণ, ধ্বনি ও বলার ঢং আলাদা। পাহাড়িদের বাংলা বলার ঢং সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে প্রতিটি অঞ্চলের ভাষাকে আলাদা করে ব্যক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তাছাড়া অনেক পাঠক আঞ্চলিক বাংলাভাষার সঙ্গে পরিচিত নন। ফলে সবার বোঝার সুবিধের জন্য উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সকলের মুখেই চলিত ভাষার যোগান দেওয়া হয়েছে। এতে হয়তো স্থানিক কিছু গন্ধ অনুপস্থিত থেকেছে, কিন্তু সামগ্রিক উপন্যাসের চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। তবে সচেতনভাবেই পুরো উপন্যাস জুড়ে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া বাক্য গঠনেও ঐ অঞ্চলের কথা বলার ভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলা চলিত ভাষা কোনও কোনও জায়গায় সামান্য হোঁচট খেয়েছে। তবু যদি উল্লেখিত অঞ্চলের মাটির ভাষা সম্বন্ধে পাঠকদের সামান্য ধারণা দিতে পারি আমার স্বপ্ন স্বার্থক হবে।

দুই মলাটের ভেতর এটা আমার প্রথম উপন্যাস। ফলে দুর্ভাবনা ছিলই। কিন্তু কাজটা সহজ করে দিলেন নানাভাবে সাহায্য করে অগ্রজ সাহিত্যিক প্রদীপ সরকার, কবি দিলীপ দাস ও কৃত্তিবাস চক্রবর্তী। তাঁদের অকৃত্রিম সাহায্য ছাড়া একাজ মোটেই সম্ভব হতো না।

ত্রিপুরার পাহাড়িদের সংস্কৃতি, ভাষা, আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত জ্ঞান থাকলেও তা উপন্যাস নির্মাণে প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। এই ঘাটতিটাও মিটিয়ে দিয়েছেন শ্রীমতী তন্দ্রা দেববর্মা, শ্রীমতী অজন্তা দেববর্মা ও দিলীপ দেববর্মা। আরও একজন রয়েছেন যাঁর কথা বিশেষভাবে বলতেই হয়, তিনি প্রমোদ শীল। তাঁর কাছ থেকে দেশ বিভাগের সময়ের অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। তমোজিৎ আচার্য পুরো উপন্যাসটি কম্পোজ করে আমার প্রাথমিক কাজগুলি অনেক এগিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়াও আরও অনেকেই রয়েছেন যাঁরা নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন লেখা শেষ করার জন্য। তাঁদের সবাইকেই আমি বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভাষা প্রকাশনীর সমস্ত বন্ধুদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখক

১

পিক্‌রাই বাজার থেকে সেই সকালবেলা গাড়ি ধরেছিল তারা। কিন্তু আভাঙ্গা এসে গাড়িটা মোরাম বিছানো রাস্তায় পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে জাগানো যায়নি। অগত্যা পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় রইল না। ভোলা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবল, এই দুর্গম রাস্তায় অরণ্যের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? চারিদিকে বাঘ ভাল্লুকের ভয়ঙ্কর উপদ্রব। অবশেষে ঘন্টাছড়া বাজার ধরার তাড়ায় ভোলা মন স্থির করে ফেলল, না, ফিরে গেলে চলবে না। বাজারটা ধরতেই হবে। নইলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ফলে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

খোলা আকাশ, সবুজ বৃক্ষরাজি ও উঁচু নিচু টিলা লুঙ্গার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে রঘুর আনন্দ আর ধরে না। শৈশবের চঞ্চলতা যেন আবার ফিরে পেল সে। উঁচু পাহাড় থেকে নিচু পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে রঘু অবাক হয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের অপূর্ব শোভা তার চোখে ধরা দিল। দক্ষিণ থেকে পশ্চিম দিকে ঢেউ তুলে পাহাড়ের পর পাহাড়ের পাগলের মতো ছুটে যাওয়া তাকেও পাগল করে দিল। তার উৎসাহ দেখে ভোলাও ভরসা পেল। বাচ্চা ছেলেদের মতো বানরের পাল দেখে তাড়া করল ওদের। কিন্তু এই উৎসাহ উদ্যম সব হারিয়ে গেল দুপুরের পর। রাস্তা যত এগোল রঘুর অবস্থা ততই খারাপ হতে শুরু করল। পড়াশোনা জানা মা বাপের আদুরে বড় ঘরের ছেলে রঘু। এভাবে মাইলের পর মাইল হেঁটে তার অভ্যেস নেই। প্রথমদিকে অজানাকে জানার খুশিতে ডগমগ করলেও কয়েক মাইল হাঁটতেই সেই উৎসাহে ভাটা পড়ল। অবশ্য উৎসাহ থাকার কথাও নয়, কারণ সারাদিন বিরামহীন হেঁটেই চলেছে তারা। এই অরণ্য যেন আর শেষ হবে না কোনওদিন। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু জঙ্গাল আর জঙ্গাল। সামনে কোথাও কোন মনুষ্য বসতি দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বেলা দ্রুত বয়ে যাচ্ছে ফলে কোথাও দুদন্ড দাঁড়ানোরও উপায় নেই। শুধু একনাগাড়ে এগিয়ে চলা। এই পথ চলা আদৌ শেষ হবে কিনা অবসন্ন রঘু যেন কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

নালিছড়া এসে ধপাস করে বসে পড়ল রঘু। আর কিছুতেই এগোতে পারছে না সে, শরীরটা যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। ভোলা পেছনে পায়ের শব্দ না পেয়ে থমকে দাঁড়াল, 'একি বসলে কেন? এইটুকু পথ আর বাকি। চল – চল।' রঘু

একটা গাছের গোড়াতে বসে শরীর ছেড়ে ছিল। ভোলা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তুমি কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়বে নাকি?'

রঘু বলল, 'হ্যাঁ। আর এক পাও এগুচ্ছি না আমি। ঘন্টাছড়া না কোন্ ঘন্টা আমি কোথাও যাব না।'

রঘুর চোখে জল আসে, বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। এই ভবিষ্যৎ কোনদিন কাম্য ছিল না রঘুর। সব কিছু সহসাই যেন ওলটোপালটো হয়ে গেল। রঘুর বাবা মারা গেছেন মাত্র ছ-মাস হয়েছে, তার মধ্যেই ওর পড়াশোনা থামিয়ে দিতে হল। প্রতিবার কাকা নিজে ময়ালে বেরোত এখন রঘুকে বেরোতে হচ্ছে। কেন? কাকার ছেলেরা তো বড় হয়েছে, রঘুর চেয়েও তারা বড়। তাদের ময়ালে পাঠাল না কেন?

একনাগাড়ে বকবক্ করে গেল রঘু। এতো প্রশ্নের জবাব ভোলার কাছে নেই। তবু ছেলেটার কষ্ট দেখে তার মনটা ভারি হয়ে গেল। ভোলা পোটলা করে আনা চিঁড়া, গুড় ও কলা দুভাগ করে রঘুকে দিয়ে নিজেও বসল খেতে। অনেকটা বেলা হয়ে গেল। দুপুর গড়িয়ে গেছে। সত্যিই তো জ্যোতিবাবুর দুই ছেলের ছোটটাও রঘুর চাইতে বড়। অথচ তাদের কাউকেই ময়ালে পাঠালেন না তাদের পড়ার ক্ষতি হবে বলে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল সেই ছেলেদের একটাও প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি এখনো পেরোল না। এদিকে রঘু এবার আই.এ. তে ভর্তি হতে কলেজে যাওয়ার কথা ছিল। জ্যোতিবাবু নানান কৌশলে রঘুর পড়াশোনায় লাগাম টেনে দিলেন। তাকে কলেজে পাঠালেন না। সেদিন থেকেই রঘুর স্বপ্ন ভেঙে গেল। সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ছেলেটা ভেবেছিল কলেজে যাবে, সেই স্বপ্নটাই অনিশ্চয়তায় হারিয়ে গেল। কোথায় আগরতলা মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের মায়াবি হাতছানি, আর কোথায় ঘন্টাছড়ার ময়াল।

ভোলা রঘুর মাথায় হাত রাখতেই রঘু চোখ মেলে তাকাল। 'আগে চিঁড়া গুড় খেয়ে নাও, না হলে খিদেয় কষ্ট পাবে ভাতিজা।' রঘু চিঁড়া গুড় গামছার কোঁচড়ে নিয়ে খেতে লাগল ।

'তুমি যেভাবে বসে আছ এভাবে জঙ্গলে বসতে নেই ভাতিজা।'

ভোলার কথার মধ্যে এমন একটা রহস্য ছিল চমকে উঠল রঘু। সে আঁৎকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'দেখো বাঘ ভয়ানক হিংস্র জানোয়ার। তবু মানুষকে ওরা সমীহ করে চলে। কিন্তু তুমি যেভাবে বসে আছ দুর থেকে দেখলে মনে হবে গাছের গোড়াতে একটা বাঁদর বসে আছে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রঘু। 'এখানে বাঘ কোত্থেকে আসবে ভোলাকা?'

'কি যে বল রঘু, এই যে পনের বিশ মাইল পথ আমরা হেঁটে এলাম তার কিছু জায়গা বাদ দিলে প্রায় পুরোটাই কোন না কোন বাঘ আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

মুহূর্তে রঘুর ঘুম ক্লান্তি সব ছুটে গেল। 'বল কি? তুমি কি করে বুঝলে?'

মুচকি হাসল ভোলা, 'ভাতিজা আজ আট বছর হল এই ব্যবসার পেছনেই লেগে আছি। এই পাহাড় জঙ্গলে দিনরাত ঘুরেছি শুয়েছি খেয়েছি তোমার কাকার ব্যবসা দেখতে। আমি বুঝব না তো বুঝবেটা কে?'

রঘু কৌতূহলী হয়ে উঠল, 'বাঘগুলি কি আমাদের কাছাকাছি এসেছিল ভোলাকা?'

'হ্যাঁ। এবং ওরা এখনো আমাদের আশেপাশেই আছে।'

রঘু ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। এই পাহাড়ে অনেক বাঘ আছে রঘু জানে। কিন্তু বাঘ যে তাদের পিছু নিয়েছে তা কল্পনাও করতে পারেনি সে। বাঘ ক্রমাগত তাদের অনুসরণ করেছে সেটা ভেবে রঘুর গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। এমন ভয়ানক পরিবেশের মুখোমুখি তাকে হতে হবে সে জীবনেও কল্পনা করতে পারেনি।

ভোলা হেসে বলল, 'কি হে ভয় পেয়ে গেলে? ধুর বোকা ছেলে, বাঘ একটা জানোয়ার কিন্তু আমরা তো মানুষ। আমি তো আছি তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? চল-চল-।'

দুজনেই চলতে লাগল পাকদণ্ডী বেয়ে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে দুজনে গল্প করে হেঁটে চলেছে। কি দাপট আদিগন্ত বিস্তৃত এই বিশাল বনভূমির। কোথাও সবুজ, কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও মিশ্‌মিশে কালো আঠারমুড়া থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তরঙ্গ তুলে পাহাড় মিশে গেছে অববাহিকায়। বিশাল এই বনভূমি ও বৃক্ষরাজির মাঝখানে বারবার হারিয়ে যাচ্ছিল রঘু ও ভোলা। তবু ক্লান্তিহীন এই পথে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পোকার মতো এগিয়ে যাচ্ছে দুজন। সারা রাস্তায় সূর্য তাদের সাথে লুকোচুরি খেলছে গাছের পাতার আড়ালে।

'আচ্ছা ভোলাকা তুমি কি করে বুঝলে বাঘ আমাদের পিছু নিয়েছে? আমি তো বুঝতে পারিনি।'

'জঙ্গল কথা কয় চুপিচুপি কানে কানে। জঙ্গলের নিজের একটা বুলি আছে ভাতিজা। ঐ বুলিটাকে বুঝতে হয় তাইলেই হল। যেমন ধর ভাতখাওড়ি আসার পর একটা বাঁক পড়েছিল মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, যেখানে তুমি শুকনো বাঁশ বাজিয়ে শব্দ করে জোরে চিৎকার করেছিলে?'

'ঠিক তার আগে অনেকগুলি বান্দর ও পাখি চিৎকার করে হুটোপুটি করে পালিয়ে যেতে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা পালাল কেন?' প্রশ্নটা করে ভোলা তাকাল রঘুর দিকে।

রঘুর বোকার মতো চাহনি দেখে ভোলা আবার বলতে শুরু করল, 'ওরা কি আমাদের দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল? না কাহা। ওরা বাঘটাকে আসতে

দেখেছিল। বাঘ দেখলেই জীবজন্তুরা এইরকম করে। তাছাড়া জঙ্গলের কিছু প্রাণী আছে যারা সবসময় বাঘের পেছনে খাবারের লোভে ঘুরে। সে সব ফেওয়ালিদের ডাক শুনেও বোঝা যায় বাঘ কতো দুরে আছে।'

বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। রঘু ও ভোলা পরপর বয়ে চলা দুটো ছড়ার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল। দুজনেই জল খেতে নেমে পড়ল ছড়ায়। ছড়ার নিচে নামতেই রঘু অবাক হয়ে দেখে হরিণের দল লাফিয়ে জল ছেড়ে পালাচ্ছে। তার একটু দুরে একা একটা বন্য শুয়োর জল খেতে খেতে ঘোৎ করে শব্দ করে পালিয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে জল খেতেই নিজেকে ফিরে পেল রঘু। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ভোলা তার লুক্কায় কেরোসিন তেল খুব যত্ন করে ভরে নিল। আর মাইল খানেক এগোলেই পড়বে ভরত চৌধুরী পাড়ার পাহাড়ি জনপদ। ভোলার কাঁধের ঝোলায় আছে রকমারি জিনিস। কিছু চুড়ি, পাউডার, স্নো, সিঁদল ও অন্যান্য শুট্‌কি আর টাক্কল, অষুধ পত্তর ইত্যাদি। ভার বওয়ার ভেওয়ের দুইদিকে টুকরি দুটি ঝুলিয়ে ভোলা আপনমনে চলেছে।

রঘুর মার কথা মনে পড়ল। বাড়ি থেকে এতোটা দুরে সে চলে এসেছে মাকে একা ফেলে! বাবা মারা যাওয়ার পর মা এমনিতেই সারাদিন মনমরা হয়ে থাকেন। রঘুর পড়াশোনা কি করে হবে? কি করে রঘুকে বড় করবেন? এমন নানাহ দুর্ভাবনায় তরুবালা প্রায় রাতেই ঘুমোন না। রঘুর বাবা পাকিস্তানের বেগমপুরের জমি জলের দরে বিক্রি করে কদিন পরপর টাকা পাঠিয়েছেন জ্যোতিবাবুকে। ছোটভাই ত্রিপুরাতে আছে সে জায়গা জমি কিনে ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। কিন্তু কিছুদিন পর আবার যখন পরিস্থিতি খারাপ হল শান্তি বাবু বাকি ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে জায়গা জমি তাড়াহুড়া করে যতটুকুন বিক্রি করা গেছে সেটুকু বিক্রি করে ছোট ভাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। শুধু নিজের জন্য নয়, ছোট ভাই এবং গোটা পরিবারকে সুরক্ষিত করার জন্য। কিন্তু জ্যোতিবাবু রঘুর বাবাকে ঠকালেন। যতদিন রঘুর বাবা জীবিত ছিলেন ততদিন নিজেকে দাদার খুব অনুগত দেখিয়েছেন জ্যোতিবাবু। কিন্তু বাস্তবে সৎ ভাই হওয়ায় শান্তিবাবুকে তিনি সাংঘাতিক ঈর্ষা করতেন। ফলে তাকে ঠকিয়েছেনও নির্মমভাবে।

ঘন্টাছড়ার পাহাড়ি জনপদে এসে রঘুদের দীর্ঘ যাত্রাপথ শেষ হয়ে গেল। ভোলা রাস্তায় পাহাড়বাসীদের জীবনযাত্রা, ওদের ঘরবাড়ি, খাওয়া দাওয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছে রঘুকে। তবু নিজের চোখে না দেখে কৌতূহল মেটে না। এখানে মাটির উপরে নাকি ঘরের সংখ্যা খুব কম। বেশির ভাগ ঘরই টংয়ের উপর। দুর দুর চড়াই উৎরাইয়ে ছড়িয়ে আছে জনজাতিদের ঘরগুলি। কিন্তু অন্ধকারে এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভোলা কক্‌বরক মাতৃভাষার মতোই বলতে পারে। কিন্তু রঘু বুঝতে পারে না।

ভোলা পৌঁছেই ডাকে বিনন্দ দেববর্মাকে, নিস্তব্ধ পাহাড়ে শব্দটা ঢেউ তুলে হারিয়ে গেল। চারিদিকে শুধু অন্ধকার। মানুষ জনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কারো কোন সাড়া শব্দও নেই। মাঝে মাঝে দুর দুর পাহাড়ে লুক্কার আলোর এক এক ঝলক চোখে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। রঘু ভয় পাচ্ছিল এ কোথায় চলে এলো সে। এতো ভয়ঙ্কর নির্জনতা যেন নিজের আত্মাকে ছুঁয়ে দেখা যায়। ভোলা বলল, 'কি মুশকিল সন্ধ্যাতেই সব ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?'

বিনন্দর টং ঘরটার চারিদিক আগে ফাঁকা ছিল। এখন গাছের ডাল দিয়ে শক্ত পোক্ত বেড়া দেওয়া হয়েছে। মুশকিল হচ্ছে দুজনে অনেক খুঁজেও অন্ধকারে বাড়িতে ঢোকার মুল ঘাটাটা কিছুতেই পাচ্ছিল না। রঘু বলল, 'ভোলাকা চিৎকার করে ডাকলে হয় না?' ভোলা ফিস্‌ফিস্ করে সাবধান করে রঘুকে, 'এই চুপ করো ভাতিজা। আমার মনে হয় কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। এখানে হাতির পাল মাঝে মাঝে হামলা করে। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে হাতির হামলাই হয়েছে। চিৎকার করে ডাকলে হাতি আমাদের দিকেই তেড়ে আসতে পারে।'

'চিৎকার শুনে আসবে কেন? ওরা তো আমাদের দেখতেই পাচ্ছে। এমনিতেই ছুটে আসতে পারে এদিকে।'

'হাতি রাতের আঁধারে চোখে ভাল দেখতে পায় না। ওরা যদি এসেই থাকে তাহলে চুপ করে কোথাও দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানুষের প্রতিক্রিয়া বুঝে ওরাও এগোবে।'

'আমাদের ওপর হামলা করবে না তো?'

'শোন ভাতিজা আমার সাথে হাতির একটা যোগ আছে। এই নিয়ে তিনবার আমি যেদিন এসেছি সেদিনই হাতি এসেছে এখানে। কই হাতি আমার ক্ষতি তো কিছু করেনি। তবে প্রতিবারই লাভ হয়েছে দারুণ। আমার মনে হয় এবারও প্রচুর লাভ হবে।'

নিঃসীম অন্ধকার। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। তবু মনে হচ্ছে মধ্যরাত্রি। ভয়ে রঘুর বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ভোলাও ভয় পেয়েছে ভীষণ কিন্তু রঘুর সামনে সমানে ওস্তাদি করে যাচ্ছে। এই গভীর নিস্তব্ধতায় ভোলার নিশ্বাস ফেলার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ অপরিচিত মানুষের শব্দ শোনা গেল পাশের টিলা থেকে। সেই শব্দ ধ্বনিত হল এই টিলা থেকে সেই টিলায়। অমনি একটা দুটা করে আগুনের লুক্কা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। প্রায় শখানেক লুক্কা অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়কে আলোকিত করে তুলল। ঘুমন্ত পাহাড় যেন নৈঃশব্দ ভেঙে জেগে উঠল। পাহাড়ি পথ বেয়ে ঐ লুক্কাগুলি ও তার ছায়ামুর্তি ঐ চিৎকার ধ্বনির দিকে ছুটতে লাগল। হঠাৎ সমগ্র পাহাড় হাতির বিকট শব্দে কেঁপে উঠল। প্রতিটি মানুষের চিৎকার তার সাথে থাল ঘটিবাটি টিন কাঠ যে যা কিছু পেয়েছে বাজিয়ে ঘুমন্ত পাহাড়কে জাগিয়ে তুলল। রঘু ভয়ানক চমকে উঠল। কেরোসিনের গোলা ছোঁড়া হতে লাগল হাতির পালের উপর। তার সাথে দু রাউন্ড গুলির শব্দ এবং ক্রমাগত হাতির পালের দিকে মানুষের তেড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে রঘু আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না।

'ভোলাকা হাতিগুলি এবার তেড়ে আসবে না তো?'

'না না। ওরা এখন পালিয়ে যাবে।'

'ঐ যে চিৎকার শোনা গেল এটা কি হাতির চেঁচানোর শব্দ?

'হ্যাঁ। হাতি ভয় পেয়ে পালাচ্ছে।'

মানুষের চিৎকার ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে হাতির পেছনে। অন্ধকারে একটা অপরিচিত হাত ভোলার হাত ধরে টানে। 'চল ভোলাদা।' এতক্ষণের দমবন্ধ করা পরিবেশটা একটা মানুষের ছোঁয়া পেতেই মুহূর্তে হালকা হয়ে গেল। গলার স্বর চিনতে পেরে ভোলা বলল, 'আরে মনীন্দ্র! কেমন আছো?'

'আছি দাদা। তোমার সাথে এটা আবার কে?'

'আমার মালিক।'

'জ্যোতিবাবুর পুলা?'

'না ভাতিজা।'

'তাহলে আমাদের ছোট মাজন কি বল?'

রঘু মৃদু আপত্তি করে বলল, 'আমার নাম রঘু।'

ভোলা জিজ্ঞেস করল, 'বিনন্দ কোথায় মনীন্দ্র?'

'হাতি তাড়াতে গেছে। তোমরা যে আসবে সে জানে। সেই তো আমাকে পাঠাল।'

'আমরা আজকে কোথায় উঠব? তোমার বাড়ি?'

'না বিনন্দর বাড়ি। আমার বাড়িতে বাচ্চুদা আছে। আজকে নিজের ঘরে ফিরবে বলে মনে হয় না'

'ও বাচ্চুদা ঘন্টাছড়াতেই আছে? তাহলে তো তোমাদের জমবে ভাল।'

'আর বলবে না আগে তো মাঝে মাঝে আসতো, এখন পাহাড়ি মেয়ে বিয়ে করে এখানেই থাকে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ গিরীন্দ্রর বোন সঞ্চারীকে বিয়ে করেছে। এখন ওরা দুজনেই খুশি। বাচ্চুদা রোজ শিকারে বেরুচ্ছে আর একটা দুটো শিকার করছে। গ্রামের সবাইকে কমবেশি মাংস বিলিয়ে সবাইকে খুশি করে রেখেছে। সবাই তো বাচ্চুদা বলতে ভগবান বোঝে। আধবুড়ো লোকটা সারাদিন মদ গিলে ঢোল হয়ে থাকে, তারপরও বাচ্চুদার মনের জোর ও মাথাটা একদম টানটান।

'আমি আসব খবরটা বাচ্চুদা জানে?' কথা বলতে বলতে ওরা বিনন্দর বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

'জানে, সব জানে।'

ওরা বিনন্দর টংয়ের সামনে এস দাঁড়াল। দরজার সামনে এসে মনীন্দ্র ডাকল 'বাচই -, ও বাচই।'

টং ঘরের দরজা খুলে গেল। মনীন্দ্র ভোলাকে বলল, 'ভোলাদা তোমরা

ঘরে যাও। আমি আসছি।'

মাটি থেকে প্রায় মিটার দুয়েক উঁচু বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল ওরা। কুপি বাতি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে অনূর্ধ্ব চল্লিশের মহিলা ডাকলেন, 'ফাইদি।' রঘু অবাক হয়ে মহিলার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। রঘুর মার বয়সী হবেন মহিলা, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ, মুখে হাসি। 'কি হল মাজন, ভেতরে এসো।'

দীর্ঘ যাত্রাপথের ক্লান্তি, রুক্ষতা, খিদে, শ্বাপদের হুংকার সবকিছু টংয়ের বাঁশের দরজার নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকতেই মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। মাঝ বয়সী মহিলা সামনে এসে দাঁড়াতেই এই কঠোর অরণ্যেও মোলায়েম ঘরের ছোঁয়া লাগল। মহিলাদের চারপাশে সবসময় ছড়িয়ে থাকে এক মোহময় অদ্ভুত স্নিগ্ধ পরিবেশ। তাকে ঘিরেই ধীরে ধীরে শুরু হয় জীবনের নতুন স্রোত। ঘরের ছোঁয়া পেয়ে রঘু নিজেকে ফিরে পেল। ভোলা ঘরে তার ভেউ, টুকরি, ডালা, বস্তা সব গুছিয়ে রেখে একটা সুন্দর মালা বের করে ডাকল, 'বাচই। এই নাও এটা তোমার।' গৃহকর্ত্রী নিলেন বটে খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না। ভোলা রঘুকে বলল, 'ভাতিজা তুমি থাকো এখানে, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েও পড়তে পার। আমার বাচ্চুদার সাথে দেখা করে ফিরতে রাত হয়ে যাবে, অথবা না ও ফিরতে পারি।'

রঘুর চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'আমি কাউকে চিনি না, জানি না। এখানে একা থাকব কি করে?'

'ধুর ব্যাটা, ওরা তো সবাই আমাদের লোক। এই হল বাচই, ঐ বাচইর বড় মেয়ে, এটা ছোট, আর উনি ওর শ্বশুর। আর এই দুটোও বিনন্দর ছেলে।'

রঘু আর কিছু বলতে পারল না। বাঁশের মাচানের এক কোনে সে বসে রইল। ভোলা মনের সুখে বিড়িটা টেনে বেরিয়ে গেল। বড় মেয়ে বলে ভোলা যাকে ইশারা করল সে টংয়ের বাইরে কাজ করছে। ওকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ছোটগুলি লেপ জড়িয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পিট্‌পিট্ করে রঘুকে দেখছে। শ্বশুরমশাই এবার রঘুর দিকে এগিয়ে এলেন। 'তোমার নাম কি হে ছোট ছেলে?'

রঘু হেসে বলল, 'রঘু।'

'রঘু। তুমি মাজনের পুলা?'

'না আমি ওনার ভাতিজা।'

'অ আচ্ছা। তাইলে তোমাকে আমরা ছোট-মাজন বলে ডাকব। তুমি তো ক্লান্ত, এখন বিশ্রাম কর। পরে তোমার সাথে কথা হবে। আমি একটা শিকার খুঁজছি পেলে মারব, রাতে তোমাকে মাংস খাওয়াব।'

'কি শিকার করবেন?' খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল রঘু।

'এই তো হেজা, খরগোশ যা পাই।'

'আপনি এখন ঘর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে যাবেন শিকার করতে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রঘু।

'না না আমি আমার টং ঘরের পাশে গাছে বসেই শিকার করি।' কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না সে।

'তাহলে আমিও আপনার সাথে থাকব। আমাকে নেবেন?' বুড়ো রঘুর চোখে শিশুসুলভ বিস্ময় ও আগ্রহ দেখে খুব মজা পেলেন। 'তুমি শিকার দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ। আমি কখনো দেখিনি তো, তাই আপনার সাথে বসে দেখব।'

বুড়ো পুত্রবধুকে ডাকলেন, 'ভাগ্যলক্ষী একটু লাংগি দাও। আইচুক তুই ছোট মাজনকে নিয়ে মাচানে যা। আমি আসছি।'

আইচুকতি এতক্ষণ আড়ালে বসে কাজ করছিল। সে উঠে এসে রঘুকে ডাকল, 'চলে এসো। তবে একদম বকবকম করবে না। নড়াচড়াও করতে পারবে না। শব্দ পেলেই শিকার পালিয়ে যাবে।'

আইচুকতির কথা বলার মধ্যে কর্তৃত্ব করার একটা ভাব আছে। টং ঘর থেকে একটা বাঁশের সাঁকো গাছে গাছে বেঁধে ঘর থেকে একটু দুরে চলে গেছে। সাঁকোটা তিনটা গাছ পেরিয়ে একটা মাচানে এসে মিশেছে। রঘু সন্তর্পণে সাঁকোটা পেরিয়ে মাচানে এসে বসল। আইচুকতির চলাফেরায় কোন সংকোচ নেই। রঘু যেন তার কতোকালের চেনা। রঘুর পাশে বসে আইচুকতি জিজ্ঞেস করল, 'ভয় পাচ্ছ?'

'না না।'

'পাহাড়ে তুমি প্রথম এসেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন লাগছে?'

'ভালো। তবে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে।'

'লাংগি খাবে ছোট মাজন? দেখবে ঠান্ডা চলে যাবে।'

লাংগি সম্বন্ধে রঘুর ধারণা আছে। সে বলল, 'না আইচুক আমি ওসব খাইনি কখনও।'

'খাও না ছোট মাজন, আমাদের ঘরে তৈরি। খুব ভাল।'

'তুমি খাও?'

'হ্যাঁ। আমরা সবাই খাই।'

কথার মাঝেই চলে এলেন আইচুকতির দা-বুড়া। একটা ছোট মাটির কলসি নিয়ে মাচানে এলেন তিনি। রঘুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন 'কি ছোট মাজন খাবে নাকি? নাও খেয়ে নাও।' রঘু এবার আর আপত্তি করেনি, আইচুকতি ও দা-বুড়ার মতোই বাঁশের নলে মুখ লাগিয়ে লাংগি খেল। মুচকি হেসে আইচুকতি বলল 'ছোট মাজন তোমার কপাল ভাল। আজকের লাংগিটা ভাল হয়েছে।'

রঘু বিকৃত চেহারার ফাঁকে হাসল। আদৌ এই পানীয়ের স্বাদ বলে কিছু আছে কি না সে টের পায়নি। তবু বলল, 'খুব ভাল।'

বুড়ো ইশারায় দুজনকে চুপ করিয়ে দিলেন। রাত খুব বেশি হয়নি। আটটা কি নয়টা হবে। তার মধ্যেই পাহাড়টা প্রায় চুপ মেরে গেল। আকাশ জুড়ে শুধু তারাদের রাজত্ব। তারারাও যে মৃদু আলো ছড়ায় কুয়াশা ঘেরা এই পাহাড় না দেখলে রঘু হয়তো কোনদিন অনুভব করতো না। আপাদমস্তক পাতলা লেপের নিচে ঢেকে রঘুর একটু যেন ঝিমুনি পেল। কুসুমের আজ বিয়ে। কথাটা এতক্ষণ ইচ্ছে করেই ভুলে ছিল রঘু। কিন্তু তাকে একা পেয়েই স্মৃতিগুলি সব অ্যালবামের মতো পৃষ্ঠা উল্টে সামনে চলে এলো। কি করছে এখন কুসুম? হয়তো নতুন জীবন নিয়ে ভাবছে? শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কৌতুহলী ভিড়ে সভা আলো করে লম্বা ঘোমটা টেনে বসে আছে। আর কি ভাবছে? রঘুর কথা ভাবছে না তো? রঘুর কথা ভেবে বারবার উদাস হয়ে কাঁদছে না তো? যত কষ্টই পাক কুসুম বিয়েটা যেন ভালভাবে মিটে যায়। রঘুর দৃঢ় বিশ্বাস কুসুম বিবাহিত জীবনে সুখি হবে, খুব সুখি হবে।

রাতের অন্ধকারে তিনজন জড়ো হয়ে বসে আছে। লাংগির জন্যই কিনা জানি না রঘুর শরীরটা একটু গরম হয়ে উঠল। বৃদ্ধ গাদা বন্দুকটা বুকে চেপে ধরে সস্‌র্‌ একটা শব্দকে তাক করে তাকিয়ে রইলেন। লক্ষ্যের দিকে বৃদ্ধ ও আইচুকতি এতোই নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইল যে ওদের শ্বাস প্রশ্বাস বইছে কিনা রঘুর সন্দেহ হল। টংয়ের নিচেই জুমের পুরানো খেত। ছোট ছোট প্রাণীরা সন্ধ্যার পর থেকে এখানে খাবারের সন্ধানে ছুটাছুটি শুরু করে। আরও একবার অতি সতর্ক শব্দটা হল। আর বৃদ্ধ ও আইচুকতির একাগ্রতা ধ্যান যেন আচমকা ভেঙে গেল। রঘু কিছু বোঝার আগেই বৃদ্ধ গাদা বন্দুকটা পাশে রেখে দিলেন। তারপর দুজনেই কলাগাছের ছোট ছোট টুকরো হাতে নিলেন, কাছেও রাখলেন জড়ো করে কয়েকটা। আইচুকতি ইশারায় রঘুকে নিতে বলায় রঘুও কলাগাছের টুকরো হাতে নিয়ে বসল সন্তর্পণে। বৃদ্ধ ও আইচুকতির শরীরী ভাষাটা অবাক হয়ে যাওয়ার মতো বদলে গেল। গেরিলা সৈন্যরা যেমন আক্রমণের আগে শরীরে আগুন সঞ্চয় করে নেয় চূড়ান্ত এবং নিখুঁত নিশানায় আঘাত হানার জন্য, ঠিক সেইভাবে ওরা দুজন বসে আছে অজানা নিশানায় তাক করে আক্রমণ হানার জন্য।

রঘু তখনও বুঝতে পারছে না তার কাজটা আসলে কি। এই কলাগাছের টুকরোগুলো দিয়ে কি হবে? হাতে নিয়ে বসে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। অন্তত দুবার এই ব্যাপারে কথা বলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আইচুকতি ওকে আগেই এমনভাবে নিষেধ করল রঘু আর কথা বলতে সাহস পায়নি। হঠাৎ বৃদ্ধ মুখে এক অদ্ভুত শব্দ করলেন সাথে সাথে নিচে কিছু প্রাণীর দ্রুত চলার শব্দ, চিৎকার কানে এলো। আইচুকতি চিৎকার করে দ্রুত কক্‌বরকে কি যেন বলল। নিচে কিছু প্রাণীর চলাফেরা এবং কাঁটার শব্দ কানে এলো। মুহূর্তে কিছু বোঝার আগেই আইচুকতি ও বৃদ্ধ কলাগাছের টুকরোগুলো অদৃশ্য নিশানায় ছুঁড়তে লাগলেন। আইচুকতি তার হাতেরগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রঘুকেও ছুঁড়তে বলল। কিন্তু রঘু ঘটনার আকস্মিকতায়

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে বসে রইল। তাকে বোকার মতো বসে থাকতে দেখে আইচুকতি দ্রুত ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গাছের টুকরোগুলি ছুঁড়ল। চিৎকার চেঁচামেচির মাঝেই আইচুকতির ছোট ভাই, বোনগুলি ছুটে এল লুক্কা নিয়ে। নিচে আলো ফেলতেই দেখা গেল চারটে শজারু কলাগাছে আটকে পড়ে আছে। তার মধ্যে দুটি বড়, দুটি খুবই ছোট। বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'কি ছোট মাজন ভয় পেলে?'

'নাহ্! তবে হেজা মারার কৌশলটা বড় অদ্ভুত।'

দা-বুড়া হেসে বললেন, 'নাগালের মধ্যে এলে প্রথম শব্দ করতে হয় তখন ওরা কাঁটা মেলে দেয়। ব্যস তখনই কলাগাছ ছুঁড়ে দাও ব্যাটারা সব আটকে যাবে।' আইচুকতি তখনও হাসছিল রঘুর দিকে তাকিয়ে। তার ভাই বোনগুলি নিজেদের মধ্যে কথা বলে আরও বেশি হাসছিল। রঘু লজ্জা পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা হাসছে কেন আইচুক?'

'তোমাকে নিয়েই হাসছে ছোট মাজন।'

'কেন?'

'পিরিখা বলছে তোমার মতো হাদারাম সে জীবনেও দেখেনি।'

রঘু আরও লজ্জা পেল। কিশোরী মেয়ে দুটোর কাছে তার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল। এবার আইচুকতি নিচে নেমে এসে রঘুকে ডাকল, 'এই ছোট মাজন নিচে নেমে এসো।'

শীতের রাত। গরম হয়ে যাওয়া জায়গাটা ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না রঘুর। তবু সে নিচে নেম গেল। শজারুগুলির যে কটা কাঁটা এখনও কলাগাছের বাইরে খোলা আছে, তাই দিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই নড়াচড়া করতে পারছিল না। আইচুকতি রঘুকে বলল 'কলাগাছটায় চেপে ধর ছোট মাজন। আমি টাক্কাল দিয়ে হেজার মাথা কাটব।' রঘু ধরলও বটে কিন্তু আচমকা একটা কাঁটা ঢুকে গেল তার হাতে। হাতটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল সাথে রক্তও ঝরছে। দেখে বৃদ্ধ ডাকলেন রঘুকে, 'ছোট মাজন উপরে উঠে এসো।' রঘু উপরে যেতেই ওকে টং ঘরে নিয়ে গিয়ে শিশি থেকে কি একটা অষুধ বের করে লাগিয়ে দিলেন রঘুর হাতে। রঘু এবার কিছুটা আরাম পেল।

বাইরে তখন প্রাণীগুলি মৃত্যু চিৎকার করছে। অন্যদিকে আইচুকতি পিরিখাদের জয়ের উল্লাস শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই কলাপাতায় মাংস নিয়ে ভেতরে এলেন বৃদ্ধ। টংয়ের মাচানে ফেলে মাংসগুলিকে ছোট করে কাটা হচ্ছে। রঘু জিজ্ঞেস করল, 'চারটা হেজা মেরে মাত্র এইটুকুন মাংস?'

দা-বুড়া বললেন, 'চারটে না ছোট মাজন দুটো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো খুব ছোট তাই।'

পরদিন একটু বেলাতেই ঘুম ভেঙেছে রঘুর। আইচুকতি ঘুম ভাঙানোর জন্য রঘুকে অনেকক্ষণ ডেকেছে। কিন্তু গতকালের শারীরিক ক্লান্তিতে সে কিছুই বুঝতে পারল না। বেলা অব্দি ঘুমানোয় শরীরটা ঝরঝরে হল বটে কিন্তু হাত পায়ের

ব্যথাটা পুরো যায়নি। রঘু ঘুম ভেঙে জেগে দেখে টংএর মাচানে আর কেউ নেই। সবাই যে যার কাজে টং ছেড়ে চলে গেছে। শুধু কিশোরী মেয়েটা একা একা রান্না ঘরে কি যেন করছে। সে টংয়ের সিঁড়ি বেয়ে নিচে মাটিতে নেমে এলো।

বাইরে পাখিদের কলতান, ঝল্‌মলে রোদ সবুজ পাহাড়কে যেন আলোয় মুড়িয়ে দিয়েছে। ক্লান্তি ও গায়ের ব্যথাটা এখনও শরীরে আছে রঘুর। তবু অমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিনের আলো, ঘন সবুজের সন্নিবেশ তার মনটা ভাল করে দিল। একটা হাই তুলতেই বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল তার। যত ভুলে থাকতে চায় সে বাড়ির কথা ততই ঘুরে ফিরে সে কথাই মনে পড়ে যায়। আজ কুসুম তার শ্বশুরবাড়ি যাবে। পানিসাগর অনেক দূরের পথ, নিশ্চয় ওরা সাতসকালেই তৈরি হয়ে গেছে। কুসুমকে বিদায় দিতে গ্রামের লোক সবাই হয়তো ভিড় জমিয়েছে। কুসুমের বিদায় লগ্নে সবাই সুর করে কাঁদবে। কুসুম ভিড়ের মধ্যে সবাইকে খুঁজবে, সব আপনজনের কাছেই বিদায় চাইবে। নিশ্চয় খুঁজবে রঘুকেও অন্তত একটিবার দেখতে। আবার উদাস হয়ে গেল সে, নিজেকে অনেক বুঝিয়েও মন থেকে কুসুমের কথা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছে না।

এই সকালবেলা লোকজন খুব একটা নেই পাহাড়ি এই জনপদে। প্রতিটি টং ঘর যেন প্রাণহীন নিশ্চল ছবির মতো এ টিলা ওই টিলায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে দুয়েকটা শুয়োরের চিৎকার ছাড়া ঘন সবুজ এই টিলাভূমি যেন ম্রিয়মান। আইচুকতি কলাপাতায় বাঙ্গুই পাকিয়ে নিচে নেমে এল।

'ছোট মাজন তোমার খিদে পেয়েছে? এই নাও বাঙ্গুই খাও।'

রঘু হাতে নিয়ে বলল, 'তুমি খাবে না?'

আইচুকতি লাঙ্গাটা মাথায় ঝুলিয়ে ফিক্ করে হেসে বলল, 'আমি খেয়েছি তুমি খাও।'

কথা বলতে বলতে দুজনে হাঁটতে লাগল। আইচুকতি মাথায় গামছা বেঁধে তার উপর লাঙ্গাটার ফিতেটা ঝুলিয়েছে। লাঙ্গাটা পিঠের উপর আইচুকতির পিছনে পিছনে এগুচ্ছে নিঃশব্দে। লাঙ্গার মধ্যে আইচুকতি একটা টাক্কাল আর দুপুরের খাবার নিয়ে নিয়েছে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি আইচুক?'

'জুমে।'

'জুমে গিয়ে আমি কি করব?'

'আমি কি জানি তুমি কেন আসছ? তুমি বরং চলে যাও।' হেসে বলল আইচুকতি।

থমকে দাঁড়াল রঘু। সত্যিই তো সে কোথায় যাচ্ছে? তার তো ভোলার সাথে যাওয়ার কথা ঘন্টাছড়া হাটে। রঘু জিজ্ঞেস করল, 'জুম থেকে কোথায় যাবে তুমি?'

'বাজারে যাব। ওখানে গিয়ে তোমার ভোলাকাকাকে পাবে। উনি ওখানে

ব্যবসা করছেন।'

'তাইলে চল আমাকেও বাজারে যেতে হবে।'

'আগে জুমে গিয়ে তারপর বাজারে যাব, আমার দেরি হবে। তুমি একাই বাজারে চলে যাও।'

'না না আমি একা একা কি করে যাব? বাজারে যাওয়ার রাস্তাই তো জানি না। তার চাইতে চল তোমার সাথেই যাই।'

বাঙ্গুই খেয়ে রঘুর ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে, 'আইচুক জল কোথায় পাই বলতো?'

'জল খাবে? দাঁড়াও।'

আইচুক্তি কয়েকটা মৃত্তিঙ্গা বাঁশ টাক্কল দিয়ে ঠুকে ঠুকে কি যেন পরীক্ষা করে দেখল। তারপর খ্যাঁচাং করে একটা মৃত্তিঙ্গা বাঁশের গলা কেটে এনে দিল রঘুকে। 'খাও ছোট মাজন, জল খাও।' রঘু বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই জল খাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ। এটা খুব ভাল জল। এই দেখ আমি খাচ্ছি।' জল খেয়ে আইচুকতি মিট্ মিট্ করে হাসে, 'নাও খাও।'

এবার ঢক্ ঢক্ করে পুরো জলটাই খেয়ে নেয় রঘু। আর তৃপ্তির একটা আওয়াজ তুলে বাঁশটা ফেলে দেয়। নতুন কিছু আবিষ্কার করার মতো মুগ্ধ হয়ে বলল, 'স্বাদটা যেন কেমন। কিন্তু জলটা খাওয়া যায়। তুমি কি করে জানলে বাঁশের পেটে জল পাওয়া যায়?'

'আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। দেখ এই যে পাহাড় আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তার কাছে সব আছে যা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। শুধু খুঁজে নিতে হয়।'

'আরে বাঃ তুমি তো বেশ বড়দের মতো কথা বল। তুমি কি লেখাপড়া কর?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?'

'ক্লাশ এইটে্।'

একটু অবাক হল রঘু। এই মেয়ে পড়াশোনা করে সে ভাবতেও পারেনি। অথচ সে এইটে্ পড়ে? অবাক কান্ড! রঘু আইচুকতিকে আরো ছোট বালিকা ভেবেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ও পনের ষোলো বছরের কিশোরী। রঘু চোখ বুলিয়ে আইচুকতিকে আবার পরখ করে নিল। আইচুকতির সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। রঘু মনে মনে ভাবল, হতেও পারে। বাঙালী মেয়েদের মতো মেদ বাহুল্য হয়তো ওর শরীরে নেই। পরিশ্রমী শরীরের নিখুঁত সেপ্ আইচুকতির। এতো টাইট্ করে ওর বুকে রিয়া বাঁধা আইচুকতির উদ্ভিন্ন যৌবনের অস্তিত্ব ভালো করে বোঝা যায় না।

'কি ছোট মাজন - কি ভাবছ? কথা বলছ না যে?'

'ও হ্যাঁ!' থমকে দাঁড়াল রঘু। কথা ঘুরিয়ে সে বলল, 'তোমাদের এই গ্রামটার নাম কি আইচুক?'

'ভরত চৌধুরী পাড়া।'

'এই গ্রামে তোমরা কতোদিন আছো?'

'তিন বছর।'

'তার আগে তোমরা কোথায় থাকতে?'

'ভরত চৌধুরী পাড়ায়।'

'সে কি তুমি না বললে এখানে তোমরা তিন বছর আছো?'

'তাইতো।'

'তাহলে আগে অন্য একটা ভরত চৌধুরী পাড়ায় ছিলে নাকি?'

'না, এই পাড়াতেই ছিলাম।'

'কি মুশকিল তোমার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কেন তুমি হাদা নাকি? এতে না বোঝার কি আছে? আমাদের এই বসতির নাম ভরত চৌধুরী তো?'

'হ্যাঁ।'

'ধর এবছর এখানে জুম করে দেখলাম আগামিতে জুম করার মতো নতুন জমি আর এখানে নেই। একই জুমের খেতে আমরা পরপর দুইবার জুম করি না। যদি করি ফসল ভাল হয় না। তখন ভাল ফসলের জন্য এই বসতির মানুষগুলি অন্য কোথাও চলে যায় নতুন বসতি গড়ে, বুঝলে না?'

'বুঝলাম তারপর?'

'এই নতুন বসতিটা কারা গড়ে? এই ভরত চৌধুরীর মানুষজন। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'তো নতুন বসতির নামও হয়ে যায় ভরত চৌধুরী পাড়া। বুঝলে বুদ্ধুরাম।'

রঘুর চোখ কপালে ওঠার জোগাড়, এমন চলমান গ্রামের নাম সে আর কখনো শুনেনি।

'তাহলে ডাক পিওন তোমাদের গ্রামে চিঠি দেবে কি করে আইচুক?'

'কিসের চিঠি? চিঠি দিয়ে কি হবে? শুধু দা-বুড়া ছাড়া - ।' হঠাৎ জিভে কামড় দিয়ে থেমে যায় আইচুকতি।

'কি হল বল?'

'না বলছিলাম কি আমাদের পুরানো গ্রামটা ছিল অনেক দুর। এখান থেকে প্রায় বিশ মাইল দুরে হরিণমারার কাছে।'

'তোমার দা-বুড়ার কথা কি যেন বলছিলে?'

'কোথায় দা-বুড়ার কথা কিছু বলিনি তো ছোট মাজন? আমি আমার

ইস্কুলের কথা বলছিলাম, এটা অনেকদূর। প্রায় তিন চার মাইল হেঁটে যেতে হয়।'

রঘু অনেকটা সময় চুপ করে থেকে বলল, 'আজ স্কুলে যাওনি কেন?'

'একি বোকা নাকি তুমি? আজ ঘন্টাছড়া বাজারবার তুমি জান না? আজ কেউ ইস্কুলে যাবে না। সবাই যে যার জুমের ফসল নিয়ে বাজার চলে যাবে।'

'তুমি বাজারে গেলে না কেন?'

'কি করে যাব? তুমি ঘুম থেকে উঠতেই অনেক দেরি করে ফেললে। মা বলল, তুই থেকে যা আইচুক ছেলেটা ঘুম থেকে উঠলে বাজারে নিয়ে আসিস। আমি বললাম, আচ্ছা। এই তো পাশেই আমাদের জুম খেত, ওখানে মা বাবা যদি কিছু রেখে যায় তা নিয়ে আমি বাজারে যাব।'

'অ – আচ্ছা।'

'চল তাড়াতাড়ি যেতে হবে ছোট মাজন, না হয় বাজার শেষ হয়ে যাবে।'

'এতো সকালবেলা বাজার শেষ হয়ে যাবে?'

'এখানে মাঝ দুপুরেই বাজার শেষ হয়ে যায়।'

'শুরু হয় কখন?'

'সেই ভোরবেলা। জুমিয়ারা সব রাত থাকতেই এখানে আগুনের লুক্কা জ্বালিয়ে চলে আসে। কত মানুষ দেখবে আগরতলা, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, কমলপুর সব জায়গা থেকেই আসে। এটা একটা মেলাও বলতে পার এই পাহাড়ে। নৌকা নিয়ে পাকিস্তান থেকেও বড় বড় মাজনরা আসে।'

রঘু মানসকল্পে ব্যস্ততম বাজারের ছবিটা দেখতে পেল। 'তাহলে তাড়াতাড়ি কর না হয় বাজার শেষ হয়ে যাবে।'

এবার দুজন ছুটতে লাগল জুম খেতের উদ্দেশ্যে। জুমের খেতের ধান কাটা হয়ে গেছে। পুড়ে যাওয়া কালো কালো গাছের গোড়াগুলি মানুষের মাথার মতো তিল গাছের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। জমিটা একদম খাড়াই, জমির সবচাইতে নিচু অংশে দাঁড়ালে মনে হবে চারিদিক থেকে পাহাড়টা যেন হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। চারিদিকে গাছের সারি, মাঝখানে একটা ছোট্ট খেত। খেতের মধ্যেই ধান, তিল, মিষ্টি কুমড়া, খারকুম, কার্পাস তুলা সব একই জায়গায় লাগানো হয়। বন্য পশুরা ফসলের খুব ক্ষতি করে তাই টং ঘর বানিয়ে ফসল পাহারা দেওয়া হয়। আইচুকতির কাছ থেকে সব জেনে রঘুর ভাল লাগল। তার মনে হল নতুন কিছু যেন সে শিখতে পারল।

জুমের খেতে একটা পাটের আঁটি বাঁধা ছিল। আইচুকতি লাঙ্গাটা রঘুকে বলল, 'আমার লাঙ্গাটা নাও ছোট মাজন, আর এই আঁটিটা আমার মাথায় তুলে দাও।'

'তুমি এতো বড় আঁটিটা নিয়ে যেতে পারবে?'

'পারব তো, আমি সব সময় নেই।'

'না তুমি বরং আমাকে দাও, আমি বড়, তুমি তো ছোট।'

আইচুকতি একদম হৈ হৈ করে উঠল, 'এই না না, বাবা দেখলে আমাকে মারবে। আমিই পারব নিয়ে যেতে, দাও তুলে দাও। তুমি আমার লাঙ্গাটা নাও।'

অগত্যা রঘু পাটের আঁটিটা তুলে দিতে এগিয়ে এল। আইচুকতি বসে সামনের দিকে ঝুঁকে বোঝাটা মাথায় নিয়েই চলতে লাগল। এত দ্রুত আইচুকতি চলতে শুরু করল রঘু তার পেছনে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এগুতে লাগল। রঘু লাঙ্গাটা পাহাড়ি মেয়েদের মতো মাথায় ফিতে আটকে পিঠের উপর ঝুলিয়ে নিল। অচেনা রাস্তায় সুবিধের জন্য টাক্কালটা হাতে নিয়ে ছুটতে লাগল। হঠাৎ রঘুকে এই বেশে দেখে আইচুকতি এমন ভাবে হাসতে লাগল রঘু পাটের আঁটিটা না ধরলে আইচুকতি হয়তো উল্টেই পড়ে যেত। রঘু জিজ্ঞেস করল, 'কি হল আইচুক হাসছ কেন?'

'তোমাকে দেখতে একদম পাহাড়িদের মতোই লাগছে।'

'ও তাই।'

'তুমি আমার পেছনেই থাক ছোট মাজন সামনে এসো না, আমার খুব হাসি পায়।'

'ঠিক আছে বাবা তোমার পেছনেই আছি। আর হাসবে না যাও।'

আইচুকতির হাসি থামার কোন লক্ষণ নেই। তবুও দুজন ছুটছে। কেন রঘু আইচুকতির পেছনে ছুটছে, কেন আইচুকতির সঙ্গ রঘুর ভাল লাগছে এসব প্রশ্ন অবান্তর। সামনে নীলাকাশ আদিগন্ত বিস্তৃত। তার নিচে নিবিড় সবুজ বনভূমি। চারিদিকে কুমারী মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। অচেনা পাখিদের কিচিরমিচির এক অপূর্ব সংগীতের মতো ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ময়। চড়াই উতরাই, পাহাড়ি ছড়া, চঞ্চল ঝর্ণা আর তার মাঝেই পাহাড়ি পথ ধরে জীবন এখানে খেলা করে। হঠাৎ একটু নিচু জায়গা দেখে একমুহূর্ত দাঁড়াল আইচুকতি।

'ছোট মাজন এই জায়গাটার নাম জান?

'কি?'

'মায়াংটুকু।'

'মানে?'

'হাতিরা এখানে জল খায়, বিশ্রাম করে।'

অবাক হয়ে রঘু তাকাল জায়গাটার দিকে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেকটা নিচে নেমে গেছে লুঙ্গাটা। তার মাঝে গাছের স্নিগ্ধ পাতায় ঢাকা মখমলের মতো বনভূমি। আর সবচাইতে নিচু অংশে একটা ছোট্ট জলাশয়, দেখে মনে হয় একটা ঘন কালো জলের চৌবাচ্চা যেন। ঘুরে প্রশ্ন করতে গিয়েই দেখে আইচুকতি অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। ছুটে আইচুকতির পাশে এসে বলল, 'হাতি বিশ্রাম নিতে এখনো এখানে আসে?'

'তাড়াতাড়ি চলো মাজন। ওই যে দেখো আমাদের বাজার।'

মানুষের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। পাটের বোঝা নিয়ে ক্লান্তিহীন ছুটে যাচ্ছে আইচুকতি। রঘুও তার পাশে হাঁপিয়ে উঠেছে। আরও একটু ছুটেই বাজারে

এসে ঢুকল তারা। বাজারে লোকের খুব ভিড়। তাছাড়া শুয়োর, হাঁস, মুরগি ও চানাচুর, চিঁড়া ভাজা, খৈয়ের উখ্‌রা, স্নো, চুড়ি, আলতার চিৎকারে কারো কথাই ভাল বোঝা যাচ্ছিল না। পাহাড়ি সব বাজারের চেহারা প্রায় একইরকম। হাঁস, মুরগি, শুয়োর, ছাগল, গরু একদিকে, তার পাশেই কাচা মাংস উঠেছে প্রচুর। খোলা মাঠে অস্থায়ী ছনের চালাঘরে মহাজন ও তাদের মুন্সীরা বসে আছে। ধান, পাট, তিল, তিসির কারবারটা হয় মূলত এখানেই। বাজারে এসেই আইচুকতি কোথায় হারিয়ে গেল রঘু আর খুঁজে পায়নি। পাহাড়ে এসে রঘু এখন অব্দি যা দেখেছে তাতে এতো মানুষের ভিড় এই বাজারে দেখবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে একা একা হাঁটতে লাগল বাজারের এদিক ওদিক। হঠাৎ একজন ওর লাঙ্গা ধরে জোরে টেনে মাটিতে নামিয়ে আনল।

'এই মামা দেখি তোমার লাঙ্গাটায় কি আছে?'

লাঙ্গা নামিয়ে রঘুর দিকে তাকিয়ে লোকটা বলে 'আরে ভাতিজা তুমি!' ভোলার কথা রঘু প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আইচুকতি পাহাড়ি ঝরনার মতো এত দ্রুত রঘুর মনের উপর ছড়িয়ে পড়ল এবং রঘুও এই জলে কখন নিমজ্জিত হয়ে গেল সে বোধ হয় টেরই পায়নি। কুসুমকে ভুলে থাকতেই কিনা জানি না রঘু আইচুকতির উপর এতোই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে সে কোথায় আছে, কোত্থেকে এসেছে, সবই প্রায় ভুলে গেল। ভোলাকে দেখে রঘু যেন আবার নিজেকে ফিরে পেল।

'আরে ভোলাকা, তুমি আমাকে চিনতে পারোনি?'

হাসতে হাসতে ভোলার প্রায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার অবস্থা, 'ভাতিজা! একি বেশ ধরেছ তুমি? তোমাকে একদম পাহাড়ি লাগছে। এই ব্যাটা নামাও এটা।'

রঘু লাঙ্গাটা নামিয়ে রেখে অস্থায়ী ছাউনি দেওয়া বাঁশের মাচানে ভোলার পাশে বসল।

'কার সাথে বাজারে এলে ভাতিজা?'

'আইচুক।'

'বিনন্দর মাইয়াটা?'

'হুঁ।' রঘু অপরাধীর মতো মাথা নাড়ে।

'খুব সুন্দর মাইয়া। লাল মরিচের মতো একদম জম্পেশ। নাক, চোখ, মুখও টানটান। সাধারণ পাহাড়িদের মতো না। মেয়েটা আবার পড়াশোনাও করেছে। ওর দাদুটা তো শিক্ষিত মানুষ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। নাতি নাতিনকে নিজেই পড়ায় বুড়া। এই এলাকায় মাত্র পাঁচ সাতটা বাচ্চাই ইস্কুলে যায়। তার মধ্যে বিনন্দের বাচ্চাগুলাও আছে।

'ওরা কিন্তু খবু ভাল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভাল মানুষ। তবে একটাই সমস্যা।'

'কি?'

'বিনন্দর বাবার সাথে জিএমপির যোগাযোগ আছে।'

'জিএমপি কি ভোলাকা?'

'এই ব্যাটা আস্তে কও। লোকে শুনলে ঝামিলা হয়ে যাবে। গণমুক্তি পরিষদ।'

হঠাৎ একদল লোক এসে পড়ায় ওদের কথা মাঝ পথে থেমে যায়। ভোলা ওদের ডেকে কাছে নিয়ে আসে। যদিও আরও কয়েকজন দালাল ওদের ডাকছিল। কিন্তু ওরা যেন আগে থেকেই স্থির করে আছে এখানেই আসবে। জনা দশেক ভিন্ন বয়েসের পুরুষ মহিলা। তুলা, মিষ্টি কুমড়ো, ধান, পাট সবই আছে ওদের কাছে। বয়স্ক লোকটা ভোলার কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'মাজন কই?'

'মাজন আসে নাই, ছোট মাজন আছে।'

রঘুর দিকে অসহায়ের মতো তাকায় লোকটা। 'ছোট মাজন তোমার মাল লও। আর দাদনের টাকা বাদ দিয়া বাকিটা আমারে দাও।'

ভোলা তার লোকদের ডাক দিয়ে বলল, 'এই জিনিসগুলি মেপে দেখতো কত হল।' লোকগুলি মাপছিল পাটের বোঝা, ধান, তুলা আরও কত কি। ওরা মেপে মেপে ভোলাকে হিসেব দিয়ে মজুত করছিল। রঘু খেয়াল করছিল কি অবলীলায় তিন মন পাটের বোঝা আড়াই মন হয়ে যাচ্ছে, এক মন ধান আধ মন হয়ে যাচ্ছে। অথচ ঐ লোকগুলি বসে বসে বাঁশের হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে কোন প্রতিবাদ করছে না। মেয়েরা সব পাতায় পেঁচিয়ে নিয়ে আসা ভাত খেতে বসেছে। রঘু অসন্তুষ্ট স্বরে বলল, 'এসব কি হচ্ছে ভোলাকা?' ভোলা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'শ্ - শ্ - স্ চুপ করে থাক। যা বলার পরে বলবে।'

মাল মাপার পর ভোলা গুনে গুনে বিশ টাকা হাতে নিয়ে বুড়োকে ডাকল। বুড়ো দুই টাকার নোটগুলি দুই হাতের আঙুলে ছড়িয়ে ভোলাকে জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা মাজন?'

'বিশ টাকা।'

'মাত্র বিশ টাকা! এইটা কি দিলা মাজন? গত মাসে বড় মাজন দিল ত্রিশ টাকা। আর দুই বোঝা পাট বেশি এনেও বিশ টাকা?'

'আরে বুড়া দাদনের টাকা কাটব না?'

'গত বাজারেও তো দাদনের টাকা কাটছে।'

'তুমি বড় বেশি কথা কও বুড়া। আরও জিনিস নেবে না? ও বাছই ফাইদি।'

মাঝবয়সী মহিলা এগিয়ে আসেন। 'কও মাজন?'

'তোমার নাকি গায়ে জ্বর এসেছে?'

'গায়ে জ্বর!' বাছই অবাক হয়ে তাকায় ওর স্বামীর দিকে। মহিলা নিজেই জানেন না ওর কখন গায়ে জ্বর এসেছে।'

'আরে টের পাচ্ছ না? তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি তোমার গায়ে জ্বর এসেছে। দেখো অসুখ বিসুখ নিয়ে একদম অবহেলা করবা না। যদি

বিছানায় একবার পড়ে যাও দাদা তোমার দিকে তাকাবেই না। আবার বিয়ে করবে। এই নাও ট্যাবলেট দিনে দুইট্যা।'

তারপর মুচকি হেসে একটু নিচু গলায় বলে, 'খেয়ে নাও দেখবে তুমি আরও জওয়ান ও সুন্দরী হয়ে যাবে। দাদা কেন গ্রামের সব লোক বাছইর জন্য পাগল হয়ে যাবে।' বাছই অষুধ হাতে নিয়ে কপট রাগ দেখিয়ে বলে, 'ধুর যা।'

ভোলা অতি বৃদ্ধ লোকটাকে ডাকে, 'দা-বুড়া তোমার বোতলটা দাও। এই এক বোতল কেরোসিন দিয়ে দে। সিঁদল আর কিছু লবণও দিয়ে দিস ওদের।'

সামনে টাঙানো মালা আর চুড়ি দেখে মেয়েগুলি এগিয়ে আসে। চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে মালাগুলির দিকে তাকায় ওরা। ভোলা ওদের মালা ও কিছু চুড়ি দিয়ে বুড়াকে আবার ডাকে, 'ও মামা শোন।' বুড়া আসে। ওকে এক বান্ডিল বিড়ি দিয়ে বলে, 'মামা এই নাও।'

'আমার কাছে টাকা নাই।'

'আরে ব্যাটা টাকা লাগবে না নাও।'

এবার লোকটা বিড়ির বান্ডিলটা ধুতির কোচড়ে গুঁজে দেয়। লোকটা এবার ভোলাকে অনুরোধ করে, 'মাজন তুমি তো মা বাপ, অতো কম টাকা দিলে চলব কি করে?'

'আরও টাকা চাও মামা?'

'হ।'

'কতো টাকা?'

'আরও দশ টাকা দ্যাও।'

'দেব। দশ টাকা না বিশ টাকাই দেব, তোমাকে যে বলেছিলাম চারটা হাতির দাঁত আনতে, এনেছো?'

'হাচা বলছ দিবা বিশ টাকা?'

'এই নাও বিশ টাকা। দাও।'

বুড়ো টাকাটা নিয়ে আবার কোমরে গুঁজে নেয়। তারপর ভোলার কানের কাছে গিয়ে বলে, 'ফষ্টারবাবু তাকিয়ে আছে। ঐ যে দেখছ ফুলঝাড়ুর মুঠা তার ভেতর আছে নিয়ে নাও।' ভোলা ঝাড়ুর মুঠাটা টেনে ভেতরে এনে ঢুকিয়ে দিল।

বাজার প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ছোট ছোট দলে লোকজন দুর দুরান্তের পাহাড়ি রাস্তায় হারিয়ে যাচ্ছে। রঘু ঐ হারিয়ে যাওয়া মানুষদের দিকে আনমনে তাকিয়ে রইল। তাদের পায়ের ধুলো উড়ছে বাতাসে। কোত্থেকে বন্যার জলের স্রোতের মতো ভেসে আসে এতো মানুষ, আবার কোথায় হারিয়ে যায়? ঠিক এমন সময় আইচুকতি এসে রঘুকে ডাকল।

'এই ছোট মাজন কি করছো এখানে? চল বাড়ি যাব।'

'আরে আইচুক তুমি কোথায় চলে গেলে? আমি তোমাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমি তোমাকে দেখেছি এখানে বসে আছ। চল ফিরে যাই।'

'তোমার মা বাবা?'

'আমাদের পাড়ার সবাই একসাথে চলে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। চল আমরাও তাদের সাথেই চলে যাব। ফাঁকে আমরা কয়েকজন মিলে তোমাকে বটের দাড়ি দেখাতে নিয়ে যাব।'

'বটের দাড়ি?'

'হ্যাঁ বিশাল বড় একটা বট গাছ আছে তার ইয়া লম্বা লম্বা দাড়ি। যাবে? এই তো কাছেই। তাছাড়া হনুমান পাড়া, হরিণমারা এই পথেই পড়বে।'

রঘু বাঁশের মাচান থেকে লাফিয়ে নেমে বলল, 'চল যাই।'

'একটু দাঁড়াও।'

আইচুকতি লাংগাটা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে চলতে গিয়েও হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। এদিকে ভোলা তখন একদল রিয়াং রমণীর সাথে কথা বলছে।

'আরে তোমার টাকার মালাটা তো পুরানো হয়ে গেছে। এটা এখন আর তেমন সুন্দর লাগছে না। এই দেখ আমার নতুন টাকার মালা চক্‌চক্ করছে। তোমার পুরানটা আমাকে দাও আমি তোমাকে এই নতুনটা দেব। তাছাড়া আরও তিনটে পুঁতিরমালা দেব। এই দেখ, এই দেখ কি সুন্দর।'

ওরা নতুন টাকার মালা গলায় জড়িয়ে দেখে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল। পুঁতিরমালার চক্‌মকি রঙ দেখে ওরা আরও খুশি হয়ে যায়। আইচুকতির চোয়াল শক্ত হতে থাকে। হঠাৎ রেগে আইচুকতি ওদের কি যেন বলে। প্রত্যুত্তরে ওরাও কিছু বলে। কিন্তু ওদের মধ্যে অন্তত দুজন ওদের পুরানো টাকার মালা ভোলাকে দিয়ে নতুন টাকার মালা গলায় জড়িয়ে নেয়।

তখনও রাগে ফুঁসছিল আইচুকতি। রঘু জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে আইচুক?'

'কেউ যদি নিজে মরতে চায় তাকে কে বাঁচাবে বল?'

'তা ঠিক।'

'এই পুরানো টাকাগুলির অনেক দাম। আমি ওদের বললাম ওগুলি মাজনকে দিও না। ওরা শুনলই না। উল্টে আমাকে একটা বাজে কথা বলল।'

'কি বলেছে?'

'এটা তোমাকে বলা যাবে না। চল যাই।'

২

আইচুকতি তার প্রতিবেশী ও মা বাবাকে ধরার জন্য ছুটতে লাগল। সে সামনে ছুটছে হরিণীর মতো, পেছনে রঘু। মাথার উপর মিষ্টি রোদ শীতের দুপুরে ভালই লাগছে বেশ। কিন্তু বেশ খানিকটা ছুটে গিয়েও ওর মা বাবাকে খুঁজে পেল না আইচুকতি। ওরা কি পরিচিত রাস্তায় না গিয়ে অন্যদিকে চলে গেল? চারিদিকে বট, শিরিষ, চাঁপা, সেগুন, কড়ই, চামল, গামাই, আগর গাছের মিছিল। তাছাড়া বাঁশের ঝাড়, বনফুল ও কাঁটার ঝোপঝাড় ভরা টিলাভূমি। ছুটতে ছুটতে বিশুদ্ধ বাতাস বুক ভরে টেনে নেয় রঘু। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওরা কতক্ষণ এভাবে ছুটেছে হয়তো নিজেরাই বলতে পারবে না। সরু পাহাড়ি রাস্তায় কিছুক্ষণ পরেই দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে যায় তারা। সীমাহীন জঙ্গালের চাদর গায়ে জড়ানো পাহাড় আর মাথার উপর আদিগন্ত বিস্তৃত নীলিমা ছাড়া কিছুই তাদের চোখে পরিচিত মনে হল না। হঠাৎ একটু দমে গেল আইচুকতি। মা বাবাকে খুঁজে না পেয়ে বটের দাড়ির কাছে দ্রুত চলে আসার জন্য সে ফাড়ি রাস্তা ধরেছিল। কিন্তু অনেকটা দূর চলে আসার পরও যখন রাস্তা শেষ হল না, তখন সে বুঝতে পারল কোথাও হয়তো ভুল হয়ে গেছে। আইচুকতি এবার থমকে দাঁড়াল।

'কি হল আইচুক, দাঁড়িয়ে পড়লে যে? আর কত দূর বটের দাড়ি?'

'রাস্তাটা এখানে শেষ হয়ে গেল!'

রঘু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে সত্যিই তো রাস্তাটাও যেন হঠাৎ আইচুকতির মতো এখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

'তার মানে আমরা ভুল পথে এখানে এসেছি?'

'তাই হবে।' চিন্তিত হয়ে বলল আইচুকতি।

'তাহলে এখন?'

'ভয় পাচ্ছ কেন ছোট মাজন আমি তো আছি।'

'এদিকটায় বাঘ আসে?'

'যেদিকে মানুষের পায়ে চলার চিহ্ন স্পষ্ট থাকে সেখানে দিনের বেলায় বাঘ সাধারণত আসে না।'

'কিন্তু মানুষের চলার পথ এখানে শেষ হয়ে গেছে। তার মানে সামনে বাঘ থাকতেই পারে।'

'থাকুক না। থাকলেই বা কি?'

'থাকলেই কি মানে? আমাদের এখানে প্রতিমাসে দু চারটে মানুষ বাঘের পেটে যাচ্ছে।'

'বল কি! সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। ঘনা শীলের মা এখনও চেঁচিয়ে রোজ কাঁদে। কেন জান?'

'কেন?'

'ঘনা বাঁশ কাটতে গিয়েছিল দুপুরবেলা। তার মাকে বলে গিয়েছিল জ্বালানির লাকড়িটা নিয়ে এসে সে দুপুরের ভাত খাবে। কিন্তু সে আর কোনদিন ভাত খেতে ফেরেনি তার মা'র কাছে। কারণ বাঘ জঙ্গলে ঘনাকে সেদিন মেরে খেয়েছিল।'

'ইস মা। আমাদের এখানেও বাঘের পেটে মানুষ গেছে কিন্তু খুব কম। কারণ বন্দুক দিয়ে বাঘকেও আমরা মেরেছি। তাই বাঘও এদিকে আসতে ভয় পায়।'

দুজনে আবার চলতে শুরু করল। আইচুকতির ভীষণ লজ্জা লাগছিল। কোথায় সে ভেবেছিল মণিমালা, ছবিকন্যাদের সাথে মিলে ছোট মাজনকে নিয়ে একসাথে ঘুরবে, কিন্তু এখন সে একা হয়ে গেল। মা, বাবা ও এলাকার অন্য লোকেরা মিলে যে দলটা ছিল তাদের উপর ভীষণ রাগ হল আইচুকতির। অচেনা ছেলে মাত্র একদিনের পরিচয়, ওর সাথে একা পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো কি ঠিক হবে? লোকে দেখে ফেললে কে কি বলবে কে জানে? তবে যে যাই ভাবুক এসেই যখন পড়েছে তখন বটের দাড়ি ছোট মাজনকে দেখিয়েই সে ঘরে ফিরবে।

ওরা আরও দুর্গম জঙ্গালের দিকে হারিয়ে যেতে লাগল। আইচুকতি দেখতে পাচ্ছিল তারা ঘন গভীর জঙ্গালে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে। আরও আরও গহীন অরণ্য তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। বেপরোয়া ছুটে যাচ্ছে তারা, তবু আইচুকতির মনে এতটুকু ভয় নেই সীমাহীন আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছে সে।

কিন্তু রঘু এবার ভয় পেয়ে গেল। প্রতিদিন চলার রাস্তা অনেক আগেই হারিয়েছে ওরা। তবু দুয়েকটা জায়গায় মানুষের সামান্য অস্তিত্ব যাও ছিল এদিক ওদিকে তাও যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। বিশাল বড় বড় সব গাছপালা, অগম্য জঙ্গালাকীর্ণ কাঁটার ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু নেই। অরণ্যের ভেতর অসংখ্য পোকা মাকড়ের একঘেয়ে ভারি শব্দের অনুরণন শোনা যাচ্ছে। গাছের ঝোপের ভেতর পথ খোঁজে বেরিয়ে আসাটাই যেন একটা বিরাট ব্যাপার। অনেকটা যুদ্ধ করার মতোই দুজনে অনবরত ঝোপঝাড় কেটে, মরা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে গলে, আরও গহীন অরণ্যের মধ্যে চলে গেল। জনমানবহীন অরণ্য কোথাও মানুষের কোন চিহ্ন নেই। কিছুতেই বুঝতে পারছে না রঘু কোন্ পথে ওরা ঘরে ফিরে যাবে। আইচুকতি এবার সূর্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'ছোট মাজন আমরা এবার সত্যিই পথ হারিয়েছি।'

কথাটা বজ্রাঘাতের মতো ঝটকা দিল রঘুর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে। তার মনটা

হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। অচেনা এই জঙ্গল থেকে কি করে ফিরে যাবে সে? কোথাও কোন মনুষ্যবসতির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। রঘু বুঝতে পারছে ওরা ঘন্টাছড়া বাজার থেকে অনেক অনেক দুরে চলে এসেছে। কিন্তু এখন আরও দুরে চলে যাচ্ছে কিনা কে জানে? জঙ্গলের অচেনা পশু পাখির শব্দ পরিবেশটাকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। আইচুকতির এতক্ষণ ধরে হরিণীর মতো চলার গতি হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল। আগের মতো ছটফটানিটা সে হারিয়ে ফেলেছে। বিড়বিড় করে কি সব যেন অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলে গেল। অবশেষে একটা গাছের মড়া ডালে বসে পড়ল আইচুকতি। রঘুর তখন মনে পড়ল ভোলার উপদেশগুলি, জঙ্গলে এভাবে বসতে নেই। বাঘ মানুষকে বাঁদর মনে করতে পারে। রঘু ভাবল, এখানেও বাঘ ওদের অনুসরণ করছে না তো?

কালবিলম্ব না করে রঘু টাক্কাল দিয়ে দুটি বাঁশ কেটে লাঠি বানিয়ে নিল। যার একটা দিক বল্লমের ফলার মতো তীক্ষ্ণ করে নিয়ে আইচুকতিকে ডাকল।

'এই আইচুক ওঠ। কি হল?' আইচুকতি নীরবে মাথা নিচু করে বসে রইল। হঠাৎ রঘুর দিকে তাকিয়ে ওর চোখ ছলছল করে উঠল।

'একি তুমি কাঁদছ আইচুক?'

'আমি তোমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি ছোট মাজন।'

'সেকি! তুমি আমাকে বিপদে ফেলবে কেন? আমি তো ইচ্ছে করেই এসেছি তোমার সাথে।'

'মা বাবা যে রাস্তায় গেছে আমি সেই রাস্তাটাই হারিয়ে ফেলেছি।'

'তাতে কি হল, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমরা ঠিক ঘরে ফিরে যাব। তুমি আমার উপর ভরসা রাখ।'

'না পারবে না।'

'কেন?'

'তুমি কেন বুঝতে পারছো না ছোট মাজন এই পাহাড়কে আমি নিজের থেকে বেশি জানি, নিজের হাতের তালুর মতো ওকে চিনি। এখানে পথ আমি হারাতে পারি না।'

'তা সত্যি, পথ হারানো তোমার পক্ষে মুশকিল।'

'তবু হারিয়েছি তো?'

'তা ঠিক।'

'আর পথ আজকে খুঁজে পাব না। বিকেল হয়ে গেছে, আমাদের খিদে পেয়েছে, শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তা কিসের লক্ষণ তুমি বোঝ না?'

'কিসের লক্ষণ?'

'আমরা মরব, সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের।' বলেই হাউ মাউ করে আবার কেঁদে উঠল আইচুকতি।

রঘু অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কান্না থামাল। 'কি মুশকিল তোমাকে নিয়ে

আইচুক, আমরা এখনো মরে যাইনি তো।'

'আমরা ঠিক মরে যাব দেখবে। হয়তো হাতি মারবে, না হয় বাঘ, না হয় না খেয়ে এমনিই মরে পড়ে থাকব।'

'কিন্তু কেন এমন মনে হচ্ছে তোমার বলবে তো?'

'বুরাছার অভিশাপ লেগেছে আমাদের উপর।'

'বুরাছা কে আইচুক?'

'দেবতা।' হাত তুলে প্রণাম করে আইচুকতি।

'কিন্তু আমরা তো কোন পাপ করিনি। তিনি আমাদের অভিশাপ দেবেন কেন?'

'করেছি।'

'কি পাপ করেছি আমরা?'

'মা বলেন পরিবারের লোক ছাড়া অন্যদের সাথে বড় মেয়েদের জঙ্গলে যাওয়া উচিত নয়। বুরাছা অভিশাপ দেয়।'

'আরে আমরা জঙ্গলে ইচ্ছে করে তো হারিয়ে যাইনি। পথ হারিয়েছি।'

'ও একি কথা হল।'

'তা কি করলে বুরাছা খুশি হবে?'

'জানি না।'

'এই আইচুক চলো তো, কি বোকার মতো বক্‌বক্‌ করছো। সন্ধ্যে হতে আরও ঘন্টাখানেক সময় আছে ঠিক পথ খুঁজে নেব আমরা।'

আইচুকতি উঠল বটে কিন্তু সে ভাল করে হাঁটতে পারছিল না। রঘু ঠিক উল্টো পথ ধরে হাঁটতে লাগল। বারবার উৎসাহ দিয়ে আইচুকতিকে চাঙ্গা করছিল রঘু। আর তখনি ঘটল আরেক বিপত্তি। একদল লোক বন্দুক নিয়ে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। রঘু আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওদের ডাকতে যাচ্ছিল। অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখ চাপা দিল আইচুকতি। ততক্ষণ মুখ চেপে বসে রইল সে যতক্ষণ শেষ লোকটিও চোখের আড়ালে চলে না যায়। ওরা চলে যাওয়ার পর বেশ বিরক্ত হয়েই রঘু জিজ্ঞেস করল, 'কি হল মুখ চেপে বসে রইলে যে? আমরা ওদের সাথেই তো চলে যেতে পারতাম।'

'ওদের জান?'

'না।'

'ওদের আমিও ভাল জানি না। এরা ত্রিপুর সেনাও হতে পারে আবার প্রতিরোধবাহিনীও হতে পারে। এই দলটা যদি ত্রিপুর সেনা হোত তবে আমার রক্ষা ছিল না। কারণ আমি – । তবে প্রতিরোধবাহিনী হলে আমাকে কিছুই করতো না। কিন্তু তুমি জ্যোতিবাবুর ভাতিজা শুনলে তোমার সাথে কি ব্যবহার করতো আমি জানি না।'

'কি করতো?'

'তোমাকে ধরে ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতো অথবা গুলি করে মারতো। দুজনেই বেঁচে গেছি, বুরাছা এই যাত্রা বাঁচিয়েছে।'

'প্রতিরোধবাহিনীর লোকেরা জঙ্গলে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে কেন?'

'তোমরা মহাজনরা যে কৌশল করে, ঠগিয়ে গরিবদের সব লুট করে নিয়ে যাও। তোমাদের সরকার পুলিস, মিলিটারি দিয়ে গরিব পাহাড়িদের উপর অত্যাচার করে তা বন্ধ করতেই ওরা হাতে হাতিয়ার নিয়েছে।'

'তুমি এতসব জানলে কি করে?'

'আমি শুনেছি।'

'ও তোমার দাদুতো জিএমপির লোক।'

আইচুকতি চোখ কপালে তুলে বলল, 'তোমাকে এ কথা কে বলল?'

'সবাই জানে। কিন্তু আইচুক তুমি ওদের সাথে চলে গেলেই তো পারতে?'

'তোমাকে একা ফেলে আমি যাব কি করে ছোট মাজন?'

অবশেষে দুজনে আবার ছুটতে শুরু করল। সূর্যটা ওদের দৌড়ের তালে তালে পেন্ডুলামের মতো হেলে পড়া পশ্চিমের আকাশে দুলতে লাগল। একটু একটু করে আশা জাগছে রঘুর, কেন যেন তার মনে হচ্ছে সে ঠিক ফিরে যেতে পারবে। এমন সময় আবার বিপত্তি। নড়বড়ে পায়ে ছড়ার কিনারে ছুটতে গিয়ে আইচুকতি এমনভাবে পড়ে গেল তার পা বাঁশের মুড়ায় লেগে অনেকটা কেটে গেল। কাটা জায়গা থেকে গল্ গল্ করে রক্ত ছুটছে। আর্তনাদ করে টিলার উপর থেকে ছড়ার নিচে পড়ে গেল আইচুকতি। লাফিয়ে নেমে ওকে ধরে বসাল রঘু। পায়ের কাটা অংশে হাত চাপ দিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই রক্ত পড়া বন্ধ হল না। বন্য পিশাচ গাছের পাতা খৈনির মতো হাতের তালুতে ডলে তার রস পাতা সমেত চেপে ধরল কাটা জায়গায়। জ্বালা করায় কঁকিয়ে উঠল আইচুকতি। তবে এবার কাজ হল। রক্ত পড়া বন্ধ হল। কিন্তু আইচুকতি আর উঠে দাঁড়াতেই পারছে না। শরীরের আঘাত যেন ওর মনে গিয়ে লাগল আরও বেশি। ওর বদ্ধমূল ধারণা হল যে বুরাছার অভিশাপেই এসব হচ্ছে। এই বিশ্বাস এবার আরও বড় শেকড় ছড়াতে লাগল তার মনে। এদিকে ওর লাঙ্গা উপর থেকে নিচে পড়ার সময় ভেঙে গেল। এটাকে ছড়ার জলে ছুঁড়ে দিল আইচুক। 'আমি তোমাকে বলেছি না ছোট মাজন আমরা এবার ঠিক মরে যাব দেখবে।'

'তুমি কেন মন খারাপ করছো আইচুক? আমি তো আছি।'

'তুমি কি করবে? আমি তো হাঁটতেই পারছি না।'

'তুমি হাঁটতে না পারলে কি হল আমি তোমাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাব।'

চোখে জল নিয়েও আইচুকতি এবার হাসল। 'ধ্যাৎ, আমি তোমার কাঁধে চড়ব না।'

'কেন? তুমি ব্যথা পেয়েছ, অসুস্থ, হাঁটতে পারছো না।'

'চালাকি করবে না ছোট মাজন আমাকে একা পেয়ে।'

এবার দমে গেল রঘু। আইচুকতি তার অযাচিত সাহায্যের মধ্যে দুরভিসন্ধি খুঁজে পেয়েছে। তাহলে আর বেশি দরদ দেখানো ঠিক হবে না।

'তাহলে কি করবে এখন আইচুক? এখানেই বসে থাকবে?' আইচুকতি কোন উত্তর দিল না। সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সে টলতে লাগল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আইচুকতি। 'আমার ভয় করছে ছোট মাজন। ঐ যে, ঐ যে দেখো বিরুসেন চলে যাচ্ছে ওকে ডাক।'

'কোথায় বিরুসেন? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'ঐ যে - ঐ - চলে যাচ্ছে।'

রঘু এই ঘন নিবিড় জঙ্গালে কাউকেই দেখতে পেল না। আইচুকতির কথার মধ্যে একটু অসংলগ্নতা লক্ষ্য করল সে। আইচুকতি টলছে। সে কি ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে? রঘু আলতো করে থাপ্পর দিল আইচুকতির গালে। তারপর জোরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিতেই আইচুকতির সম্বিৎ ফিরে এল।

'কি হয়েছে?'

'কোথায় বিরুসেন? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না?'

'বিরুসেন! আমি বলেছি?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো অনেক আগেই মরে গেছে।'

রঘু এবার সত্যিই অবাক হল। মৃত বিরূসেনকে কি করে দেখতে পেল আইচুকতি? এটা কি বিভ্রম? না সত্যিই দেবতার কোন প্রভাব। রঘু ভাবতে ভাবতেই জিজ্ঞেস করল, 'কি করলে তোমার দেবতা খুশি হবেন?'

লাজুক মুখে আইচুকতি বলল, 'জানি না।'

'তাহলে চল এখানে বসে থাকলে তো চলবে না।'

'আমি পর মানুষের কাঁধে চড়তে পারব না।'

'তোমার নিজের মানুষ এখন কোথায় পাব আমি?'

'জানি না।'

'কি করলে তোমার দেবতা খুশি হবেন?'

'কি জানি। তবে - ।'

এইটুকু বলেই জিভে কামড় দিয়ে থেমে গেল আইচুকতি। রঘু আইচুকতির না বলা কথাটা আন্দাজ করতে পারল। ধোঁয়াশা থাকলেও আন্দাজের উপর নির্ভর করেই সে হেসে বলল, 'আমি কি তোমার পর আইচুক?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নিজের পুরুষটা কে নামটা বল? তাকে ধরে নিয়ে আসব।'

'বললাম তো জানি না।' রেগে উত্তর দিল সে।

তার মানে জঙ্গালে কুমারী মেয়েদের একা বের হওয়া ঠিক নয়। ধর্মীয় অনুশাসনে মেয়েদের ঘরে বেঁধে রাখার সহজ কৌশল। কিন্তু আইচুকতির নিজের

মানুষ মানে বাবা, ভাই অথবা বর এখন কোথায় পাবে রঘু। ভুল তো আইচুকতি করেই ফেলেছে, এখন বুরাছার কু-দৃষ্টি থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যায়? রঘু ভাবল, আইচুকতির মনের বিশ্বাস এবং শক্তি যদি ফেরাতে সে না পারে তাহলে এই জঙ্গল থেকে সন্ধ্যার আগে কিছুতেই বেরুতে পারবে না। আর সন্ধ্যা হয়ে যাওয়া মানেই ভয়াবহ মৃত্যুকে আলিঙ্গান করা। মেয়েটার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে না আনতে পারলে লোকালয়ে পৌছতে সমস্যা হবে। একটা কিছু করা দরকার না হয় দুজনকেই মরতে হবে। রঘু মজা করে বলল, 'এই আইচুক আমাকে তোমার কেমন লাগে?'

একটু অবাক হল আইচুকতি প্রশ্ন শুনে। তাও বলল, 'কেন ছোট মাজন?'

'না এমনিই। বলো না?'

'তুমি তো ভাল ছেলে।'

'তোমার যোগ্য তো?'

এবার আইচুকতি পরবর্তী সম্ভাব্য আলোচনার বিষয়টা অনুমান করতে পেরে কপট রেগে বলল, 'জানি না।'

'ঠিক আছে বেশি জানার দরকার নেই। চল আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

লজ্জা পেয়ে মুখ ঢেকে ফেলল আইচুকতি, 'এই ধ্যাৎ, কি ফাজলামো করছো ছোট মাজন?'

'না না সত্যি বলছি। আমি মোটেই ফাজলামি করছি না।' আইচুকতি রঘুর পিঠে দমাদ্দম কয়েকটা কিল বসিয়ে দিল। 'আমি এখন অনেক বড়, বিয়ে মানে কি আমি বুঝি। আমি তোমাকে ভালমানুষ ভেবেছিলাম ছোট মাজন।'

'ভালমানুষ ভেবে কাজ নেই বরং ভাব আমি তোমার নিজের মানুষ। এমনিতেই তো মরে যাব আমরা, তার চাইতে চল বাঁচার পথ খুঁজি। বুরাছার হাত থেকে বাঁচতে হবে তো? চল ওঠ।'

মুখে লজ্জা নিয়ে মাথা তুলে ফিরে তাকাল আইচুকতি। কোথাও আশা নেই। তার মধ্যে রঘুর এই গায়ে পড়া ভাল লাগছে না তার।

'আমি কিন্তু ফাজলামি করছি না, সত্যি বলছি। এবার বল আমাদের বিয়েতে সাক্ষী কে কে থাকবে?'

লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে উঠল আইচুকতির। সে কিছুই বলল না। তবে তার নীরবতার মধ্যে যেন একটা মৃদু প্রশ্রয় আছে সেটা রঘু অনুভব করল। তাছাড়া দেখাই যাক না সরল কিশোরীর বিশ্বাসের সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে। বিপদ থেকে বাঁচতে আইচুকতির মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে এটা একটা সহজ সমাধান। 'কি হল বল সাক্ষী কে থাকবে?

আইচুকতি মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে রইল। লজ্জায় সে যেন তাকাতেই পারছে না রঘুর দিকে।

'বিয়ের পর তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব?'

'না।'

'তাহলে তুমি কোথায় থাকবে?'

'চুপ কর।'

'ঠিক আছে চুপ করেছি। তবে আমাদের বিয়েতে সাক্ষী থাকবে ঐ যে দেখা যাচ্ছে লংতরাই, এই আঠারমুড়া আর এই ফুলগুলি। এই ফুলের নাম কি আইচুক?' চুপ করে রইল আইচুকতি। কিন্তু রঘুর চাপাচাপিতে বলল, 'কুথুইরগ্নিখুম। তুমি বড্ড ছেলেমানুষ ছোট মাজন। এদিকে আমাদের প্রাণ যায় আর তুমি সমানে বাজে বকবক করে যাচ্ছ।'

সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। রঘু তাড়া দিয়ে বলল, 'কি হল? ওঠ, চল।'

'আগে রক্ত মুছে নিই, না হয় বাঘ তার ফেওয়ালি রক্তের গন্ধ পেয়ে চলে আসবে।'

রঘু ছড়ার জল দিয়ে আইচুকতির ফর্সা পা থেকে রক্ত মুছে দেয়। আইচুকতি রঘুর উপর ভর করে উঠে দাঁড়াল বটে কিন্তু চেষ্টা করেও আর হাঁটতে পারল না। রঘুর কোলে বসে ছড়া পেরিয়ে একটু উঁচু জায়গায় উঠতেই লংতরাইকে স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা। আঠারমুড়া যদি একটা পাইথন হয় তাহলে রঘু ও আইচুকতি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে লেজ শেষ হওয়ার সামান্য আগে। আইচুকতি রঘুর কোল থেকে হঠাৎ নেমে পড়ল। আইচুকতির হাত ধরে রঘু আস্তে করে বলল, 'কি গো বিয়ে হবে না?' আইচুকতি লাজুক হেসে বলল, 'তুমিও পার ছোট মাজন। একটা কথা বলেছি কি আর ছাড়বে না।'

রঘু কয়েকটা কুথুইরগ্নিখুম কুড়িয়ে আইচুকতির উপর ছিটিয়ে দিয়ে বলতে লাগল চিৎকার করে, 'ওহে লংতরাই, ওহে আঠারমুড়া, ওহে কুথুইরগ্নিখুম আমি রাঘব প্রসাদ রায় তোমাদের সাক্ষী রেখে আইচুকতি দেববর্মাকে বিয়ে করলাম।' সারাটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে এই শব্দগুলি আবার ফিরে এলো ওদের কাছে। আইচুকতির চোখ দুটি হঠাৎ জলে ভরে গেল। কথাটা বলতে বলতেই আইচুকতিকে বুকে জড়িয়ে ধরল রঘু। এক ঝটকায় ছিটকে বেরিয়ে গেল আইচুকতি, 'আহ্ ছাড় ছোট মাজন। কি হচ্ছে?'

'ওমা তুমি আমার বউ না।'

'আমি তোমার কেউ না।' অভিমানে থমথমে মুখে রেগে বলল আইচুকতি।

'রাগ করেছো আইচুক?'

কোন উত্তর না দিয়ে আইচুকতি এবার হাঁটতে শুরু করল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। অনেকটা হাঁটার পর কিছুটা দূরে আমলকী গাছের সারি দেখতে পেল ওরা। আইচুকতির মনে হল এই জায়গাটা ওর বেশ চেনা চেনা লাগছে। ছড়ার পাশে উঁচু জায়গা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে এক টিলায় দুজনে বসে পড়ল। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রঘু অসহায় কণ্ঠে বলল, 'আজ বোধয় আর সামনে এগুতে পারব না

আইচুক।'

'তাহলে কি করবে ছোট মাজন?'

'ঐ গাছের ডালে একটা মাচান বাঁধব। আর নিচে লাকড়ি জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেব। আগুন দেখলে জন্তু জানোয়ার আর কাছে আসবে না।'

'একটা মাচান বাঁধবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ঐ মাচানে ঘুমোব না।'

'কেন?'

'বললাম না আমি ওখানে ঘুমোব না।'

'নিজের বৌকে নিয়ে ঘুমোব - তোমার কিসের অসুবিধে?' দুষ্টুমি ভরা গলায় বলল রঘু।

'আমার অসুবিধা আছে।'

'এই বুরাছা রাগ করবে। এখনো আমরা জঙ্গল থেকে বেরুবার পথ পাইনি।'

'একদম ইয়ার্কি করবে না ছোট মাজন।' আইচুকতি এবার সত্যিই রেগে গেল। বিপদে পরে সামান্য প্রশ্রয় দিতেই রঘু যেন তার সুযোগ নিতে চাইছে। রঘু বাঁশে টাক্কালের কোপ বসাতে যাবে এমনি গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, 'এই যে রাঘব একদম নড়বে না। শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি।'

কথাগুলি এতো চাপা স্বরে কঠোর আদেশের মতো ভেসে এলো কয়েক মুহূর্ত স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল ওরা। দুজনেই এমন চমকে উঠল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ওদের বালখিল্যতা যে এভাবে অজান্তে কারো গোচরে আসবে ওরা বুঝতেই পারেনি। আইচুকতি জিহ্বায় এক লম্বা কামড় দিয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল। তবে চমকে উঠলেও এই মনুষ্য কণ্ঠস্বর ওদের ভরসা দিল। কিন্তু শব্দটা কোত্থেকে এল সেটাই বুঝতে পারছে না দুজনে। কণ্ঠ আবার চাপা স্বরে ডাকল, 'এই, এদিকে ঝোপের দিকে চলে আয় - হরিণ পালিয়ে যাবে।'

এবার রঘুর নজরে পড়ল ঝোপের মধ্যে কৃত্রিম আরও একটা ঝোপ বানিয়ে তিনজন লোক শুয়ে আছে। শুধু একজন লোকের হাতেই বন্দুক। রঘু বুঝতে পারল এই লোকটাই বাচ্চু চৌধুরী, রিটায়ার্ড আর্মি। লোকটার আদেশ এতো গুরু গম্ভীর ছিল রঘুরা অমান্য করতে পারেনি। তড়িঘড়ি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দুজন। রঘুর পাশেই শুয়ে ছিল আইচুকতি। ওর নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছিল রঘুর ডান হাতের উপর। ওর শ্বাসের হাওয়ায় রঘুর হাতের লোমগুলি বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

সামনে অনেকটা দূরে আমলকী গাছের নিচে সতর্ক চিতল হরিণের দল। গায়ে ছুপ ছুপ খয়েরি রঙের দাগ। হরিণগুলি খাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে এলোমেলো। সতর্ক হয়ে কান খাড়া করে প্রতিটি শব্দকে পরখ করে নিচ্ছে। এক একটা গাছ

পেরিয়ে ওরা এগিয়ে আসছিল রঘুদের দিকে। রাতের আশ্রয়টা বোধ হয় এই চিতল হরিণের দল এখানেই নেবে। প্রতিটি মানুষ টানটান উত্তেজনায় নিষ্পলক চোখে ঐ দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা ক্রমশ কাছে আসছে আরও কাছে। রঘু প্রহর গুনছে এই বুঝি বন্দুক গর্জন করে উঠবে। কিন্তু উঠছে না। হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে 'দড়াম' করে বন্দুক গর্জে উঠল। হরিণ খুড়ের আঘাতে ধুলো উড়িয়ে জঙ্গালে মিশে গেল। কিন্তু একটা হরিণ পালাতে পারেনি। একটা আঘাতেই ছট্‌ফট্ করে পড়ে গেল মাটিতে। এদিকে মনীন্দ্র ও গিরীন্দ্র ছুটে গেল হরিণের দিকে। আর বাচ্চু চৌধুরী সোজা চলে এলেন রঘু ও আইচুকতির সামনে। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ওরা দুজন তখন শ্বাস বন্ধ করে চুপটি মেরে বাচ্চুবাবুর প্রতিক্রিয়া মেপে নিতে চাইল। কিন্তু বাচ্চুবাবু এই পথে হাঁটলেন না। তিনি ওদের দেখে বললেন, 'কি রে তোদের চোখ মুখের এই অবস্থা কেন? সারাদিন খাসনি কিছু?' দুজনে মাথা নুইয়ে ফেলে, 'দাঁড়া দাঁড়া শুয়োরের ভর্তা আর ভাত তো আছে খেয়ে নে।'

বাচ্চু চৌধুরী তখন বন্ধ মাতাল হাত পা টলছে। কিন্তু কথাবার্তায় তেমন অসংলগ্নতা নেই। কলাপাতার দুটো পোঁটলা ওদের সামনে এনে ধরে বললেন, 'এই খেয়ে নে।' কথাটা বলেই উনি মড়া হরিণটার দিকে চলে গেলেন। লোকটার ইয়া বড় গোঁফ, সুন্দর স্বাস্থ্য, ফর্সা রঙ, মিলিটারি পোশাক, রঘুকে মুগ্ধ করল। এদিকে আইচুকতি দুটি পাতায় খাবার নিয়ে রঘুকে ডাকল। এতক্ষণ রঘু খিদের কথা ভুলে থাকলেও এবার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু খেতে গিয়ে আরেক বিপত্তি। আইচুকতি গোগ্রাসে গিলছিল কিন্তু রঘু থেমে গেল। সেদ্ধ মাংস আর কাঁচা পেঁয়াজ ও লঙ্কা দিয়ে তৈরি খাবারটা খাওয়া যাবে কিনা তাই ভাবছিল সে। আইচুকতি তাড়া দিল, 'খাও ছোট মাজন তাড়াতাড়ি খাও।'

'এই কাঁচা মাংস কি করে খাব?'

আইচুকতি হেসে বলল, 'আমরা এভাবেই খাই। শুয়োর ভর্তা তুমি খাওনি কখনো? খুব ভাল লাগবে খেয়ে দেখো।'

আর অপেক্ষা করতে পারল না রঘু। যাই হোক পেটেতোদুটো দিতে হবে। মুখে মাংসের টুকরো ও ভাত দিয়েই হেসে ফেলল, 'বাঃ বেশ স্বাদ তো!'

অন্ধকার ধীরে ধীরে পাহাড়ের শরীরে আরও নিবিড় ও মোলায়েম বাহু মেলে জড়াতে লাগল। হোক অন্ধকার তবু আর ভয় নেই। পেট ভরে খেয়ে আইচুকতির মুখেও হাসি ফুটল। পথ হারিয়ে যতটা ভেঙে পড়েছিল সে, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই ওর চোখে মুখে। রঘু ডাকল, 'কি হল আইচুক, পায়ের ব্যথাটা এবার কমেছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ কমে গেছে!'

'ভয়টাও আর নেই নিশ্চয়?'

'না, ভয় থাকবে কেন? বাচ্চু কাকারা আছে এবার ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাব।'

'আগামিকাল সকালে আবার তোমাকে কাঁদতে হবে।'

'কেন?'

'বারে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় মেয়েরা কাঁদে না?'

'মানে!'

'এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

'একদম ফাজলামো করবে না ছোট মাজন। ওরা শুনলে কি বলবে বল তো?'

'যাই বল আইচুক বিয়ে মানে তো বিয়েই।'

'এই ছোট মাজন তুমি আর কোনদিন এই কথা বলবে না।'

'কেন?'

'আমার খুব সরম করে।'

কথাটা বলেই আইচুকতি একটু দুরে সরে গেল। রঘুর খুব হাসি পেল, এই একটা দুর্বল জায়গা পাওয়া গেল আইচুকতির। যে কদিন পাহাড়ে থাকবে তাকে খেপানো যাবে। এদিকে একটা ডালে মড়া হরিণটাকে পায়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে গিরীন্দ্র ও মনীন্দ্র তাদের কাছে চলে এল। ওদের সামনে বন্দুক হাতে বাচ্চু চৌধুরী। উনি ওদের কাছে এসেই এক ঝটকায় আইচুকতিকে টেনে জড়িয়ে ধরলেন।

'কিরে আমাকে পছন্দ হয় না তোর বুড়ো বলে? কোথাকার কোন্ রাঘব প্রসাদ এখনও গোঁফ উঠেনি – বিয়ে করে ফেলল তোকে?'

আইচুকতি নিজেকে ছাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেও পারে না। মনীন্দ্র ও গিরীন্দ্র তখন হাসছে, হাসছেন বাচ্চু চৌধুরীও। অসহায় আইচুকতি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। রঘুর কেন জানি না ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না। রঘু যদিও ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারল না, ওরা কক্‌বরকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আইচুকতি বিরক্ত হয়ে কাতর কণ্ঠে বলল, 'এই কাকু ছাড় না।'

'ছাড়ব কেন? তুই আমাকে তো অনেকবার বিয়ে করেছিস। তুই তো আমারও বউ মনে নেই?'

'আহ্ ছাড় না।'

এবার বাচ্চু চৌধুরী ছেড়ে দেন আইচুকতিকে। বাচ্চুবাবু বন্দুকটা রঘুর কাছে দিয়ে বললেন, 'কি রাঘবেন্দ্র প্রসাদ চেঁচিয়ে পাহাড়কে সাক্ষী রেখে বিয়েটা সেরে ফেললি? তোর মা তাহলে আমাদের খাওয়াবেন না? এতো জোরে চিৎকার করলি, আর একটু হলে হরিণগুলি সব পালিয়ে যেত।'

লজ্জায় আইচুকতি ও রঘু মাথা নুইয়ে ফেলল। বাচ্চুবাবুদের কান অব্দি যে সবকটি শব্দ পৌছেছে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না ওদের। রঘু ভাবল, নির্জন পাহাড়ে এভাবে চেঁচানো একদম অনুচিত কাজ হয়ে গেছে।

'তবে পাত্রী খুব সুন্দরী বাছলে রাঘবেন্দ্র। বাঙালীর মধ্যেও এমন মেয়ে খুব একটা পাবে না। কি বল?'

'আমার ডাক নাম রঘু।'

'হ্যাঁ রঘুবীর, তা সময় হলে ওকেই বিয়ে করবে তো? না ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে?'

'আমরা পথ হারিয়েছিলাম। আইচুক বলল অবিবাহিত মেয়েদের একা জঙ্গলে বেরুতে নেই। বুরাছার অভিশাপ লাগে। তাই –।'

'এই খেলাটাই একদিন ওর কাছে সত্যি হবে। যখন তুমি চলে যাবে ওর কিশোরী মনে খুব আঘাত লাগবে।'

আইচুকতিও কথাগুলি চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনলো, কিন্তু কোন সাড়া দিল না। গিরীন্দ্র হাঁক দিল, 'এই বাচ্চুদা চল রাত হয়ে যাচ্ছে।'

দুটি আগুনের লুক্কা জ্বলে উঠল। একটি সবার আগে বাচ্চু চৌধুরীর হাতে অন্যটি সবার পেছনে রঘুর হাতে। মৃত হরিণকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা রাতের অন্ধকার ভেদ করে। রাতের আঁধারে বন্য প্রাণীরা যে যার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। আর রাতের নিষ্ঠুর শিকারী প্রাণীরা এখন বেরুতে শুরু করেছে। নীরবতা ভেঙে মাঝে মাঝেই এক একটা শব্দ অরণ্যের অন্ধকার ভেদ্ করে দুরে বহু দুরে হারিয়ে যাচ্ছে। আইচুকতি অন্যদের মতো দ্রুত হাঁটতে পারছিল না। সে ক্রমাগত পেছনে পড়ে যাচ্ছে, রঘু তার হাত ধরে কাছে টেনে নিল।

আকাশে চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। এদিকে লুক্কার কেরোসিনও শেষ হয়ে যাচ্ছে। লুক্কাগুলি বারবার উল্টে ধরে আগুনকে তাজা করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। রঘু আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কি আইচুক, পায়ে এখনো ব্যথা করছে?'

'হুঁ।'

'আমার কাঁধে চড়বে?'

জোরে একটা চিমটি কাটল আইচুকতি রঘুকে। রঘু এতো জোরে 'মাগো' বলে উঠল পুরো দলটা দাঁড়িয়ে গেল। বাচ্চু চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'রঘুবীর কি হল?' প্রথমটা থতমত খেয়ে উঠলেও চলনসই একটা উত্তর দ্রুত দিল রঘু, 'না কাকু, পায়ে কাঁটা ঢুকেছে।'

'কি রে কেটে গেছে?'

'না না ঠিক আছে।'

গিরীন্দ্র হেসে বলল, 'ইতা বুঝনা বাচ্চুদা মাইয়া পুলা এক হয়ে গেলে এমন কিছু হয়।'

'ঠিক আছে চল্ চল্।' তারপর হাঁক দিয়ে পেছনে বললেন, 'রাস্তাঘাট ভাল না। দেখে দেখে আসিস।'

আইচুকতি রঘুর হাত ধরে থামিয়ে দিল। ফলে দু-দলের মধ্যে সামান্য ব্যবধান তৈরি হল। ওরা বক্‌বক্ করতে করতে এগিয়ে যেতেই ওরাও আবার চলতে শুরু করল। আইচুকতি রঘুকে কয়েকটা কিল মেরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি

এতো জোরে চিৎকার করলে যে?'

'তুমি এতো জোরে চিমটি কাটলে যে।'

'তুমি কি বাচ্চা?'

'না তুমি পাকা বুড়ি।'

দুজনে আবার চলতে শুরু করল। ভালো লাগছিল রঘুর। কেমন করে দিনটা কেটে গেল আশঙ্কা, উদ্বেগ ও ভালোলাগার মধ্য দিয়ে সে যেন টেরই পেল না। হয়তো ভালো লাগছিল আইচুকতিরও। অন্তত আইচুকতির খুশি খুশি মুখটা দেখে তাই মনে হয়। নীরবতা ভাঙলো সে, 'ছোট মাজন তুমি কি আগামিকালই এখান থেকে চলে যাবে?'

'আমি ঠিক জানি না, ভোলাকা আমায় কিছু বলেনি।'

'চলে গেলে আবার কবে আসবে?'

'তাও জানি না।'

'আমাকে তোমার মনে থাকবে তো ছোট মাজন?'

'তোমাকে মনে থাকবে না মানে। তুমি আমার বউ, তোমাকে মনে থাকবে না?'

রেগে রঘুকে মারতে যেতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেল আইচুকতি। হঠাৎ ভয় পেয়ে ওর মুখটা যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। রঘুকে টেনে দ্রুত মাটিতে শুইয়ে দিল সে। আইচুকতি তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। রঘু আইচুকতিকে কাছে টেনে সামনে তাকিয়ে দেখে একটা অস্পষ্ট নারীমূর্তি, বোধ হয় নগ্ন হেঁটে চলে যাচ্ছে। যেন ছায়ার মতো অন্ধকারের সাথে মিশে আছে। নারীমূর্তিটা চলে গেছে অনেকক্ষণ, তবু আইচুকতি ভয়ে রঘুর বুকে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে। রঘু এবার সত্যিই অনুভব করল যতটা ছোট আইচুকতিকে সে ভেবেছিল, ততটা ছোট সে নয়। ওকে আরো কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরল রঘু। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল আইচুক এই পাগলীকে দেখে এতো ভয় পেলে কেন?'

অনুচ্চারিত কণ্ঠে আইচুকতি শুধু বলল, 'ডা - ই - ন।'

৩

ভোলা এবার সত্যিই খুব বিরক্ত হল রঘুর উপর। ভরত চৌধুরী আসার পর থেকে রঘুর টিকির নাগালটি পর্যন্ত সে পায়নি। বাচ্চা ছেলে তাই কিছুটা ছাড় তাকে দিয়েছে ভোলা। কিন্তু এতো ছোটও সে নয়, স্কুল ফাইনাল দিয়েছে এবার - কলেজে পড়ার কথা ছিল তার। তারও কিছুটা বুঝে চলা উচিত। ব্যবসাটাতো ভোলার নয় রঘুর কাকার, ফলে ওর আরও দায়িত্ব নিয়ে দেখাশোনা করা উচিত। সেই চিন্তা রঘুর ভেতর আদৌ আছে বলে মনে হয় না। ব্যবসার সুবিধার্থে বিনন্দর বাড়িটা ছাড়তে হয়েছে। নতুন বাড়িটা সহদেব ত্রিপুরার। বিনন্দর বাড়ি থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দুরে।

ঘুম থেকে উঠতে আজও দেরি হল রঘুর। আইচুকতিদের বাড়ি থেকে মাংস ভাত খেয়ে ভোলার সাথে অনেক রাতে এই নতুন বাড়িতে ফিরেছে সে। সকালে আইচুকতি এসেছিল কিন্তু স্কুলে যাওয়ার তাড়া থাকায় ঘুমন্ত রঘুকে ডাকেনি। ভোলা তাড়া দেয়, 'আজকে আর কোথাও যাওয়া হবে না। তৈরি হয়ে নাও। দাদনের টাকা আমদানি করতে হবে।' বিরাট একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে রঘু। চুপ করে মাচানের বিছানায় কাঁথা কম্বল জড়িয়ে বসে রইল সে। ভোলা তাড়া দেয়, 'কি হল ভাতিজা, উঠবে না?'

'উঠছি দাঁড়াও।'

রঘু বিছানা ছেড়ে উঠে যায়। হাত মুখ ধোতে নিচে ছড়ার জলে চলে যায় সে। ঘরের বাইরে সকালের নরম রোদ ঝলমল করছে। অপরূপা সুন্দরী পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে আছে কুয়াশার হালকা চাদর। সামান্য দুরের মানুষকেও আবছায়া দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা মোরগ বনবিড়ালের সন্ধান বোধ হয় পেয়ে গেছে, তাই একটা লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে চেঁচিয়ে চারিদিক মাতিয়ে দিল। শীতের সকালে রঘুর আবার মার কথা, বাড়ির কথা, মনে পড়ে গেল। মা এখন কি করছেন কে জানে। কুসুমের বিয়েতে যাওয়ার কথা নয়। তবু ওরা এসে যদি নিয়ে যায় তাহলে যেতেও পারেন। মাও কি কম ভালবাসেন কুসুমকে? নিজের পেটের মেয়ের থেকেও বেশি কষ্ট পাবেন তিনি কুসুমের বিদায়ে। বড় করে একটা নিশ্বাস নিল রঘু। মানব জীবন বড় জটিল ও বিচিত্র। ছড়ার জলে মুখ ধুয়ে ফেরার পথে মনে হল আইচুকতি এখনো আসেনি। রঘু ভাবল, বেচারা বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে গতকালের ঘটনায়।

বাইরে তখনও দাঁড়িয়ে ভোলা অপেক্ষা করছে। রঘু ফিরতেই একখানা খাতা কলম হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'লেখাপড়া জানা ছেলে তুমি আমার মতো মূর্খ তো নও। দেখে দেখে বল তো কার কাছে কতো পাওনা আছে।'

রঘু হেসে উঠে। 'আরে কাকা আমি তো তোমার সাথেই যাচ্ছি। বাড়ি বাড়ি গিয়েই বলতে পারব।'

'না না বাপ সেটা হবে না। তুমি বল আমার মুখস্থ হয়ে যাবে। না হয় তুমি হঠাৎ কোন্ দিকে চলে যাবে আর আমি বিপদে পড়ে যাব।'

'আরে কি বলছ তুমি ভোলাকা! তোমার সাথেই তো আছি আমি। কোথায় যাব?'

'কোথায় যাবে। এসেছ থেকে তোমার টিকির নাগাল কেউ পেয়েছে? বিনন্দর মেয়েটা আর তুমি আঠার মতো সেঁটে গেছো ভাতিজা। আবার মেয়েটা কোনদিকে এসে উঁকিঝুঁকি মারবে আর খোঁজকরের মতো তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

রঘু এবার একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু নয়। ও এখনও অনেক ছোট।'

দুজনে হেঁটে চলেছে সামনের দিকে। ভোলা রঘুর কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেল। প্রতিবাদ করে বলল, 'ছোট! কি যে বল ভাতিজা, এই বয়সের মেয়েদের কদিন আগেও বিয়ে হতো। স্বামীর ঘর করত, দিব্যি বাচ্চা পালতো। কোন অসুবিধে হত না। আর এখন ধিঙ্গিমারা মেয়েদেরও বল তোমরা ছোট। সে জন্যই তো এখনকার মেয়েগুলো এসব অপকর্ম করছে।'

রঘু আর কথা বাড়াবার সাহস দেখায়নি। কারণ ভোলার মুখ বড্ড খারাপ, কখন কি বলতে কি বলে বসবে কে জানে। সে খাতার নামগুলি পড়তে লাগল, 'জয়রাম দেববর্মা - ১৮ টাকা, জগৎরাম - ৩৬, ভৃগুরাম - ১৭ টাকা, তরুবীর - ৪৭, মুংকুড়ুই - ২৮ টাকা।' বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে যায় রঘু। আঁৎকে উঠে ভোলা, 'এই কি হল, থেমে গেলে যে? আমার হিসেবটা গড়বড় হয়ে যাবে না। এক তালে বল।'

'ভোলাকা', নরম সুরে ডাকে রঘু। 'আইচুক সকালে এসেছিল?'

'আঃ জ্বালা আবার আইচুক।'

'বলো না এসেছিল কি না?'

'হ্যাঁ ভাতিজা এসেছিল। তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে সে চলে গেছে।'

'কিছু বলেছে?'

'ও হ্যাঁ, এই নাও খাঁটি রূপোর দুইটা টাকা, অষ্টম জর্জের। এই দুটি দিয়ে সে বলেছে তুমি কলেজে পড়ার টাকা এগুলি বিক্রি করে জোগাড় করতে। কলেজে যেন তুমি অবশ্যই পড় সেটাও বারবার করে বলে গেল।'

রঘু অবাক হয়ে ভাবল, এসব কথা আইচুকতি কি করে জানলো? রঘু তো

কিছু বলেনি তাকে? তাহলে নিশ্চয়ই ভোলাকা ওদের পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আইচুকতির মা বাবার সাথে আলোচনা করেছে। গতকাল সন্ধ্যায় ভোলা রঘুকে খুঁজতে বিনন্দর বাড়িতে গিয়েছিল। রাত্রে একসাথেই ফিরেছে তারা। তার মানে সেই ফাঁকে ভোলা রঘুদের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলেছে। ভোলার উপর বিরক্ত হল রঘু। কি প্রয়োজন ছিল এসব কথা বলার?

'তুমি ওদের বাড়িতে গিয়েছিলে গতরাতে ভোলাকা?'

'হ্যাঁ ভাতিজা। তবে বড় সুন্দরী মাইয়াটা। চোখ জুড়াইয়া যায়।'

'তুমি আমাদের বাড়ির কথা কিছু বলনি তো?'

'দু চার কথা শুনিয়েছি গতকাল, দেশে তোমাদের জমিদারি ছিল এসব। এখন কাকার জন্য বেকায়দায় আছো তাও বলেছি।'

'ছিঃ ভোলাকা। আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে কিছু বলা তোমার ঠিক হয়নি।'

রঘু আর কথা বাড়ায়নি। এক এক করে সাতচল্লিশ জন দাদন নেওয়া লোকের নাম পড়ে যায় সে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল ভোলা সেই লিস্ট্ একবার শুনে ঠাঠা মুখস্থ বলে গেল। সামান্য যা ভুল হল তা আরও একবার শুনে ঠিক করে নিল।

তাহলে আইচুকতি ঠিকই এসেছিল। রঘুর মনটা খুশিতে ভরে গেল। রঘু ঠিক করল কাজ থেকে ফিরেই আইচুকতির সাথে দেখা করবে সে। ভোলা মনের সুখে গান ধরল বিড়ি ধরিয়ে। তার চলনসই গলায় সখীকে ক্রমাগত মিলনের তোয়াজ চলছে। ভাটিয়ালি সুরে কখনও চড়া, কখনও নিচু স্বরে সে গান গাইতে গাইতেই হঠাৎ থেমে গেল। আচমকা ভোলার থেমে যাওয়া এবং পলায়োন্মুখ চেহারা দেখে রঘুও সামান্য ভয় পেল। সামনে তাকিয়ে দেখে গাছের আড়াল ভেদ করে এক এক করে বেরিয়ে আসছে চার চারটে হাতি। যদিও হাতিগুলি বন্য নয় তাদের পিঠে রয়েছে প্রচুর মালপত্তর ও লোকলস্কর, বন্দুক, বর্শা ইত্যাদি। রঘু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কে ভোলাকা?'

'ওহ তুমি চেনো না? ওরা তেওয়ারীর লোক।'

'তেওয়ারী কে?'

'একজন ব্যবসায়ী। সারা ত্রিপুরা জুড়ে ওদের বিরাট ব্যবসা। এদের মাল পূর্ব পাকিস্তান হয়ে চীন, সিঙ্গাপুর, মলেশিয়া, হংকং পর্যন্ত যায়।'

'তাহলে বিরাট বড়লোক বল?'

'হ্যাঁ ওদের টাকার শেষ নেই ভাতিজা। তবে সবই করেছে ঐ পাহাড়িদের ঠকিয়ে।'

'তোমরাও তো পাহাড়িদের ঠকাও।'

'আমার কথা বলো না ভাতিজা। আমি কে? ঠকায় তোমার কাকা, এটা তোমার কাকার ব্যবসা।'

'কিন্তু এখন তো কাকা তোমার সঙ্গে নেই। তুমি এখন ওদের বোকা বানিয়ে কম পয়সায় এটা ওটা নিচ্ছ কেন?'

ভোলা হাসল রঘুর কথা শুনে। হাতিগুলি মানুষের চলার রাস্তাটা পেরিয়ে ফাঁড়ি রাস্তায় চলে গেল। দীর্ঘ সময় জনহীন জঙ্গলে চলার পর দেখা হওয়া মানুষগুলি ওদের সঙ্গে কথাই বলেনি। ওদের বৈভব যেন রঘুদের অবজ্ঞা করে জঙ্গলে আবার হারিয়ে গেল। ভোলা তখনও মুগ্ধ নয়নে ঐ দিকে তাকিয়ে আছে। রঘু ডাকল, 'ভোলাকা হাঁ করে কোথায় তাকিয়ে আছো?'

'হ্যাঁ চলো। ওহ্ কি যেন বলছিলে, ওদের ঠকাচ্ছি কেন? এটা সত্যিই একটা মজার কথা বললে ভাতিজা। আরে ভাতিজা যারা ঠকায় তাদের দোষ না দিয়ে যারা ঠকে তাদের প্রশ্ন করো না - তোমরা ঠক কেন?'

তর্ক বিতর্কের কোন শেষ নেই যুক্তিরও কোন শেষ নেই। ফলে সারা রাস্তা রঘু ভোলার সাথে তর্ক করে হাঁটতে লাগল। যারা ব্যবসায়ী তাদের একটাই ধ্যান জ্ঞান থাকে মুনাফা করা, পুঁজি বাড়ানো। সে যে উপায়েই হোক সে পিছপা হবে কেন। যুগ যুগ ধরে বণিকেরা একই পথে হাঁটছে, আগামিতেও হাঁটবে। একটা পথ আটকে দাও, ওরা অন্য পথ বেছে নেবে। সরকার আইন করে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারে। তখন পাহাড়ের লোকগুলি না খেয়ে মরবে। ওরা কাঁচামাল বিক্রির জায়গা পাবে'না। তাছাড়া নিদানের দিনে মহাজনের কাছে যে সাহায্যটুকু পায় সেই দাদনও পাবে না। আসলে পার্বত্য ত্রিপুরার অর্থনীতির মূল যে স্রোত তা এই জুমের জুমিয়াদের থেকেই শুরু। ফলে রাজ্যের, ভিনরাজ্যের মহাজনরা মায় সরকার পর্যন্ত ওদের ঠকায়। রাজাদের আমল থেকে কেউ এই জুমিয়াদের স্বার্থ দেখেনি। ওরা মহাজনদের স্বার্থই দেখেছে। ফলে ওই পাহাড়িদের অবস্থার বিশেষ উন্নতিও হয়নি।

তবে সব সমস্যার সমাধান হতো যদি ওদের মধ্যে শিক্ষা থাকতো, সচেতনতা থাকতো। কেউ ওদের নেতৃত্ব দিয়ে বোঝাত তোমরা জাগো, ওরা তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস করে দিচ্ছে। জনশিক্ষা আন্দোলন, ভূমি সংস্কার, জিএমপির মহাজনদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার এসবই হচ্ছে এখন। জিএমপির উত্থান হয়েছে গিরিবাসীদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতেই। কিন্তু তারপরও মহাজনী কারবার থাকবেই। যদি বাঙালী, মাড়োয়ারী মহাজন ব্যবসা না করতে পারে পাহাড়ি মহাজন তো পারবে। ব্যস তাহলেই হল। তখন সেই ঠকাবে।

'তার মানে জিএমপির লোকেরা তো ভাল কাজই করছে। তাহলে তোমরা আইচুকের দা-বুড়াকে ঘৃণা কর কেন?'

'লোকটা যে কম্যুনিষ্ট্। পুলিশ ওকে খুঁজছে।'

'কম্যুনিষ্ট্ হওয়া কি অপরাধ?'

'এত সব জানি না বাপু। তুমিও জানতে চেও না। বাচ্চা ছেলে, কখন বিপদে পড়ে যাবে।'

'এতদিন শুনে এসেছি কম্যুনিষ্টরা পাহাড়ে মানুষ খায়। কোথায় আমি তো দেখিনি?'

'আরে খায় খায় ভাতিজা। তোমাকে দেখিয়ে খাবে নাকি?'

'তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না ভোলাকা। মানুষকে ঠকানো তোমার পেশা, তাই আমাকেও হয়তো ঠকাচ্ছ। সব কিছুতেই না ঠকাতে পারলে তোমার তৃপ্তি আসে না। কারণে অকারণে মানুষকে বোকা বানিয়ে তুমি আনন্দ পাও।'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো পরে বুঝবে। আসার পর থেকেই পাহাড়টা কেমন যেন অস্থির হয়ে আছে।'

'কোথায় আমি তো টের পাইনি?'

'চাপা আগুন দেখা যায় না ভাতিজা, তাপটা অনুভব করা যায়। সরকার নানান আছিলায় কম্যুনিষ্ট নেতাদের জেলে পুরে দিচ্ছে। সাথে সাথে পাহাড়টা গরম হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আবার লেগে যাবে যুদ্ধ।'

'যুদ্ধ! কিসের জন্য?'

'ওহ্ তুমি দেখছি কিছুই জানো না। এই তো মাত্র কদিন হল পাহাড়টা শান্ত হয়েছে। গত প্রায় চার পাঁচ বছর ধরে পাহাড়েই তো ঢুকতে পারিনি আমরা। অপরিচিত কোন লোক পাহাড়ে ঢোকা মানেই ছিল মারাত্মক বিপদ ডেকে আনা।'

রঘু মুখে কিছু বলল না বটে তবে ভাবতে লাগল - এ কিসের যুদ্ধ? দেশটা সবে স্বাধীন হয়েছে অনেক রক্ত ঝরার পর। ত্রিপুরাও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাহলে এখন কিসের বিরোধ? ভোলা নাকি শুনেছে যে কোনদিন এদিকে মিলিটারিরা আক্রমণ করবে। হাজারে হাজারে পাহাড়িদের গুলি করে মারবে, তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে সব আবার শ্মশান করে দেবে। গত কয়েক বছর ধরে সিমনা, গোলাঘাটি, টাকারজলা, পদ্মবিল, চাম্পাহাওড়ে মিলিটারিরা বারবার আক্রমণ করেছে। পাহাড়িদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, ঘর বাড়ি পুড়িয়ে পাড়াকে পাড়া শ্মশান করে দিয়েছে। সেই ঘা এখনও ভাল করে শুকিয়ে যায়নি। এখন পাহাড়ে যদি আবার কিছু ঘটে তাহলেই হল আবার আগুন লাগবে। এসব শুনেই নাকি জ্যোতিবাবু এবার চম্পট দিয়েছেন। তিনি আর পাহাড়ে ঢুকতেই চান না। ভোলাকে পাঠিয়ে দেন। ভোলা হাসল এই ভেবে যে, এতো টাকার মালিক অথচ জানটা কতো ছোট জ্যোতিবাবুর। আর ভোলা যেন চুরি না করতে পারি তাই রঘুকে তার সঙ্গো দিল।

ছড়াটা পেরিয়ে আসতেই নতুন পাহাড়ি বসতিতে এসে পৌছল ওরা। মালপত্তর নিয়ে ওরা পৌঁছতেই কয়েকজন লোক তাদের কাছে এল। ভোলা ধান, চাল কি পরিমাণ মহাজনকে দিতে হবে তার হিসেব নিয়ে দর কষাকষি করতে লাগল দুজন জুমিয়ার সাথে। সামান্য কয়েকজন ছাড়া তেমন লোক হল না। রঘু দেখল হিসেবের খাতা ছাড়াও কি নিখুঁতভাবে ভোলা তার কাজ করে যাচ্ছে।

ভোলা বলল, 'আজ এই বসতির লোকজনের কি হল? অন্যসময় এইসব পাহাড়ি মহল্লায় এলে আদর, যত্ন, খাতির তো ছিলই, মানুষের ভিড়ও হোত চোখে পড়ার মতো। কিন্তু আজ লোকজন থাকলেও মানুষের চোখে মুখে তেমন উৎসাহ নেই। ভাতিজা আজ যেন কেমন কেমন লাগছে।'

'হ্যাঁ তাই তো, দাঁড়াও ঘটনা কি আমি একটু দেখে আসি।'

আইচুর্কতিদের পাড়ার সাথে এই পাড়ার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, পাহাড়ের আকৃতির সামান্য পার্থক্য ছাড়া। মানুষ, লাল মাটি, ছন বাঁশের টং ঘর সব একইরকম। টং ঘরের নিচে শুয়োরের পাল বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকানো। মহিলারা পিঠে বাচ্চাকে কাপড়ে বেঁধে কোথায় চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ লাঙ্গার ভেতর জলের কলসি নিয়ে টিলা থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে জল আনতে। মার্কিন সাদা কাপড়ের ছোট টুকরো পরে কয়েকজন পুরুষ এদিক ওদিক কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু চেনা পাহাড়ের ছন্দটা যেন টের পাওয়া যাচ্ছে না। অগত্যা ভোলা এদিক ওদিকের লোকজনকে ডাকতে লাগল।

পাহাড়িদের বেঁচে থাকার অদ্ভুত কৌশল রঘুকে মুগ্ধ করেছে। ওদের জীবিকার এবং জীবন ধারনের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্রের প্রায় নিরানব্বই শতাংশ দ্রব্য স্বউৎপাদিত। তেল, কাপড়, সাবান, সমস্ত খাদ্য দ্রব্য, এমনকি অলঙ্কার, বাঁশের হুঁকো, তার তামাক পর্যন্ত নিজস্ব গ্রামীন পদ্ধতিতে তৈরি হয়। সেদিক দিয়ে ওরা অনেক বেশি কৌশলী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাইরের অর্থনীতির পরিবর্তন ওদের গ্রামীন জীবনে তেমন রেখাপাত করে না। যদিও এই স্বনির্ভরতা ওদের আত্মতুষ্টি বাড়িয়েছে। কোন প্রতিকূলতাকেই বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ার একটা প্রবণতা আছে। কারো কারো মধ্যে আছে একটু অলসতাও, যা ভবিষ্যতে ডেকে আনতে পারে অভিশাপ।

হঠাৎ কি হল পাহাড়ের মানুষগুলি যে যেদিকে পারে ছুটতে লাগল। এত দ্রুত ওরা পালাতে লাগল মনে হচ্ছিল যেন একটা তীব্র ঝড় সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল সবার পেছনে পেছনে নিশ্চিত মৃত্যু ধেয়ে আসছে বিভৎস রূপে। রঘু পালাবে কিনা বুঝতে পারল না। একবার ছুটে গেল ভোলার দিকে, কিন্তু ভোলা ইতিমধ্যে তার মালপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তবে জুমিয়াদের ধান চাল কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি সে। সবকিছু এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। রঘু অবাক হয়ে দেখল বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা, পুরুষ সবাই প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। সমস্ত পাহাড়টা যেন এক লহমায় ছত্রখান হয়ে গেল।

রঘু পিঠে হাতের ছোঁয়া পেতেই চমকে ফিরে দেখে দা-বুড়া দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'ছোট মাজন তুমি এখানে কি করছো?'

'এই তো ভোলাকার সাথে এসেছিলাম।'

'ভোলা কোথায়?'

'পালিয়েছে।'

'তাহলে তুমিও পালাও। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না বিপদে পড়বে?'

'হ্যাঁ চলে যাচ্ছি। তবে ভোলাকা যে মালগুলি ফেলে গেল, সেগুলি?'

'ওসব নিয়ে ভেবো না আগে পালাও।'

'হয়েছে কি দা-বুড়া? লোকেরা কোথায় পালাচ্ছে ?'

'মিলিটারি পাঠিয়ে আক্রমণ করে সরকার আমাদের দমন করতে চায়। আমি যাই ছোট মাজন লোকজনকে জড়ো করতে হবে, বোঝাতে হবে।'

কথাটা শেষ করেই দ্রুত সরে গেলেন দা-বুড়া। রঘু এবার অচেনা জঙ্গলের পথ ধরে এগুতে লাগল। অনেকটা দুর যাওয়ার পর গুলির শব্দ, মানুষের চিৎকার কানে ভেসে আসতে লাগল। এটা কিসের লড়াই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না রঘু। দীর্ঘ সময় ধরে থেমে থেমে বিভৎস মারণ শব্দ ভেসে আসছিল। আর সন্ধ্যা হতেই দুর থেকে দুরের সমগ্র পাহাড় জুড়ে শুধু আগুনের ফুলকি ভেসে উঠতে লাগল। কতো ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে মিলিটারিরা, কতো মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে কে জানে? স্বাধীনতার এই চেহারাটা বড় নির্মম। রঘুর মা বাবা যেমন দেশ ছেড়ে এসে অপাঙক্তেয়র মতো এপাড়ে বাসা বেঁধেছিলেন। কেন এমন হল? ছোট্ট রঘু নিজেকে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পেত না। এটাই কি প্রাপ্য ছিল তাঁর? রঘুর মনে অজান্তেই তৈরি হয়েছে এক প্রতিবাদের আগুন। যেখানেই যা কিছু অন্যায় দেখে সেখানেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে তার।

ভোলা কতক্ষণ রঘুকে খুঁজেছে বলা মুশকিল। তবে বদন চৌধুরী পাড়ায় গোলমালের পর সেই যে পড়িমরি করে পালিয়েছে আর সেদিকে যেতে সাহস পায়নি। আজ দুদিন হল রঘুর সাথেও দেখা নেই। ছেলেটা কোন বিপদে পড়েছে কিনা কে জানে। অবশেষে বিনন্দর বাড়িতে এসে রঘুর সন্ধান পেল ভোলা। রঘু এই বাড়িতে গত দুদিন ধরে পড়ে আছে, অথচ ভোলা তাকে পাগলের মতো খুঁজছে। রঘু একবারের জন্য ভোলার সাথে দেখা করেনি। ভোলার সমস্ত রাগ যেন উপচে পড়ল এবার রঘুর উপর।

'তুমি কি আমাকে পাগল পেয়েছ ভাতিজা?'

'কেন কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে? চারিদিকের কি অবস্থা! বদন চৌধুরী পাড়ায় মিলিটারির সাথে গোলাগুলি হয়েছে। কতো লোক মরেছে কে জানে, অথচ দুদিন ধরে তোমার কোন খোঁজ নেই?'

'এই ফালতু গুজব ছড়াবে নাতো। গোলাগুলি চলেছে ঠিক আছে, কিন্তু মানুষ মরেছে তোমাকে কে বলেছে?

'আমি কি জানি। মানুষ বলছে।'

'হয়েছে। এবার চুপ কর।'

'আমি পাগলের মতো খুঁজতে খুঁজতে এলাম আর তুমি আমার সাথে এই

ব্যবহার করলে?'

'ভোলাকা কেন গায়ে পড়ে ঝগড়া করছো বল তো? আমিও তো মনে মনে ভাবছিলাম আমার কাকাটা কোথায় গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে কে জানে। ইস্ তার লাশটা পর্যন্ত একবার চোখে দেখতে পেলাম না। অথচ এখন দেখছি তুমি বহাল তবিয়তেই আছ।'

'ছিঃ এই হল তোমার কথার ছিরি? শিক্ষিত ছেলের মুখের ভাষা? ফালতু রেগে যাচ্ছ কেন ভাতিজা, আমি আসায় তোমার অসুবিধা হচ্ছে?'

'ঠিক আছে ভোলাকা তুমি যাও আমি সন্ধ্যার সময় ফিরে আসব।'

'ওসব হবে না এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে আমার সাথে। গাড়ি হয়তো পেয়ে যাব, আমি আজকেই বাড়ি ফিরে যাব।'

'তুমি যাবে যাও – তবে আমি আরও চার পাঁচ দিন এখানে থেকে যাব।'

'মানে!' চোখ কপালে উঠল ভোলার, 'তুমি থেকে যাবে আর আমি চলে যাব বলছ?'

'ঠিক তাই। তুমি এখন যাও আমার আইচুকের সাথে কিছু কথা আছে।'

'এই পাঁচ দিন ধরে তো আইচুকের সাথেই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরলে। ব্যবসাপত্তরের কিছুই দেখলে না। আমি সব জ্যোতিবাবুকে বলব।'

'বলবে? বল গিয়ে যাও। আমি যাই।'

'চলে যাচ্ছ? যাও, তবে আগামিকাল সকালে যদি তোমাকে না পাই আমি একাই চলে যাব।'

বিরক্ত ভোলা তাকিয়ে রইল রঘুর চলে যাওয়ার দিকে। একি ছেলেরে বাবা! পাঁচ-পাঁচটা দিনে একদম বদলে গেল। যে ছেলে বই ছাড়া কিছুই বুঝতো না, ছোটবেলা দুষ্টুমি করলেও বড় হয়ে একদম বদলে গিয়েছিল ঘর থেকে বেরুতেই চাইত না। জ্যোতিবাবু বলতেন, দাদার ঘরে ওটা ছেলে না বই কাটার পোকা হয়েছে। সেই ছেলে এই কদিনে এতোটা আত্মবিশ্বাস পেল কোত্থেকে। দিন নেই রাত নেই বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও একটা ব্যাপার শুনে ভোলার মনটা খারাপ হয়ে গেল। রঘু নাকি কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন কম্যুনিস্টদের সাথে ওর ঘোরাফেরা। জ্যোতিবাবু শুনলে ওকে দুটুকরো করে ধলাইর জলে ফেলে দেবেন। নানারকম ভাবনা ভাবতে ভাবতে ভোলা দ্রুত চলে গেল গিরীন্দ্রর বাড়ির দিকে। রাতটা যদি কোনমতে কেটে যায় তো সকালে দুগ্গা দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়বে সে।

আইচুকতি বাঁশ করুল ও লাকড়ি খুঁজতে মণিমালা, ছবিকন্যাদের সাথে জঙ্গলে ঘুরছে। একদল মেয়ের সামনে রঘু গিয়ে ডাকল তাকে। অমনি সব মেয়েরা খিল খিল করে হেসে উঠল। লজ্জা পেয়ে আইচুকতি কিছুটা বিরক্ত হল রঘুর উপর।

'কি হল? ডাকছো কেন ছোট মাজন?'

'কথা আছে এসো।'

'না আমি তোমার সাথে যাব না। ওরা কি ভাববে বলতো?'

'আমি কাল চলে যাচ্ছি। তোমার সাথে কিছু কথা বলার দরকার আছে।'

এবার আর প্রতিবাদ করেনি আইচুকতি। রঘু চলে যাচ্ছে শুনে আইচুকতির মনটা খারাপ হয়ে গেল। রঘু ও আইচুকতি হাঁটতে হাঁটতে অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। চারিদিকে চামল, কড়ই, বট গাছ ও কাঁটার ঝোপ। কেন জানি না অনেক চেষ্টা করেও রঘু এতক্ষণ একটা কথাও বলতে পারেনি। নিঃশব্দে আইচুকতিও এতোটা রাস্তা রঘুর পাশে পাশে হেটে এল। রঘু একটা কাটা গাছের গোড়াতে বসে আইচুকতির হাতটা নিজের কোলের কাছে টেনে নিল। আইচুকতি কিছুটা অন্যমনষ্ক হয়ে রইল বাধা দিল না। রঘু জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ আইচুক?'

'কই কিছু না তো।'

'তোমাকে যত দেখছি – মনে হচ্ছে তোমাকে নতুন করে আবিষ্কার করছি।'

'ওসব ছেড়ে দাও ছোট মাজন, কেন ডেকেছ বল?'

'অনেক কথা আছে তোমার সাথে।'

'কি কথা বল?'

আইচুকতির ফর্সা আঙুলগুলি নিয়ে রঘু খেলছিল। আইচুকতি এবার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'আমি যাই ছোট মাজন। তোমার তো কোন কাজ নেই তাই আমার সময় নষ্ট করছো।'

'কি হল? আজ এতো তাড়া কিসের আইচুক?'

'এদিকের অবস্থা মোটেই ভাল না ছোট মাজন। আমাদের একটা দল মেন্দির দিকে যেতে হতে পারে। পার্টির নির্দেশ আছে। কিছু মাজন ওদিকে শাসিয়ে গেছে পুলিস মিলিটারি নিয়ে ওরা আসবে। তাই আমাদের যেতে হবে।'

'কখন যাবে তোমরা?' রঘুর মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'জানি না, আমি যাই ছোট মাজন।' আইচুকতি যাওয়ার চেষ্টা করতেই রঘু হাত ধরে টানে।

'একটু দাঁড়াও আইচুক, আমার কথাটা বলা হয়নি।'

'বল।'

'আমাকে কালকেই ফিরে যেতে হবে। মা বাড়িতে একা।' আইচুকতি কিছু না বলে একটু হাসল। 'আমি চলে যাচ্ছি তোমার খারাপ লাগবে না?'

'কি জানি।' আইচুকতির নিস্পৃহ উত্তরে রঘু খুশি হতে পারল না।

'তার মানে এই পাঁচটি দিনের কথা তুমি ভুলে যাবে আইচুক?'

'কি কথা?'

'এই যে আমাদের ইয়ে, মানে মেলামেশা।'

'এই রকম কত মাজন আসে পাহাড়ে, পাহাড়ি মেয়েদের সাথে মিশে গিয়ে ভুলে যায়। এটা আর মনে রাখার মতো কি ঘটনা হল ছোট মাজন?'

রঘু অবাক হয়ে আইচুকতির দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছো আইচুক। আমি তোমার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করিনি। আমি ওদের মতো নই।'

'সেটা সময় বলে দেবে তুমি কাদের মতো।'

রঘু আরও বিস্মিত হল। এটা তো ওর চেনা আইচুকতি নয়। যে সরল পাহাড়ি মেয়েটা রঘুর সাথে গায়ের জামার মতো জড়িয়ে ছিল এই কটা দিন, সে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। আইচুকতির এই হঠাৎ পরিবর্তন রঘুর ভালো লাগল না।

'শোন আইচুক তুমি খুব বড় নও, তবে খুব ছোটও নও। তুমি নিশ্চয় বুঝবে এই পাঁচটা দিন আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছে। আমি তোমাকে পেয়েছি - কিছুটা সাবালক হয়েছি। সেই আত্মবিশ্বাস থেকে একটা লক্ষ্য তৈরি হয়েছে আমার সামনে। এখন তোমার কথায় লক্ষ্যটা আবার অস্পষ্ট হয়ে গেল।'

'তুমি অনেক কিছু ভেবে কথা বল ছোট মাজন। আমি তোমাকে কিছু না ভেবেই বলেছি তুমি রাগ করো না। তুমিই তো বল আমি ছোট মেয়ে।'

'পাহাড়ের এই দিনগুলি আমার জীবনে খুবই মূল্যবান। অথচ তুমি এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে?'

'পাহাড়ে সবাই এসে মজা করতে ভালবাসে, কিন্তু পাহাড় থেকে নেমেই সব ভুলে যায়।'

দুজনেই উঠে দাঁড়াল। 'আবার কবে আসবে আমাদের এখানে ছোট মাজন?'

'জানি না।'

রঘুর কাঙালের মতো ঝুল ঝুল চেহারা দেখে আইচুকতির ফর্সা গালটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। হ্যাঁচকা টানে আইচুকতিকে বুকে জড়িয়ে ধরল রঘু, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ আইচুক, আমার মন বলছে তুমি আমাকে ভালোবাস।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আইচুকতি এক পলক রঘুর দিকে তাকাল, তারপর দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। বিস্মিত রঘু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আইচুকতির চলে যাওয়ার দিকে। একটা পাহাড়ি মেয়ে যাকে ছোট ভেবে ততটা গুরুত্ব দেয়নি রঘু। আজ তাকেই মনে হচ্ছে একটা রহস্যময় অধ্যায়। কিছুতেই পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে না। সরল নিষ্পাপ আইচুকতির ছবিটা কত অস্পষ্ট হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে। এই সেদিনও মনে হচ্ছিল কত নিশ্চিত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে রঘু সমর্পিতা আইচুকতির সামনে। আর আজ ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে গেল দুজন। আইচুকতি সম্পর্কটা নিয়ে ভেবেছে নিশ্চিত। কিন্তু সমাধান হয়তো পায়নি। হয়তো রঘুকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। এতো বড় ধাক্কা রঘু খাবে সে ভাবতেই পারেনি। নিজেকে নিয়ে ভাবার তেমন প্রয়োজন রঘুর জীবনে হয়নি। উদ্দেশ্যবিহীন নৌকার সওয়ারী ছিল সে। কিন্তু ঘন্টাছড়া বাজারে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে এসে আইচুকতির সঙ্গ পাওয়ায় রঘুর জীবনটা যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

একাকী পাহাড়ি জনপদে হেঁটে এগিয়ে চলল রঘু। আইচুকতি পাহাড়ের বাঁকে অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু রঘুর চোখে রিয়া, পাছড়া ও বনফুলে সজ্জিতা মেয়েটা এখনও ছুটছে। রঘু ঘরে ফিরে যাবে বলে পা পা করে এগুতে লাগল। মেঠো পথটা হঠাৎ যেন অগম্য হয়ে উঠল, সামান্য রাস্তাটুকু আর শেষ হতে চাইছে না।

ফেরার পথে দা-বুড়ার সাথে দেখা হয়ে গেল। দুজনে মহল্লার দিকে ফিরে যাচ্ছিল। দা-বুড়াই ডাকলেন, 'কি হে ছোট মাজন, কবে বাড়ি যাচ্ছ?'

'আগামিকাল সকালে।'

'কালকেই বাড়ি চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'আইচুকের সাথে দেখা হয়নি?'

'এক্ষুনি কথা বলে ও চলে গেল। আইচুক বলছিল ওরা নাকি কোথায় যাচ্ছে?'

'ওরা মেন্দি হাওরের দিকে যাচ্ছে, প্রয়োজনে আরও এগোবে।'

রঘু একটু ভেবে বলল, 'আমিও কি যেতে পারি ওদের সাথে?'

দা-বুড়া রঘুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার তোমার মনটা খারাপ দেখাচ্ছে ছোট মাজন?'

সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে রঘু বলল, 'না কিছু না।'

'নাহ্ - কিছু একটা আছে।?'

'এই ভাবছি - সত্যি এই পাহাড় খুব সুন্দর। ভালো এখানকার মানুষজনও।'

'আর কিছু?'

'না না তেমন কিছু না।'

দা-বুড়া মুচকি হাসলেন। তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে বারবার একই প্রশ্ন করছেন, কিন্তু কি উত্তর দেবে সে। লজ্জায় মরে গেল রঘু। দা-বুড়া এবার সরাসরি জানতে চাইলেন, 'আইচুককে দেখে মনে হল তোমার দিকে ওর নজর নেই।'

রঘু এবার সাহস পেয়ে গেল দা-বুড়ার কথায়। 'এতদিন ওর যে চঞ্চলতা, চপলতা, আগ্রহ, উদ্যম আমাকে নিয়ে ছিল, আজ তার ছিটেফোঁটাও ওর চোখে মুখে দেখতে পেলাম না।'

'তোমার কি মনে হয় সে তোমাকে পছন্দ করে?' রঘু হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। 'তাহলে ছেড়ে দিলে কেন ভায়া?'

'মানে - আমার কি করা উচিত ছিল?'

'তুমি জোর করতে। মেয়েরা এমনিতেও মুখে সবকিছু খুলে বলে না।'

রঘু সত্যি লজ্জা পেয়ে গেল। 'আর জোর করা ঠিক হতো না।'

'না না চেষ্টা না করলে হবে না। মেয়েরা ভীরু পুরুষ সহ্য করতে পারে না। একটু জোর করতে, ন্যাকা সুরে বলতে, দেখতে কাজ হয়ে যেত।'

দা-বুড়ার কথা বলার মধ্যে একটা শক্তি লুকিয়ে থাকে। তার মজা করে বলা কথাটাও মনে হয় অমোঘ সত্য। রঘু এই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'দা-বুড়া কাল চলে যাচ্ছি। আপনার সাথে আবার কবে দেখা হবে?'

'যদি তুমি পাহাড়ে আবার আস, তাহলে নিশ্চই দেখা হবে।'

'আপনি সদরে পার্টির কাজে যান নিশ্চয়। আমাকে খবর দেবেন, আমি আপনার সাথে দেখা করব।'

'এই ব্যাপারে এক্ষুনি তোমাকে কিছু বলছি না অসুবিধে আছে। তবে বয়েস হয়েছে তো। এখন আর ঘন ঘন সদরে যেতে পারি না।'

'আপনার সম্বন্ধে আমার মুগ্ধতা কমছে না।'

'তুমিও খুব ভাল ছেলে ছোট মাজন। নিজেকে আরও গড়ার চেষ্টা করবে সারাটা জীবন। শুধু পড়াশোনা করে যাও, হাতের সামনে কাগজ পেলেই পড়ে ফেলবে। আর একটু দারিদ্র্যে থাকার চেষ্টা কর, দারিদ্র্য অনেক সময় মানুষকে বৃহৎ শিক্ষা দিয়ে যায়। বাকি সবকিছুই তোমার ঠিক আছে। জীবনে অনেক বড় হবে তুমি ছোট মাজন। আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

দা-বুড়া হেসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। তারপর রঘু গিরীন্দ্রের বাড়ির অস্থায়ী আস্তানার দিকে হাঁটতে লাগল। বৃদ্ধ অন্য রাস্তা ধরে জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে গেলেন।

শীতের কামড় দিনের পর দিন যেন আরও প্রবল হয়ে আসছে। পৌষের শেষবেলায় মধ্য দুপুরে মাথার উপরে রোদ বেশ নরম। তবু প্রকৃতি জ্বলছে, গাছপালার ভরা যৌবন এখন থিতিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝেই পাহাড়ে দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে। এক ভয়াবহ সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে পাহাড়। রাজনৈতিক চরম অস্থিরতার ফলে সামাজিক বিপর্যয় ঘটছে বারবার। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও শুরু হয়েছে নতুন নতুন এলাকা জুড়ে। চারিদিকে রোগে ভুগে মানুষের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। ডায়রিয়া, কলেরা, ম্যালেরিয়ায় প্রতিদিন মানুষ মরছে কোন অষুধ ছাড়া। কোথাও কোন চিকিৎসা পরিষেবা আছে এমনটা চোখে পড়ে না। গ্রামে আছে কবিরাজ আর এখানে আছে অচাই। মুরগি কেটে থুমনাইরগ বনিরগের পুজা দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এতে কার কি লাভ হয় জানা নেই, তবে চিকিৎসা যে হয় না সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

এই কটা দিন বাড়ির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল রঘু। এখন বাড়ির কথাগুলি ছবির মতো তার মনে পড়ে গেল। মা কিছুতেই তাকে ঘন্টাছড়া বাজারে ময়ালে পাঠাতে চাননি। রঘু ব্যবসায় নেমে পড়ুক এটাও মা চাননি। কিন্তু জ্যোতিবাবু বদ্ উদ্দেশ্যে ক্রমাগত চাপ দিয়ে রাজি হতে বাধ্য করলেন। তখন রঘু মাকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে। কিন্তু তরুবালা অন্তর থেকে কোনদিন চাননি রঘু ময়ালে যাক। তবু পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েছেন। রঘু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়

ভোলার সাথে, সে এক অভাবনীয় দৃশ্য তৈরি হয়েছিল। মা উঠোনে দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে কাঁদছেন। রঘু পেছন ফিরে তাকায়নি কারণ মার চোখের জল সে সহ্য করতে পারবে না। বাবা মারা যাওয়ার দৃশ্যটাও আবার রঘুর সামনে ভেসে উঠল। এখন মা কেমন আছেন কে জানে? এই পাঁচটি রাত মা একা কি করে কাটিয়েছেন তাও জানে না রঘু। মা নিশ্চই কাঁদছেন, রঘু কেমন আছে জানার জন্য তার মন নিশ্চই ব্যাকুল হয়ে আছে।

মহল্লায় ঢুকতেই দুরে শুকনো ডালপালা নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মেয়েদের উপরে উঠার দৃশ্য দেখে দাঁড়াল রঘু। এই দৃশ্যটা নিশ্চিতভাবে একটা নাচের দৃশ্য হতে পারে। ঐ সারিবদ্ধ মেয়েদের মাঝখানে আইচুকতি নেই তো? না না তা কি করে হবে। আইচুকতি এই তো কিছুক্ষণ আগে মেন্দি যাবে বলে বেরিয়ে গেল। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আইচুকতি নিশ্চয় ওর কমরেড্‌দের সাথে দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাত্রে রঘু আবার গেল আইচুকতিদের বাড়ি। রাত তখন অনেক, নিঃশব্দ এবং নিস্তব্ধ রাত। এক চিলতে আলোর ফুলকিও কোথাও নেই। রঘু বিনন্দর টংএ গিয়ে ডাকল, ‘বাছই।’ বিনন্দ ঘরে ছিল। ভাগ্যলক্ষী বাইরে এসে কুপির আলোয় দেখল রঘু দাঁড়িয়ে। ভাগ্যলক্ষী অবাক হয়ে ডাকল, ‘আরে! ছোট মাজন ফাইদি - ফাইদি।’ রঘু ভেতরে গিয়ে বসল। প্রথম রাত থেকেই এই ঘরটা তার কাছে আপন হয়ে গেছে, কারণ পাহাড়ে অধিকাংশ সময় এই ঘরেই কাটিয়েছে সে। আইচুকতির ভাই বোনরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বিনন্দ বাঁশের হুঁকোটা নিয়ে পাশে এসে বসল। আইচুকতির মাও পাশে এসে বসলেন পান মুখে দিয়ে। রঘু নিচু স্বরে কথা শুরু করল, ‘আগামিকাল বাড়ি চলে যাচ্ছি। তাই আপনাদের সাথে দেখা করতে এলাম।’

আইচুকতির মার গলাটা নরম হয়ে গেল, ‘তুমি খুব ভাল ছেলে ছোট মাজন। তুমি আবার এসো।’

‘আপনাদের এখানেই তো এসে প্রথম উঠেছি। আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি।’

‘এটা কি বলছ ছোট মাজন, কষ্ট আবার কি? আমরা যা খেয়েছি তুমি তো তাই খেয়েছ ।’

বিনন্দ হুঁকোয় সামান্য শব্দ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে জোরে জোরে হাসছিল। কি কারণে এই বিয়োগান্ত দৃশ্যে সে হাসছিল বোঝার কোন উপায় নেই। রঘু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, ‘দা-বুড়া ঘরে নেই?’

‘না নেই।’ আইচুকতির মা বললেন। ‘উনি তো তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই বাড়িতে নেই। উনি কোথায় কখন থাকেন তার কোন ঠিক নেই।’

‘আইচুক ঘুমিয়ে পড়েছে বাছই?’ রঘু জিজ্ঞেস করল।

এবার ভাগ্যলক্ষী হাসলেন, ‘না। সে তো বাড়ি নেই, মেন্দি গেছে।’

একটা পান বানিয়ে রঘুকে দিলেন আইচুকতির মা। রঘু গালে পানটা

চালান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আইচুকতির মা বললেন, 'আমার মেয়েটা আস্ত পাগল। সারাদিন চটরপটর করতেই থাকে। খুব তোমার গল্প করে।'

রঘু ভাবল, না আইচুকতির সাথে চলে যাওয়ার আগে দেখা হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই। রঘু গল্প করে বেরিয়ে পড়ল। যদিও আইচুকতির মা বারবার বলছিলেন খেয়ে যেতে। সেই রাতে কোন এক টংএ বেজে চলেছিল চম্‌প্রেং এর বিষণ্ন সুর। এতো অপূর্ব সুন্দর কোন যন্ত্র সংগীত হতে পারে রঘু ভাবতেই পারছিল না। অপূর্ব তার সুরের মূর্ছনা। রঘুর বুকে সেই অচেনা শিল্পীর সৃষ্টি যেন জন্মের মতো বসে গেল।

পরদিন সকালে টং ঘর থেকে নেমে এল রঘু। তার গুছানোর কিছুই নেই। হালকা পাজামার উপর শার্টটা গলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। ভোলা মালপত্তর সব নৌকায় লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাকি যা কিছু আছে গুছিয়ে নিচ্ছে আর এক নাগাড়ে রঘুর কাকার উদ্দেশ্যে বাছাবাছা শব্দ ছুঁড়ছে। সকালের ঝলমলে রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাখি গান গেয়ে ডানা ঝাপটিয়ে নতুন দিনকে প্রতিদিনকার মতো স্বাগত জানাচ্ছে। বাচ্চাদের হৈ চৈ পাহাড়ের নিস্তব্ধতা বারবার ভেঙে দিচ্ছে। তবুও কেমন একটা অলস জীবন এখানে জড়িয়ে ধরে থাকে। কোন তাড়া নেই কারও, সময়ও যেন এখানে এসে অলস হয়ে গেছে।

ভোলার মনটা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল বাড়ি ফিরছে বলে। রঘু মুখটাও ধুতে পারেনি ভোলা হাত ধরে টানতে লাগল। ফিরে যে যেতেই হবে সেই সত্যটা অনুভব করল রঘু। মনটা একদম খারাপ হয়ে গেল তার। এই তো সেই পাহাড়ি মহল্লা পেছনে পড়ে আছে আঠারমুড়ার কোলে, বাইরের পৃথিবীতে হয়তো এর কোন অস্তিত্বই নেই শুধু গুটি কয়েক মহাজন ও এই এলাকার লোকজন ছাড়া। কেউ জানে না জীবন এখানেও অগোচরে খেলা করে আপন খেয়ালে। রঘু উদাস চোখে সেদিকেই তাকিয়ে রইল। যত সামনে এগুচ্ছে রঘু, পেছনে ক্রমশ মহল্লাটা হারিয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়ি মহল্লাতেই ছয়টি দিন রঘু দাপিয়ে বেড়িয়েছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো। জীবনের নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছে সে। তবু ওকেও ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আইচুকতিকেও ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আবার দেখা হবে তো?

উপজাতি মহল্লাটা দুরে প্রায় হারিয়েই গেছে। আইচুকতির সাথে অন্তত একবার দেখা হলে ভাল হতো। খুব মনে পড়ছে আইচুকতির কথা কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না ওকে। জনশিক্ষা সমিতির স্কুল থেকে বাচ্চারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। স্কুলের নির্দিষ্ট কোন পোশাক নেই। যে যার মতো মলিন জামা কাপড় পরে আছে। কেউ বা শুধু গামছা পরে খালি গায়ে স্কুলে এসেছে। তাদের মধ্যে আইচুকতি আছে কি না রঘু খুঁজতে লাগল। বাচ্চাগুলি হারিয়ে যেতেই পেছন থেকে ডাক শুনতে পেল রঘু, 'ছোট মাজন - দাঁড়াও ছোট মাজন।' চমকে ফিরে তাকাল রঘু আইচুকতি নয় তো? না আইচুকতি না - এতো আইচুকতির বন্ধু মণিমালা আর তার পেছনে পিরিখা। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা রঘুদের সামনে এল।

'কি ব্যাপার মণিমালা?'

'ছোট মাজন এটা নাও। আইচুক মেন্দি যাওয়ার আগে আমাকে দিয়ে গেছে। বলেছে তোমাকে যেন এটা দিয়ে দিই।'

কথাটা বলেই মণিমালা খিক্ খিক্ করে হাসতে লাগল। রঘু জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি ফুল মণিমালা?'

'এটা খুমপুই – পাহাড়ি ফুল। খুব সুন্দর তাই না?' পিরিখা জিজ্ঞেস করল।

'খুমপুই!'

পিরিখা বলল, 'তুমি আবার আসবে তো ছোট মাজন?'

'হ্যাঁ আসব, নিশ্চই আসব আইচুককে বলবে।'

'আইচুকও তোমাকে আসতে বলেছে।' কথাটা কানে কানে বলেই মণিমালা ও পিরিখা আবার ছুটতে লাগল।

রঘু খুমপুই হাতে পেয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। পাহাড়ি ফুল খুব সুন্দর, মনটা ভাল হয়ে গেল রঘুর। ফুলটা যত্ন করে রেখে দিল পোঁটলার ভেতর। তারপর হাঁটতে লাগল রাস্তায়। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কেউ জানে না। এমনও হতে পারে আজকের দিন আর গাড়ি এল না। রঘু ভাবল গাড়ি না এলেই ভাল আবার পাহাড়ে ফিরে যাবে। আইচুকতির সাথে দেখা হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে।

রঘু বারবার ভাবছিল এই পাহাড়েই সে থেকে যেতে পারতো, এখানে তার শিক্ষার যোগ্য মুল্যায়ন হতো। রঘু শিশুদের শিক্ষা দিতে পারতো, সঠিক চেতনায় ছোটদের উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। এখানে শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই নয় দরকার নানা রকম সামাজিক কুসংস্কার ভয় থেকে ওদের মুক্ত করা। সাধারণ জুমিয়ারা মহাজনদের কাছে এই যে ঠকে যায় তার থেকে বাঁচার কৌশল ওদের শেখানো যেত। নিজেদের সুস্থতার জন্যই যে পরিচ্ছন্নতা দরকার তাও ওদের বোঝানো যেত। কি করতে হবে না সেটা বলা মুশকিল। সবদিক থেকেই ওদের সমৃদ্ধ করতে হবে।

গণমুক্তি পরিষদ তাদের কাজটা সঠিক ভাবেই করছে। কিন্তু এই বৃহত্তর অংশের জনজাতির কাছে পৌঁছতে এখনও পারছে না। সময় লাগবে, তবে ঠিক কতদিন সময় লাগবে বলা মুশকিল। রঘুর ভাবনার মাঝখানেই একটা গাড়ির শব্দ কানে এল। রঘু বুঝতে পারল ফিরে যাওয়ার সময় তার হয়ে গেছে। এবার আইচুকতির মতোই নিষ্পাপ সরল সবুজ সতেজ দূরের পাহাড় যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রঘুর দিকে। হাত নেড়ে নেড়ে সে যেন বলছে, 'আবার ফিরে এসো বন্ধু। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষায় থাকব। আবার ফিরে এসো।'

৪

রঘুদের বাড়ি ধলাই নদীর পাড়ে কলাবাগানে। পাগলা পাহাড়ি খরস্রোতা নদী ধলাই। উৎস থেকে পাহাড়ের বুক বারবার চিরে ছুটে গেছে সমুদ্রের দিকে। শেষ যে জায়গায় পাহাড়ের সাথে তার সংগম, সেখানেই রঘুদের গ্রাম। রঘুদের বাড়িটা কলাবাগানের পুরোনো বাড়িগুলির মধ্যে একটা। এছাড়া আরও দু চারটা বাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেগুলো পুরোনো। বাকি সব বাড়িই নতুন। কেউ দুবছর, কেউ চার বছর, কেউ হয়তো সদ্য বাড়ি বেঁধেছে ধলাইর পাড়ে। দেখতে দেখতে সমতল এবং টিলাভূমি সব ভরে যাচ্ছে নতুন নতুন বাড়িতে। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের এক দীর্ঘ মিছিল সমগ্র ত্রিপুরার পাহাড়ে কন্দরে ছড়িয়ে পড়ছে অবিরাম।

গ্রাম বলতে যা বোঝায় ঠিক তা কিন্তু এটা নয়। আট দশ কিলোমিটারের মধ্যে কোথাও স্কুল নেই, হাট বাজার নেই। বাজার বলতে আমতলী প্রায় আট দশ কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়। হাসপাতালও প্রায় সমান দূরত্বেই আছে একটা। আর সব কিছুতেই শুধু নাই আর নাই। রাস্তাঘাট কোথাও নেই। মানুষ জঙ্গল কেটে তার উপযোগী পথ করছে বটে। কিন্তু যানবাহন চলাচলের মতো উপযুক্ত নয়। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল আর অনাবাদি পাথুরে লাল মাটি।

রঘুর বাবা শান্তিভূষণ রায় কলাবাগানে এসেছিলেন যখন, দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। তখন রঘু নেহাৎই ছোট। পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট জেলার বেগমপুরে ওদের আদি নিবাস ছিল। ঘাতক জাতিদাঙ্গার পরও কিছু দিন অপমান সহ্য করে টিকতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখনই ললাটের লিখনটা তিনি পড়তে পেরেছিলেন। একটা সময় অবস্থা বেগতিক দেখে ছোট ভাই জ্যোতির সাথে যোগাযোগ করলেন ত্রিপুরায়। শান্তিবাবুর বাবা জ্যোতিবাবুকে অনেকদিন আগে ত্যাজ্যপুত্র বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে জ্যোতিবাবু আর দেশের বাড়িতে ফিরে যাননি। যদিও এই নিয়ে সুরবালার অনেক কটু কথা সহ্য করতে হয়েছে শান্তি বাবুকে, কারণ জ্যোতিবাবু তার সৎ ভাই ছিলেন। শান্তিবাবুর মা মারা যাওয়ার পর সুরবালা মানে জ্যোতিবাবুর মা ওদের পরিবারে এসেছিলেন। বাউন্ডুলে জ্যোতির উপর তেমন একটা ভরসা ছিল না শান্তিবাবুরও। তবু উপায়ন্তর না দেখে তার উপরই ভরসা করতে হল তাকে।

প্রায় প্রতিদিন বলা নেই কওয়া নেই এক একটা পরিবার চলে যাচ্ছে।

হাজার হাজার বছরের নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে মানুষগুলি নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন শান্তিবাবু দেখেন আজ ঐ দুই পরিবার চলে গেল। শান্তি বাবুদের জমি জমা প্রভাব প্রতিপত্তি সবই ছিল। এলাকার পুরোনো জমিদার বাড়ির মানুষ তারা। যদিও জমিদারির কিছুই অবশিষ্ট নেই আর। তবু লোকে বলে মড়া হাতিও লাখ টাকা। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আজও যথেষ্ট মর্যাদা দেয় এই বাড়ির মানুষদের। তিনি ভেঙ্গে পড়লে গ্রামের উপর আক্রমণ হতে পারে। হিন্দু পরিবারগুলি ভরসা হারিয়ে ফেলবে। ওরা তাই মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন অন্তত যতদিন পরিস্থিতি সহনীয় থাকে। রঘুর মাও এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য শান্তিবাবুকে পীড়াপিড়ি করতে লাগলেন।

অবশেষে শান্তিবাবু বুঝতে পারলেন আর টেকা যাবে না। প্রতিদিন পলায়মান মানুষের মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। হিন্দুদের উপর বাড়ছে ক্রমাগত নির্যাতন। শান্তিবাবু তার সম্পত্তির একটা অংশ যা গোপনে বিক্রি করা যায়নি তা রেখে বাকিটা বিক্রি করে দিলেন জলের দরে। তাদের বাড়ি আর অবিক্রীত জমিটার পাওয়ার অব এটর্নি তাদের পরিবারের বহু পুরানো চাকর বিশ্বস্ত মসন্দর মিয়াকে দিলেন। মসন্দর মিয়া যদিও দেশ ছেড়ে না যাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করলেন, কদিন পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশ্বাসও দিলেন। তবু শান্তিবাবু মসন্দরের কথায় ভরসা করতে পারলেন না। যে অবিশ্বাসের দেয়াল মাথা তুলেছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাতে সে সময় মসন্দরের কথায় বিশ্বাস করাটা কঠিন ছিল। এমন কি এপাড়ে আসার পর তিনি আর মসন্দরের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেননি। তার ধারণা ছিল এই সম্পত্তি নির্ঘাৎ বিক্রি করে মসন্দর টাকাটা পুরো হাপিজ করে দেবে।

শান্তিবাবু সম্পত্তি বিক্রির পুরো টাকাটাই ভাগে ভাগে পাঠিয়ে দিলেন ছোট ভাই জ্যোতির কাছে। জ্যোতিবাবুও দাদাকে ক্রমাগত চিঠি লিখে উৎসাহ দিতে লাগলেন। 'শ্রীচরণেষু দাদা, আমি আরও ধানি জমিন রাখিয়া দিয়াছি। তুমি এইপাড়ে চলিয়া আসিলে সব দেখিয়া দুঃখ ভুলিয়া যাইবে। খুবই মনোরম এই ত্রিপুরা রাজ্য। তুমি আবার ভূস্বামী হিসাবে প্রাচুর্য্যের মধ্যেই দিন অতিবাহিত করিতে পারিবে। ইতি, তোমার দাসানুদাস জ্যোতিভূষণ রায়।' শান্তিবাবু জ্যোতিবাবুর চিঠিতে ভরসা পেলেন। যা কিছু ছিল তার সব কিছুই পরম নিশ্চিন্তে ছোট ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অবশেষে দিন ঘনিয়ে এল। রঘুর ঠাকুরমা ও মা এক রাত্রে চোখের জলে নিঃশব্দে বর্ডারে এক পরিচিতের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। পরদিন দিনের বেলাতেই শান্তিবাবু রঘুকে নিয়ে চলে গেলেন ঐ বাড়িতে। এপাড় ওপাড়ের কারবারিদের সাথে কথা হল। তারপর একদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই ধলাই নদী পেরিয়ে চলে এলেন ত্রিপুরায়। জ্যোতিবাবুকে আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতিবাবু বর্ডারে আসেননি। এমনকি কোন লোকও আসেনি শান্তিবাবুদের

এগিয়ে নিতে। বিলাসছড়া গ্রামে একটা অস্থায়ী চায়ের দোকানে বসে পড়লেন সবাই। শান্তিবাবু বিস্মিত হলেন জ্যোতির আচরণে। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। রঘুর ঠাকুমা শাপ শাপান্ত করছেন উদ্দেশ্যহীনভাবে। সত্তরের বেশি বয়েস মহিলার। রাস্তার ধকল নিতে পারছিলেন না।

এদিকে আরও রিফিউজিরা এসে জুটেছে এখানে। কেউ তার প্রিয় ছাগল, কেউ গরু ছাড়াও নানাহ বোঁচকা পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তরুবালার কথাকলির কথা মনে পড়ল। তিনিও একটু কষ্ট করলে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতেন। কেউ কেউ আগে থেকেই এখানে আছে যাদের অনেককে এখনও জমির পাট্টা দেওয়া হয়নি। ফলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। অস্থায়ী ছাউনিতে কোন রকমে পড়ে রয়েছেন অনেকেই। সরকারিভাবে এই ছাউনিগুলি করে দেওয়া হয়েছে। সাথে কিছুটা রিলিফের চাল ডাল ইত্যাদি দিয়ে মানুষগুলিকে সাময়িক বাঁচানোর একটা প্রচেষ্টা। যারা আগে থেকে ব্যবস্থা করে এসেছেন তারা রিলিফ্ ক্যাম্পে উঠেননি, তারা যে যার ব্যবস্থা মতো চলে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্যদের সরকারি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। চেনা নেই জানা নেই কিছু পরিবার এক হয়ে গেলেই নতুন একটা গ্রামের পত্তন হচ্ছে। তিরিশ কার্ড, ষাট কার্ড, বত্রিশ কার্ড নাম দিয়ে এক একটা জায়গায় জঙ্গল কেটে কলোনি করে দেওয়া হতে লাগল।

সরকারি বাবুরা এসে নাম লিখে নিয়ে গেলেন। প্রায় বারোটা বেজে গেছে। খিদে তেষ্টায় সবার প্রায় জিভ বেরিয়ে আসছে। সেই কাক ভোর থেকে সবাই ঠায় বসে আছেন, তবু জ্যোতিবাবুর কোন দেখা নেই। সামান্য একটু চা খেয়ে আর থাকা যাচ্ছে না। চার বছরের রঘুকে নিয়ে হয়েছে আরও সমস্যা, হাজারো প্রশ্ন করে মাঝে মাঝেই বিরক্ত করছে সে। এখন আবার কাঁদছে খিদেয়। রঘুর মা তাড়া দিতেই শান্তিবাবু উঠে দুয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তবে কেউ জ্যোতিবাবুর সঠিক সন্ধান দিতে পারল না। অবশেষে রিলিফের সরকারি বাবুরা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় কিছু কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা এলেন। শান্তিবাবু ওদের জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলেন জ্যোতিবাবুর বাড়ির ঠিকানা। জ্যোতিবাবু রিফিউজিদের রিলিফের ঠিকাদার। হাজার হাজার টাকার চাল ডাল, কাপড় চোপড়, ওষধপত্তর কিনে রিফিউজিদের সাপ্লাই দিচ্ছেন। খুব বেশি দুর না। প্রায় বার থেকে পনের মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। বালিগাঁও, রূপসপুর বাজার, আমতলী, শিমুলতলী হয়ে ছোট গ্রাম নবগ্রাম। অবশেষে স্থানীয় একজন লোককে গাইড্ পেয়ে শান্তিবাবু পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে নবগ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

টিলাভূমি আর জঙ্গল ছাড়া কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। রূপসপুর ও আমতলী ছাড়া কোথাও তেমন ঘন বসতি নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে এখনও বহির্জগতের সাথে ত্রিপুরার সম্পূর্ণ যোগাযোগ পূর্ববাংলার উপর দিয়ে। চাম্পারা চা বাগানের উপর পাতা লাইনের উপর দিয়ে চলে ঘোড়ায় টানা ট্রলি।

ব্যবসাপত্তরের সব মালামাল এই পথেই আসে শ্রীমঙ্গল হয়ে। এছাড়া রয়েছে নৌকা, মলয়া মাঠের কাছে গোদারা ঘাট অব্দি আসে পূর্ববাংলার উপর দিয়ে। শান্তিবাবুদের গাইড লোকটি বলে যাচ্ছে, রাতের বেলা কেউ সাধারণত বাড়ি থেকে বের হোন না বাঘের ভয়ে। এমনকি চাষের জমিতে কর্মরত চাষীকেও বাঘ উঠিয়ে নিয়ে গেছে। রাতে মশাল নিয়ে দল বেঁধে সবাইকে চলতে হয়। যোগাযোগের বাহন বলতে ঘোড়া, গরুর গাড়ি আর নৌকা। ত্রিপুরার ভেতর সর্বত্রই যেতে হয় পায়ে হেঁটে। পাহাড়িরা জুম ছাড়া অন্যভাবে চাষাবাদ করতে জানে না। ফলে এখানে আবাদি জমির পরিমাণ খুব কম। সমতল ভূমি যা আছে তাও জঙ্গলাকীর্ণ, এখন উদ্বাস্তুরা প্রাণপণ চেষ্টা করে অনাবাদি জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছে। যেটুকু জমিতে চাষাবাদ হয় তা প্রধানত ধলাই নদীর দুই পাড়ে। কোন এক সময় কিছু মুসলমান পরিবার এই জমিতে ঘরবাড়ি করে থাকতো। শোনা যায় হালাম কুকিরা হিন্দু মহাসভার এক ব্যক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এই অঞ্চলের বাঙালী ও মণিপুরি মুসলমানদের ওপর হামলে পড়ে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের গরু বাছুর টাকা পয়সা সব লুট করে নিয়ে গেছে লুটেরারা। সেই মুসলমানেরাই ফেলে গেছে ধলাই নদীর পাড়ে পাড়ে অনেক আবাদী জমি। সেই সব রেডিমেড্ জমিতেই অনেকে বাড়ি ঘর তৈরি করেছেন। জ্যোতিবাবুও ওদের অনেক জমি কম পয়সায় কিনে রেখেছেন। যা বর্গা দিয়ে ধান চাল সবজি এখন ঘরে তুলেন।

অবশেষে দীর্ঘ পথ হেঁটে একটা বাড়ির সামনে এসে সবাই দাঁড়ালেন। শান্তিভূষণ রায় দেশের বাড়ির সব কিছু খুইয়ে এই বাড়িটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন নিজের ছোট ভাইকে। দিনে দিনে তিল তিল করে জমানো টাকা পয়সা খুব সতর্ক হয়ে পাঠিয়েছেন এদেশে যেন নিরাপদ শান্তির একখানা নীড় তৈরি হয়। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে খারাপ লাগল না শান্তিবাবুর। কাঠের বেটন মাড়া চাম্পাকাম্পা বাঁশের বেড়ার উপর ছনের ছাউনি দেওয়া ছয়টি ঘর। মাঝখানে বিশাল উঠোন, গরুর গোয়াল, দুর্গামন্দির, রান্নাঘরও আছে। বেশ কজন লোক বাড়ির চারিদিকে কাজ করছে। তাদের একজন অনাথবন্ধু এগিয়ে এল। গামছায় হাত মুছে বলল, 'আজ্ঞে আমি অনাথ। আপনারা বুঝি বাবুর কুটুম? দেশ থেকে এসেছেন?'

শান্তিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার বাবুটি কই? তার স্ত্রী সন্তানরা কোথায়? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'বাবুতো বাড়ি নেই। রিলিফের মাল আনতে মলয়া পেরিয়ে চাম্পারা বাগানের কাছে গেছেন। ট্রলিতে করে মাল আসবে তো। তবে মা ও ছেলেরা ঘরে আছে। ডেকে দেবো?'

'না না ঠিক আছে তুমি কাজে যাও, আমরাই দেখছি।' শান্তিবাবু এবার মার দিকে তাকালেন। বৃদ্ধা হঠাৎ যেন জেগে উঠলেন, 'এই তরু তুই আমার সাথে আয়তো। কান্ডটা দেখেছো তখন থেকে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছি কারও খোঁজ নেই।'

সুন্দর কারুকাজ করা কাঠের সদর দরজার সামনে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সুরবালা, 'কিগো এই দুপুরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছো? এদিকে দরজায় যে জগন্নাথেরা দাঁড়িয়ে আছে সে খবর আছে? ওরা কি ঘরে ঢুকবে নাকি ফিরে যাবে?'

রঘুর মা বারবার বাধা দিচ্ছিলেন, 'মা আস্তে কথা বলুন।' কিন্তু সুরবালা দমার পাত্রী নন, আরও চেঁচামেচি করার তোড়জোড় করতে করতেই সদর দরজাটা হাঁ করল। প্রথম দেখা তাই কেউ কাউকেই চিনতে পারলেন না। বিস্ময়ের ঘোর কাটল, অপরিচিতা অল্পবয়সী বধুটির কথায়, 'একি মা, দাদা, দিদি! আপনারা এসে গেছেন? আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

মাথায় আঁচল টেনে ঢিপ্ করে একে একে প্রণাম করলেন সবাইকে। তারপর ডাকলেন,'অনাথ জিনিসপত্তরগুলি সামনের ঘরে রেখে দে বাবা। আসুন মা সবাই ভেতরে আসুন।' এতক্ষণ মনের মধ্যে পুষে রাখা আগুন মুহূর্তের মধ্যেই ঠান্ডা জল হয়ে গেল সুরবালার। হেসে বললেন, 'রঘুর বড্ড খিদে পেয়েছে বৌ, আগে ওকে একটু খেতে দে।'

রঘুকে কোলে নিয়ে মোহিনী হাঁকলেন, 'তনুর মা খাবারগুলি তাড়াতাড়ি গরম করো। কি মিষ্টি ছেলেরে তুই, আমার না নজর লেগে যায় দিদি।'

তরুবালা হেসে বললেন, 'মা ছোটমার নজর কি কখনো লাগে ছোট?'

'সে আমার কাছেই থাকবে দিদি।'

'বেশ তো নিয়ে যা - তোকেই দিলাম। তুই ওকে মানুষ করিস।'

'কদিন পর ফেরত চাইবে না তো?'

'না চাইব না।'

যে রাগ, অভিমান, অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করার আবহ তৈরি হয়েছিল তা ছোট বউটির ঘরোয়া কথাবার্তায় মুহূর্তেই যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল।

সেদিন একটু রাত করেই বাড়ি ফিরলেন জ্যোতিবাবু। এটা অবশ্য তার বরাবরেরই অভ্যেস। তবে আজ আর কিছু সেবন করে তিনি আসেননি। সে যাই হোক বাড়ি ফিরে দাদা, মা, বৌদিকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। দাদার বিয়ের পর আর দেশে যাননি জ্যোতিবাবু। তাই তরুবালা ও রঘুর সাথে তার প্রথম দেখা। এক এক করে জ্যোতিবাবু তার উত্থানের সব গল্পই বললেন দাদাকে। এই বিপুল সম্পত্তি কতো কষ্ট করে, কতো কৌশলে করতে হয়েছে তাকে এই গল্পই বললেন ইনিয়ে বিনিয়ে। দাদাকে আশ্বস্ত করে জ্যোতিবাবু বললেন, 'দাদা তুমি দেশের সবকিছু ছেড়ে এসেছ বলে ভেবো না অনাথ হয়ে গেছো। আমার জমিগুলি তুমি দেখো তার থেকে তোমার যা পছন্দ হবে বলবে আমি তোমাকে দিয়ে দেব।'

শান্তিবাবুর বুকে খঁচ্ করে একটু লাগল। মনে মনে ভাবলেন এটা জ্যোতি কি বলল? ওর জমি! মানে? এই জমি কেনার টাকাতো শান্তিবাবু হাজারো ঝক্কি ঝামেলা সয়ে সযত্নে লুটেরাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এদেশে পাঠিয়েছেন। তার মানে এ

জমি তো শান্তিবাবুদের এজমালি। এটা শুধুই জ্যোতিবাবুর হতে যাবে কেন? শান্তি বাবু এ বিষয়ে কিছু না বলে বিষয়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাল সকালে জমিগুলি একটু ঘুরে দেখব জ্যোতি। কোথায় কি আছে জানা থাকলে আমিও দেখাশোনা করতে পারব।'

কথা হল পরদিন সকালবেলা জ্যোতিবাবু দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেন তার অর্জিত সম্পত্তির খতিয়ান দেখাতে। জ্যোতিবাবু হেসে বললেন, 'জমিগুলি তো এক জায়গায় নেই দাদা। সারা কমলপুরের মহল্লায় মহল্লায় ছড়িয়ে আছে। এমনকি সালেমা, কুলাই, আমবাসাতেও অনেক আছে। সব জমি দেখতে তোমার একমাস লেগে যাবে।'

শান্তিবাবু হেসে বললেন, 'না না সব জমি একসাথে দেখব কি করে। আমি শুধু নবগ্রামের জমিগুলিই দেখব।'

'বেশ তাহলে চল কাল সকালেই যাব। কাল আমার রিলিফের মাল আনতে যেতে হবে না। মালটা আজই এসে গেছে।'

এদিকে দুই জা'র গল্পও যে থামতেই চায় না। সবাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনও রান্না ঘরে চলছে তাদের গল্প। দেশের গল্পই চলল দীর্ঘ সময়। তাদের পোষা ময়নাটার কথা, কত কথাই না জানত সে। একবার ভেবেছিলেন তাকে নিয়েই আসবেন এ দেশে। কিন্তু তার জন্য যদি রাস্তায় বিপদে পড়ে যান সেই ভাবনায় আর ময়নাটাকে এপাড়ে নিয়ে আসা হোল না। রঘুর ঠাকুমা ওকে ডাকতেন কথাকলি। বাড়ি ছাড়ার আগের দিন বিকেলে রঘুর ঠাকুমাকে দেখে ওর কি চিৎকার বাড়ি যেন ভেঙেই ফেলবে। ঠাকুমার মন ভাল নেই। যেদিকেই তাকান তার বুকটা জ্বলতে থাকে। কথাকলির দিকে তো তিনি তাকাতেই পারছিলেন না। বাড়ির সবার প্রিয় হলেও এই সুরবালা কথাকলিকে যত্ন আদর দিয়ে বড় করেছেন। তাই তার বুকটা জ্বলছিল সবচাইতে বেশি। কিন্তু অবুঝ প্রাণী সেসব তো বুঝে না, সে ক্রমাগত চেঁচিয়ে সবাইকে পাগল করে তুলল। অবশেষে সুরবালা কথাকলির খাঁচায় গিয়ে প্রতিদিনের মতো খাবার দিলেন, কথা বললেন। তারপর কথাকলি শান্ত হয়ে গেল।

পরদিন তরুবালা কথাকলিকে পিঞ্জিরা খুলে ছেড়ে দিলেন। সুরবালা সহ্য করতে পারবেন না বলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রথমে কথাকলি অভ্যাসবশত পিঞ্জিরা ছেড়ে বেরুতে চায়নি। ঠাকুমা বললেন, 'যা - যা রে মা, আমরাই ঘর ছাড়া হচ্ছি তুই ঘরে আর থাকবি কি করে? আগের জন্মে আমাদের কাছে তোর যদি কিছু ঋণ থেকে থাকে তার থেকে তোকে মুক্তি দিলাম।' তারপর খাঁচার বাইরে পা দিল কথাকলি। সামনে একটা গাছে উড়ে গিয়ে একটু সময় বসল। অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন সবাই, এবার কি করবে কথাকলি? সেকি আবার ফিরে আসবে? দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে ডানাটা মনে হয় ঠিকঠাক কাজ করছিল না। ফলে একবার ডানা ঝাপটে নিল সে। তারপর উড়ে গেল সে দূরে - বহুদূরে।

দিগন্তে হেলে পড়া সূর্যটার মাঝখানে কালো বিন্দুর মতো যেন মিশে গেল। কথাকলি উড়ে চলে গেল কোথায় কোন অজানায় হারিয়ে গেল। সুরবালা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। তরুবালাও আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ওকে ছেড়ে দিয়ে শাশুড়ি বউ দুজনেই মাটিতে পড়ে গড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রঘুদের সাদা রঙের একটা কুকুর ছিল তার নাম বাঘা। রঘুর মা ঠাকুমা চলে আসার পরদিন রঘু ও তার বাবাও যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন বাঘা বারবার বাধা দিচ্ছিল। ও যেন জানতে চাইছিল আমাকে ফেলে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ? বারবার ঘেউ ঘেউ করে বলতে চাইছিল অনেক কিছুই। শান্তি বাবু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। প্রতিদিনকার মতো ওর শরীর একটু চুলকে দিয়ে নিজের মনে মনে বললেন, 'তোর ভাগ্যে কি আছে জানি না বাঘা। ইচ্ছে থাকলেও তোকে আর সাথে নিয়ে যেতে পারলাম না। সবাইকে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তুই পশু বলেই হয়তো নিয়ে যেতে পারছি না। কি কষ্টে তোর দিনগুলি কাটবে আমি জানি। তবুও আমাকে ক্ষমা করিস বাপ।' চোখের জল আর সামলাতে পারলেন না শান্তিবাবু।

বেগমপুর থেকে শ্রীমঙ্গল যাওয়ার গাড়ি পেয়ে গাড়িতে উঠে গেলেন তিনি। গাড়ির পেছনের কাঁচের জানালা দিয়ে তখন বাঘাকে দেখা যাচ্ছিল সে প্রাণপণে ছুটছে। গাড়ির গতি কম ছিল। তাই প্রতিটি বাসস্টপে এসে বাঘা আবার শান্তিবাবুদের পেয়ে যেত। রঘু আর শান্তিবাবু ওকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, চলে আয় বাঘা - চলে আয় -। বারবার বাঘা ফিরে আসছিল বটে তবে ওকে প্রতিটি নতুন এলাকাতেই লড়াই করতে হচ্ছিল ঐ এলাকার কুকুরদের সাথে। তিন চারটে স্টপেজে বাঘাকে দেখা গেলেও তারপর আর ওকে দেখা যায়নি। ছোট বউও আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে ছোট বউ হাঁ-করে তাকিয়ে রইলেন বড় বউয়ের দিকে। হেসে রঘুর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?'

'তোমাকে একটা কথা বলি দিদি পুরুষদের অবস্থা কি হয় আমি জানি না, তবে আমি মেয়ে হয়েও তোমার উপর থেকে নজর সরাতে পারছি না। কি অপরূপ সুন্দরী গো তুমি!'

তরুবালা আঁচলে মুখ ঢেকে মুচকি হেসে বললেন, 'তুই বুঝি আমার গুণকীর্তন করতেই থাকবি শুধু।'

'ফাজলামি করছি না দিদি সত্যি বলছি। আর আমার সে জন্যই দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'কি দুশ্চিন্তা করছিস তুই?'

'তোমার দেওরকে নিয়ে।'

'মানে?'

'সাবধানে থেকো দিদি ওর চরিত্রটা একদম সোনায় বাঁধানো। টাকা পয়সা আছে ঠিকই কিন্তু চরিত্র বলতে কিছুই নেই লোকটার। বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে পর্যন্ত এনে রাখতে পারি না। নিজের মুখে পতি নিন্দা করা মহাপাপ। তবু বলি, দু চার জন বিধবা আছে এ গায়ে সেখানে ওর নিত্য আসা যাওয়া। এমনিতে ভাল মানুষ কিন্তু নেশা গিললেই অন্যরকম হয়ে যায়।'

শিউরে উঠলেন তরুবালা, ঘেন্নায় শরীরটা যেন নোংরা হয়ে উঠল। তবু মুখে একরাশ হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'ছিঃ এ কেমন তর কথা ছোট? এসব বলতে নেইরে। ঠাকুরপোকে তো আমি আগে দেখিনি তবে আজ দেখে আমার তেমন মনে হয়নি। মানুষ হয়তো তোকে খারাপ কথাগুলি বলে খ্যাপাচ্ছে।'

'তাই যেন হয় দিদি। স্বামীর ভাল কে না চায় বল? তবু তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো।'

রাতে ঠিক মতো ঘুম হল না তরুবালার। জ্যোতিবাবু সম্বন্ধে মোহিনী যা বললেন তা ক্রমাগত ভাঙা ডিস্কের মতো বাজতে লাগল তার কানে। জমিদার জোতদারদের যে চারিত্রিক লাম্পট্য অনেক ক্ষেত্রেই থাকে তা তরুবালা শুনেছেন। কিন্তু এই পরিবারে এসে তিনি কিছুই টের পাননি। জ্যোতিবাবুর নজর যদি তরুবালার উপর পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই। শান্তিবাবু উদার মানুষ, বিশ্বাস করে সবকিছু ছোট ভাইয়ের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। জ্যোতিবাবুর যদি কুমতলব থাকে তাহলে নানা ভাবে হেনস্তা হতে হবে তাদের। কি রকম ব্যবহার পাবেন তারা জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। যে সম্পত্তি এখানে করেছে তা ভাগাভাগি করে কি শান্তিবাবুর নামে লিখে দেবে? নাকি তালবাহানা করবে? যদি তালবাহনা করে তখনই বোঝা যাবে ওর মতলব ভাল নয়।

শান্তিবাবু একপাশে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন, মাঝখানে রঘু। তিনি নির্ভেজাল মানুষ, সম্পত্তি নিয়ে দরাদরিতে তিনি কি যাবেন? মনে হয় না। তরুবালা নিজের ভাগ্যকেই দুষলেন মনে মনে। তাও ভাল স্বামী ও সন্তান বুকের পাশে থাকলে কোন অভাব টের পাওয়া যায় না। একজন নারীর আর কি প্রয়োজন সুখি হতে? কেউ কি মনে রাখবে এই পিতা পুত্র দুজনেই কতো দাপুটে জমিদারের বংশধর। অন্তত শান্তিবাবুর এনিয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রঘু।

শান্তিবাবু মাঝেমাঝেই অভ্যেসবশত ঘুমের মধ্যে তরুবালার গায়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন। রঘু সবসময় মার বুকের ঠিক মাঝখানে মুখ রেখে গাল মুখ ঢেকে ঘুমোয়। তার ছোট্ট হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে রেখেছে। পাটাও তার বাপের মতো তুলে দিয়েছে তরুবালার উপর। রঘু একটু বড় হতেই শান্তিবাবু আর তরুবালার কাছে ঘেঁষতেই পারেন না। মাকে ছুঁলেই রঘু ভয়ানক রেগে হয় চিৎকার করে উঠে না হয় বাপকে মারতে থাকে। কোনদিন অন্ধকারে রঘু ঘুমিয়েছে ভেবে যদি হাত এগিয়ে দেন, দেখা যায় রঘুর হাত ওখানে আগেই দখল নিয়েছে। হঠাৎ অন্য হাতের উপস্থিতি টের পেয়েই চেঁচিয়ে ওঠে সে। তরুবালা রঘুকে বোঝান, 'কি গো সোনা,

সবই তো তোমার তবু মাঝে মাঝে বাবাকেও তো একটু দিতে হয়। বাবা কাঁদবে না?' রঘুর কড়া উত্তর, 'কাঁদলে কাঁদুক আমার মাকে ধরবে কেন?' তরুবালা রঘুকে আদর করে বললেন, 'ঠিক আছে বাবা এই নাও এটা তোমার আর ওটা বাবার। হয়েছে?' রঘু মানল না, 'হবে না। দুটোই আমার।' বলে দুহাতে মার সম্পূর্ণ দখল নিয়ে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল মাকে।

কখনও কখনও দুজন লেঠেল থাকে জ্যোতিবাবুর সাথে। ওদের হাতে লাঠি থাকে না বটে তবে চাকরের মতো সব কাজই ওরা করে। ওদের পার্শ্বচরও বলা যেতে পারে। জ্যোতিবাবুর শখের রেডিওটা এন্টেনা সহ বইবার জন্য আবার অন্য লোকও আছে। এই রেডিওটা প্রথম যখন জ্যোতিবাবু এনেছিলেন তখন আরেক সমস্যা দেখা দিল। দিন নেই রাত নেই দুগ্গাপূজার মতো লোকজন ভিড় করতো বাড়িতে এই বস্তুটা দেখার জন্য। এটা কথা বলতে পারে, গান গাইতে পারে, এমন আজব বাক্স এই অঞ্চলে আর দেখা যায়নি। এটাকে দেখতে দুর-দুরান্ত থেকে লোকজন আসতে লাগল। জ্যোতিবাবু বিরক্ত হয়ে কখনো বলতেন, 'আজ আর হবে না আগামিকাল আসতে হবে।' লোকগুলি ঠিক পরদিন সকালে চলে আসতো। কোন কোনদিন রেডিও নাটক শুনে ছেলে, বুড়ো, মেয়েরা কেঁদে কেটে উঠোন ভাসিয়ে দিতেন। হয়তো কোনদিন চলে যাওয়া লোকগুলি হঠাৎ অনাথবন্ধু বা জগৎবন্ধুর 'ভোলা মন' বলে গানের টান শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়তো এই ভেবে যে রেডিওটা বোধ হয় চালিয়েছে। এই রেডিওটা জ্যোতিবাবুর শান। যেদিকেই যান ওকে সঙ্গে নিয়ে যান। প্রথমে এটাকে দেখতে খুব ভিড় হত। এখন কম। মোহিনীদেবী নক্সী কাজ করে রেডিওর গায়ে সুন্দর একখানা জামাও পরিয়েছেন।

জ্যোতিবাবু বললেন,'এই যে দাদা দেখতে পাচ্ছ - এই সীমানা থেকে পুরো সমতল জমিগুলি নিয়ে ওই যে - ওই যে পাহাড়ের চূড়ায় দুটো বড় গাছ দেখা যাচ্ছে ওই পর্যন্ত আমার জমি।

'সে তো অনেক জমিরে জ্যোতি!'

'হে দাদা সবই তোমাদের আশীর্বাদে হয়েছে। তবে সমতল হলেও অনাবাদি জঙ্গলে ভরা জমি। একে মানুষ করতে অনেকটা সময় লাগবে।'

'ঐ পাহাড়ি টিলাগুলি কিন্তু কোন কাজে লাগবে না জ্যোতি।'

'বল কি দাদা, কাজে লাগবে না মানে? লাগবে লাগবে। কদিন পর এই জায়গার কি দাম হবে তুমি ভাবতেই পারবে না। ভট্চাযের জন্য এখন পারছি না, লোকটা সত্যিকারের ভালমানুষ। কিন্তু কদিন পরে যখন সরকারি জমি এই তল্লাটে আর থাকবে না। তখন রিফিউজিদের কোথায় জায়গা দেবে? ওরা তো লোকালয় থেকে দুরে গহীন অরণ্যে যেতে চাইবে না। তখন এই জমিগুলি দেখবে চড়া দামেই বিক্রি হবে।'

শান্তিবাবু হেসে বললেন, 'আমি তোকে বোকা বলতাম জ্যোতি। এখন দেখছি তুই ভীষণ চালাক ছেলে।'

'সবই তো তোমার কাছ থেকে শেখা দাদা। তোমার গালিগালাজ শুনেছি বলেই মানুষ হতে পেরেছি। তুমি পথ দেখিয়েছ, এদেশে থেকে চেষ্টা করে যেতে বলেছ, প্রয়োজন মতো সাহায্য করেছো বলেই তো আজ আমি এখানে।'

জ্যোতিবাবুর আনুগত্যে শান্তিবাবু যারপরনাই খুশি হলেন। যাক ছোট ভাই দাদাকে ভালবাসে। শান্তিবাবু বরং সন্দিহান ছিলেন। তাই মনে মনে নিজেকে একটু তিরস্কার করলেন তিনি।

'সামনেই একটা কলোনি হয়েছে দাদা, তোমাকে ওখানে নিয়ে যাব। একদম ছোটলোকের মেলা। একটা বাঁশের চটি পর্যন্ত ফেলে রাখতে পারবে না, চুরি করে নিয়ে যাবে।'

'ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই জ্যোতি। ওরা সর্বহারা। সব হারিয়ে ওদের কাঙালিপনা বেড়ে গেছে। ওদের মনে শুধু ভয় আবার যদি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। তাই খড় কুটো যা পায় তাই জড়িয়ে বাঁচতে চাইছে।'

'না না তুমি ঠিক বলছ না দাদা। এখন যারা আসছে তাদের অধিকাংশই হয়তো হতদরিদ্র, কাঙাল, এটা ঠিক। কিন্তু ওদের এতো লোভ তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার কাঁঠাল গাছে একটা কাঁচা কাঁঠালও নেই। প্রতিদিন আমার লোক এসে গালাগালি করে যায়, লাভ হয় না।'

'তোকে যদি না পেতাম আমারও হয়তো একইরকম অবস্থা হতো।'

'কি যে বল দাদা তুমি কতো বড় বংশের ছেলে। শিক্ষিত সংস্কৃতবান। ওদের সাথে তোমার তুলনা হয়?'

কথা বলতে বলতেই ঐ কলোনিতে ঢুকে পড়লেন ওরা। কলোনিতে ঢুকতেই মহিলাদের ভয়ঙ্কর ঝগড়ার শব্দ ভেসে এল। জ্যোতিবাবু বললেন, 'এই শোন কীর্তন থেমে নেই, চলছেই চলবে।'

শান্তিবাবু দেখলেন নিচে অনাবাদি লুঙ্গা জমি সব জ্যোতিবাবুর দখলে। অথচ তার পাশের টিলায় দুর্গম পাথর, কাঁকড়ে ভরা মাটিতে তৈরি হয়েছে কলোনি। লোকগুলি অমানুষিক পরিশ্রম করে পাহাড়ের গাছপালা মাটি কেটে জমিকে চাষযোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। অথচ লুঙ্গা জমিগুলি পেলে অনেক তাড়াতাড়ি ওরা এতে চাষবাস করে বাঁচতে পারতো। অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় লোকগুলি কেমন দুমড়ে মুচড়ে ঝুলে পড়েছে। বারবার দাবি করেও কোনও সুরাহা ওরা পাচ্ছে না। জ্যোতিবাবুর মতো কিছু লোক সবসময় মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের দুঃখ কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

জ্যোতিবাবু সম্ভবত এদিকটায় সবসময় আসেন না। আজ ওকে দেখেই ঘর থেকে মানুষ ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল। বাধ্য হয়ে দুদণ্ড এখানে দাঁড়াতেই হল। জ্যোতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, কিসের তরজা পেটা হচ্ছিল গনেশ?'

'ওসব বলে লাভ নেই বাবু। সারাদিন ধরে এসব এখানে চলতেই থাকে।

রুক্মিনীর কলার থোর খেয়ে নিয়েছে কে চুরি করে। তাই নিয়ে রুক্মিনীর বৌ ছি-কিষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম গাইছে।'

'অ – তা তোমরা আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছ কেন?'

কারো মুখেই রা নেই। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু সাহস করে কেউ কথা বলতে পারছে না। বৃদ্ধ হরিদাস নমঃশূদ্র একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, 'সাহস করে তোরা কেউ কথাটা বলতে পারছিস না? পেটে নেই ভাত আর মুখে কত লাজ – ছেনাল মাগী।'

জ্যোতিবাবু ওদের অভয় দিয়ে বললেন, 'এতো আমতা আমতা করার কি আছে আমি তো তোমাদেরই লোক। যা বলার বলে ফেল। যদি সম্ভব হয় আমি চেষ্টা করব করে দিতে। তবে ইস্কুল, হাসপাতাল চাইবে না। ওসব এখন হবে না।'

গণেশই আবার হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে না বাবু লেখাপড়া করার মতো শখ আমাদের নেই। ওসব যদি হয় হবে না হলেও চলবে। এখন পেটে ভাত দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেন।'

'কেন সরকারি চাল, ডাল, কেরেস তেল তো পাচ্ছ?'

'আজ্ঞে তা মাঝে মাঝে যৎসামান্য পাচ্ছি বটে। কিন্তু তা দিয়ে তো আর এতোগুলি লোকের সংসার প্রতিদিন চলে না।' জয়কৃষ্ণ দাস বলল, 'তাছাড়া এই সাহায্য তো আমরা আজীবন পাব না। একদিন সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে তখন খাব কি? এখানে যে জায়গা আমাদের দেওয়া হয়েছে তা টিলা জমি। বর্ষাকালে এখানে টুকটাক চাষবাস হলেও বাকি সারা বছর বাঞ্জা মাগীর মতো শুকনো মুখে চেয়ে থাকবে।'

গণেশ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'আমরা আপনার ঐ লুঙ্গা জমিগুলির কথা বলছিলাম বাবু। এগুলি পতিত পড়ে আছে, যদি আমাদের কাছে বর্গা দিয়ে দেন আমরা এই জমি দু ফসলি অবশ্যি করতে পারব।'

'আমরা তেমন কিছু চাইব না বাবু। এই জমি তৈরি করতে চার পাঁচ মাস সময় লাগবে। ঐ সময়ে আমাদের সামান্য খোরাকিটা আপনি দেখবেন। আর ফসল হয়ে গেলে এক ভাগ আপনার এক ভাগ আমার।'

শান্তিবাবু হেসে বললেন, 'আপনাদের প্রস্তাবটা তো খারাপ না। ভাল প্রস্তাব এই সুযোগে অনাবাদি পতিত জমিগুলি আবাদ হয়ে যাবে। জমির মূল্য আরও বাড়বে। কি বলিস জ্যোতি?'

জ্যোতিবাবু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন শান্তিবাবুর কথায়। তিনি সামান্য হাসলেন, হেসে কিছুক্ষণ থেমে রইলেন। তারপর ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়ে বললেন, 'ঠি-ক আছে। দাদা যখন বলেই ফেলেছে তাই হবে। তবে পরশুদিন সকালে তোমরা আমার বাড়িতে চলে এসো আরও বিস্তারিত কথা হবে।'

কলোনিবাসীদের চেহারায় ক্ষণিকের জন্য একটা খুশির ঝিলিক খেলে

গেল। জ্যোতিবাবু শান্তিবাবুকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। সামনেই পড়বে উত্তর কলোনি। ওখানে ষাটটা পরিবার নতুন বাড়ি ঘর করে বসেছে। ওদের পেরিয়ে দক্ষিণ কলোনিতে জ্যোতিবাবুর আরও এক খন্ড জমি আছে।

দক্ষিণ কলোনিতে এসেই মড়াকান্না শুনতে পেলেন ওরা। কাছে গিয়ে দেখেন অনেক মানুষের ভিড়। মাঝখানে ঘনা শীলের বিধবা মা নিজের বুক চাপড়ে আর্তনাদ করছে। তার সামনে পড়ে আছে ঘনার দেহহীন মুন্ডুটা। এই দৃশ্য দেখে শান্তিবাবু স্থির থাকতে পারলেন না, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বীভৎস দৃশ্য! চোখে দেখলে শরীর গুলিয়ে ওঠে। বিধবা ঘনার মা ঘনাকে সঙ্গে নিয়ে পরিচিত লোকদের হাত ধরে এপাড়ে এসেছিলেন মাসখানেক হল। দিন তিনেক আগে রান্নার লাকড়ি আনতে ঘনা যে জঙ্গলে গেল আর ফিরে আসেনি। তিন দিন পর অনেক খোঁজাখুঁজি করে গ্রামের মানুষ ধুরার ছড়ার কাছে এই মুন্ডুটা পেয়েছে। জ্যোতিবাবুদের দেখেই জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

'আমরা কি মানুষ? মানুষের বাচ্চা আমরা? উদ্বাস্তুরা গরু-ছাগলের বাচ্চা। রোজ রোজ একটা দুইটা মানুষ বাঘের পেটে যাচ্ছে অসহায়ভাবে। অথচ কেউ এর প্রতিকার করছে না?' উত্তেজিত ভাবেই বলল একজন যুবক।

জ্যোতিবাবু ওদের কাছে গিয়ে বললেন, 'থানা পুলিশে তোমরা জানাওনি?'

'নন্দিনী মারা যাওয়ার পর জানিয়েছিলাম। ওনারা এসেছিলেন কোন লাভ হয়নি। থানার দারোগাবাবু কাশীনাথ ভট্চাজ মশাই এসে নন্দিনীর লাশটা পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'এটা তো মানিটারের কাজ।' আবার বললো সেই যুবক।

বেঁটেখাটো বয়স্ক লোক পন্ডিত। এটা ওর ডাক নাম। সারাদিন নেশা করে ঘুরে বেড়ায়, কাজকর্ম কিছুই করে বলে মনে হয় না। তবু লোকে তাকে মান্যি করে। সব বিষয়ে তার মতো পান্ডিত্য এ অঞ্চলে কারো আছে বলে মনে হয় না। পন্ডিত জ্যোতিবাবুকে বললেন, 'থানার লোকেরা আমাদের মুখ্যু পেয়েছে জ্যোতিবাবু। একবার বলে এটা মানিটারের কাজ আবার বলে রেঞ্জারের কাজ। আমি তিন দিন ঘুরে এখানে কোন মানিটার কিংবা রেঞ্জারের অফিসতো কোথাও খুঁজে পেলাম না।'

শান্তিবাবু মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দারোগাবাবুর কথা আপনারা বুঝতে পারেননি।'

সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল। শান্তিবাবু আবার বললেন, 'দারোগা বলেছেন বাঘটা ম্যান-ইটার, মানে মানুষ খেকো বাঘের কাজ। ফরেস্টের রেঞ্জ্ অফিসের সাথে যোগাযোগ করলে ওরা বাঘটাকে মারার ব্যবস্থা করবে।'

সুনীতিবালা এগিয়ে এসে বললেন, 'মানুষ খেকো ব্যাপারটা কি বাবু?'

শান্তিবাবুর চোখে মুখে আতংকের বলিরেখা ফুটে উঠল। 'এটা বড় ভয়ের

ব্যাপার মাসিমা। বাঘ সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করতে চায় না। কিন্তু যদি কখনো একবার করে ফেলে আর তার মুখে মানুষের রক্তের স্বাদ লেগে যায়, তখন সে আর অন্য প্রাণীর মাংস খেতে চায় না। শুধু মানুষের মাংস খাওয়ার জন্য বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ফলে এরা খুবই বিপজ্জনক, ইংরেজীতে ওদের 'ম্যান ইটার' বলে।'

সবাই ভয় পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল। খগেন দাস বলে, 'আরে পন্ডিতদা, তুমি কোন্ ধরনের পন্ডিত অ্যাঁ? শুধু শুধু চারদিন ধরে পাগলের মতো মানিটার আপিস খুঁজলাম?'

পন্ডিত খুব জব্দ হল। কিন্তু সে দমার পাত্র নয়। রেগে বলল, 'আরে ধুর ব্যাটা, পন্ডিতের কি ভুল হয় না? আমি কি ইংরেজি জানা পন্ডিত নাকি। আমি তো বাংলা পন্ডিত। গন্ডমূর্খ কোথাকার। তবে আমি একটা কাজ করেছি জ্যোতিবাবু। খবর পাঠিয়েছি কৈলাশহরে, সেখান থেকে বন বিভাগের একজন বড় অফিসার আসবেন এই বাঘটাকে মারতে।'

'তা হলে তো হয়েই গেল।' জ্যোতিবাবু বললেন, 'আর দু-চার দিন অপেক্ষা কর সবাই রেঞ্জারবাবু এলে বাঘটা নিশ্চিত মারা পড়বে। তবে মাঝখানের কয়েকটা দিন জঙ্গালে কেউ লাকড়ি কাটতে যেওনা।'

দুয়েকজন অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাইলেও জ্যোতিবাবু আর কথা বলতে চাননি। সবাইকে বাড়িতে আসতে বলে দ্রুত গন্তব্যের দিকে হাঁটতে লাগলেন। শান্তিবাবুর কানে ঘনার মার আর্তনাদের শব্দ এখনও ভেসে আসছে। ঘনার মার এই কান্না এই জীবনে আর কখনও থামবে না। শান্তিবাবু উদাসভাবে হাঁটতে লাগলেন। কেন সোনার জমি, সোনার দেশ, হাজার পুরুষের ভিটি এই উদ্বাস্তুদের ছেড়ে আসতে হল? কার অভিশাপে? কে দায়ী? এই যে প্রাণহরণ চলছে, এই যে নিরন্তর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে মানুষগুলি, কিসের পাপে? আর কত রক্ত দিতে হবে তাদের? হয়তো একদিন এই জমি এই অঞ্চলগুলি সোনায় ভরে যাবে তখন আবার তাদের উদ্বাস্তু বলে কেউ তাড়িয়ে দেবে না তো? এই রকম হাজার চিন্তায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে অনেকটা পথ এগোলেন ওরা। তখনি জ্যোতিবাবু বললেন, 'এই তোমার জমি দাদা। ভাল করে দেখে নাও তুমি খুশি হবে।

শান্তিবাবু জমি দেখে কিছুটা খুশিই হলেন। জমিগুলি লুঙ্গা এবং আবাদি জমি। ধানের শিষ্‌গুলি সাপের ফণার মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ধানের খেতে এখনও জল লেগে আছে। বনের ছোট ছোট প্রাণীরা জল খেয়ে আবার জঙ্গালে হারিয়ে যাচ্ছে। জমিগুলি উন্নতমানের উর্বরা জমি। সব মিলিয়ে আট দশ কানি ধানি জমি হবে। শান্তিবাবু বললেন, 'এই জমিগুলি বেশ ভাল হয়েছে জ্যোতি। তিন ফসলি খেত হবে এগুলি।'

'যাক বড় সুখ পেলাম মনে দাদা। এই জমি তোমার পছন্দ হয়েছে শুনে খুব ভাল লাগছে।' জ্যোতিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'এই জমিগুলি তোমার জন্যই কিনে রেখেছি। তুমি যে চার হাজার টাকা আমাকে পাঠিয়েছিলে সেই টাকা

দিয়েই এই জায়গা আমি কিনে রেখেছি। কেমন হয়েছে দাদা বল?'

শান্তিবাবু জ্যোতিবাবুর কথাটা ঠিক মতো খেয়াল করেননি। শান্তিবাবু তো শুধু চার হাজার টাকা পাঠাননি জ্যোতিবাবুকে। নব্বই হাজার টাকা নগদ এবং সোনা দানা, কাসা, পেতল সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার জিনিসপত্তর অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোককে দিয়ে এপাড়ে পাঠিয়েছেন। হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর ধোঁয়াশায় ঢেকে গেল পরিবেশটা। শান্তিবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'টাকাটা সঠিক জায়গাতেই ফেলেছিস জ্যোতি। খুব সুন্দর জায়গা হয়েছে এটা।'

'আমি অনেক ভেবে জায়গাটা কিনেছি দাদা। এই যে জায়গাটা, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই প্লটটাও তোমার। বাড়ি ঘর করার জন্য বলতে পার এটা আদর্শ জায়গা।'

জ্যোতিবাবু কি বলতে চাইছেন সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না শান্তি বাবুর। কিন্তু ধোঁয়াশা ভাবটা তখনও কেটে যায়নি। শান্তিবাবু বললেন, 'শোন্ জ্যোতি, তোর কাছে আমি যে টাকাগুলি পাঠিয়েছিলাম এগুলি আমাদের এজমালি সম্পত্তি। শুধু আমার হতে যাবে কেন? এই জমির অর্ধেক অংশ তোরও।'

'না না দাদা আমার জন্য চিন্তা করবে না। তোমাদের আশীর্বাদে আমার যা আছে তাতেই কষ্টেসৃষ্টে কেটে যাবে বাকি দিনগুলি।'

শান্তিবাবু এবার স্পষ্ট জানতে চাইলেন, 'কিন্তু জ্যোতি আমি খেপে খেপে নব্বই হাজার টাকা ছাড়াও প্রায় এক লক্ষ টাকার সোনাদানা, কাঁসা পেতল তোকে পাঠিয়েছি। এসব বোধয় এখনও খরচা করিসনি?'

জ্যোতিবাবু এমন অবাক হয়ে তাকালেন শান্তিবাবুর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। জ্যোতিবাবু দ্রুত পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন। 'তুমি এসব কি বলছ দাদা? এমন তাজ্জবের কথা তো আমি আগে শুনিনি। নব্বই হাজার টাকা!'

শান্তিবাবু অসহায় চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে তুই আর কোন টাকা পাসনি?'

'তুমি কি ভাবছ আমি তোমার সাথে প্রতারণা করছি দাদা? তুমি যে টাকা পয়সা, সোনা দানার কথা বলছ সেটা থাকলে আমি তো গোটা মহকুমাটাই কিনে নিতে পারতাম। তুমি কাকে দিয়ে টাকাটা পাঠিয়েছ?'

'কৃষ্ণ ও নিতাইকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম জ্যোতি. ওরা দুজনেই অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। ওরা পয়সাগুলি মেরে দেবে সেটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তাছাড়া ওরা প্রতিবারই তোর হাতে লেখা প্রাপ্তি সংবাদ আমাকে পৌঁছে দিয়েছে। দেখ ভাই তোর কোথাও ভুল হচ্ছে না তো?'

'দাদা তুমি কি আমাকে সমাজে বাটপার বানাতে চাইছ? বাবাকে হারিয়েছি অনেকদিন আগে। তখন থেকে তোমাকে বাবার মতোই দেখছি। তুমি মিথ্যে বলছ না জানি কিন্তু বিশ্বাস কর আমিও মিথ্যে বলছি না। যদি তুমি বিশ্বাস না কর, যা বিষয় আশয় আমার নামে আছে তুমি নিয়ে যাও। তবু এই সমাজে আমাকে ছোট

করবা না, দোহাই তোমার।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তিবাবু শূন্যে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। যে স্বপ্ন ও নিশ্চয়তার ভিত্ তিনি মনের গভীরে লালন করছিলেন গত কদিন ধরে তা মুহূর্তের মধ্যেই খান্ খান্ হয়ে কাঁচের টুকরোর মতো ভেঙে পড়ল। তার মাথাটা কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। জ্যোতিবাবু ভাল খারাপ অনেক কথাই তখনও বলে যাচ্ছেন। কিন্তু শান্তিবাবুর কানে তখন কিছুই ঢুকছিল না। মনে মনে ভাবলেন কোথায় যাবেন এবার। দেশে যে সম্পত্তিটা এখনও রয়ে গেছে তার উপর নির্ভর করে তিনি হয়তো চলতে পারবেন। কিন্তু আবার সেখানে ফিরে যাবেন কি?

তিনি সোজা পা বাড়ালেন জ্যোতিবাবুর বাড়ির দিকে। পেছনে জ্যোতিবাবু বারবার ডাকলেন দাদাকে। কিন্তু শান্তিবাবু মুহূর্তের জন্যও ফিরে তাকালেন না। সোজা গট্ গট্ করে ফিরে এলেন। ঘরে ফিরেই তরুবালাকে ডাকলেন তিনি। তরুবালা রঘুকে নিয়ে তখন শুয়েছিলেন। স্বামীর উদভ্রান্তের মতো চেহারা দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। স্বামীর খুব কাছে গিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। 'কি হয়েছে গো? আমাকে খুলে বল।' শান্তিবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তার কান্নার শব্দ শুনে ছোট বউ ও মা ছুটে এলেন। জ্যোতিবাবুর ছেলে দুটি, বাড়ির অন্যান্য লোকজন সব ছুটে এল।

প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে শান্তিবাবু বললেন, 'তৈরি হয়ে নাও তরু, আমাদের শরণার্থী শিবিরে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন? শরণার্থী শিবিরে যেতে হবে কেন? দেশের বাড়ির সবকিছুই তো বিক্রি করে ছোট ভাইকে পাঠালে। এখন আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইও এখানে পাব না?'

মুখে আর কথা না বলে নিজের পোটলা পুটলি, ট্রাংক সব গুছিয়ে নিলেন শান্তিবাবু। ঘুমন্ত রঘুকে জাগিয়ে দিলেন তিনি। বৃদ্ধা সুরবালা ঘটনা কিছু না বুঝে হতবাক হয়ে রইলেন। মাথার আঁচল টেনে ছোট বৌ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে দাদা আমাকে একটু খুলে বলুন। কেন আপনি রাগ করে চলে যাচ্ছেন এই ভর দুপুরে?'

সুরবালা শান্তিবাবুর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ও শান্তি, কি হয়েছে বাপ? আমাকে বল। রাগ হল চন্ডাল, রাগ করে ফুলের মতো বৌ আর বাচ্চাটাকে কষ্ট দিস না বাপ।'

শান্তিবাবু কিছু উত্তর দিলেন না। ঝুঁকে মা'র পায়ে পড়ে প্রণাম করে বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করবে না মা। আমি এখন নিঃস্ব হয়ে গেলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারব। তবে আমার এই কষ্টের দিনে তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাই না। তোমার বড়লোক ছেলের কাছেই এখন থাকো। আমার একটা ঠিকানা হোক তারপর তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে আমার কাছে চলে এসো।'

সুরবালা কি যেন ভেবে চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু ছোট বউ হঠাৎ রেগে

গেলেন।

'কেন দাদা, আপনি নিঃস্ব হতে যাবেন? হাজার হাজার টাকা দেশ থেকে পাঠিয়েছেন, আমি নিজের হাতে সেই টাকা সিন্দুকে তুলে রেখেছি। মা আপনি কথা বলুন, দাদাকে এভাবে যেতে দেবেন না। আমার সংসারের অমঙ্গল হবে সন্তানের অভিশাপ লাগবে।'

'অ শান্তি তুই আজকের রাতটা থাক বাবা। জ্যোতি আসুক, একটা সমাধান বেরিয়ে যাবে।'

'আমি কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না মা। তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখ দেখবে বছর ঘুরতেই আমি ঘুরে দাঁড়াব। নিজের ছোট ভাইকেই যখন আমি চিনতে পারলাম না তখন কারো উপর আর ভরসা করব না।'

'আপনি যে ঠকবেন আমি জানতাম দাদা। আমার সাথে সে কথা বলেছিল। আমি প্রতিবাদ করায় আর এ বিষয়ে কথা বলার সাহস পায়নি। নিশ্চই সে বলেছে আপনার পাঠানো টাকা পয়সা সে পায়নি। এই যে দেখুন আপনার পাঠানো গয়না আমার শরীরে। সে পায়নি বললেই হল?'

শান্তিবাবু আর কথা বাড়ালেন না। রঘুকে কাঁধে বসিয়ে এক হাতে ট্রাংক ও অন্য হাতে পোটলা ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে তরুবালার গলা জড়িয়ে মোহিনী ক্রমাগত কাঁদতে লাগলেন। তরুবালাও কাঁদলেন প্রাণ ভরে। তারপর চোখের জল মুছে স্বামীর পথ অনুসরণ করলেন। সুরবালা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে ঢুকে আঁচলে মুখ চাপা দিলেন।

রিফিউজি ক্যাম্পে জায়গা পেয়ে গেলেন শান্তিবাবু। যাদের জমির পাট্টা হয়ে গেছে তারা চলে যাচ্ছে এই ক্যাম্প ছেড়ে। এমন একটা ছেড়ে যাওয়া ঘরেই জায়গা হল তার। ছনের বেড়া ছনের চালা দিয়ে খোলা জমিতে তৈরি হয়েছে ঘর। ঘাসে ভরা কাচা মেঝেতে লিকপিক করে ছিনেজোঁক। মেয়েদের লজ্জা ঢাকতে কেউ কেউ শাড়ি ঝুলিয়ে দরজায় পর্দা টাঙিয়েছে। তাও সর্বত্রই একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। পায়খানা থেকে চান সবকিছুতেই নদীর উপর ভরসা। শত চেষ্টাতেও নিজেদের সারাক্ষণ বে-আব্রু মনে হয়। এই ঘরগুলি সরকারিভাবে করে দেওয়া হয়েছে। যারা ঘর পাচ্ছেন না তারা নিজেরাই উলুছন দিয়ে নিজেদের ঘর তৈরি করে নিয়েছেন। নোংরা পরিবেশে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তরুবালা নাক মুখ চাপা দিয়ে বসে রইলেন। এর মধ্যেই নুয়ে পড়া বৃদ্ধ বসে আছেন, বাচ্চারা খেলছে, আবার খিদের জ্বালায় কেউ কেউ কাঁদছেও। হতাশা ও হাহাকার সবার চোখে মুখে।

সেখানেই দেখা হয়ে গেল মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য ও তারেকেশ্বর দত্তের সাথে। দুজনেই এই এলাকার পুরানো বাসিন্দা ও কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। মণিভূষণবাবু একজন আত্মভোলা মানুষ। রিফিউজিরা ওদেশ থেকে আসা শুরু হতেই তিনি পুরোভাগে। প্রশাসনের সাথে কথা বলা, রিফিউজিদের জন্য রিলিফের ব্যবস্থা

করা, তাদের জন্য জমির বন্দোবস্ত করা। এ নিয়েই কাটছে তার সারাদিন। বাড়িতে বিশাল মাটির একখানা গুদাম রয়েছে সেখানে বিপদে পড়ে উদ্বাস্তুরা শরণ নিচ্ছেন। চব্বিশ ঘন্টা একটা চুলা জ্বলছে। সেখানে খিচুড়ি ও আলু ভাজা হচ্ছে। যারা বিপদে পড়েছেন তারা এখানে এলে রাস্তা পেয়ে যাচ্ছেন। মণিবাবুর বাড়ির লোকেরা তার উপর খুবই বিরক্ত। কিন্তু এলাকার লোকেদের কাছে তিনি দেবতার মতো। এই দুঃসময়ে এই লোকটার মিষ্টি ব্যবহার ও অচেনা মানুষকে আপন করে টেনে নেওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। মানুষ এখানে এলেই তিনি পরিত্রাতা হয়ে যাচ্ছেন। তারই সমবয়সী লোক তারকেশ্বর দত্ত অত্যন্ত গোছালো মানুষ, আবেগ কম, তবে পরোপকারী। এই দুটো লোকের সাথে রিফিউজি ক্যাম্পে দেখা হয়ে গেল শান্তি বাবুর।

আসলে জ্যোতিবাবু ভাবতেই পারেননি তার দাদা তার উপর এতোটা ক্ষেপে যাবেন। শান্তিবাবু যে এতো সহজে সবকিছু ছেড়ে চলে আসবেন সেটাও তিনি ভাবেননি। তিনি ভেবেছিলেন শান্তিবাবু রেগে যাবেন, প্রয়োজনে পাঁচজন ডেকে সালিশী হবে। সেখানে দাদাকে কিছু দিয়ে বাকিটা তিনি হজম করে নেবেন। সত্যি কথা বলতে কি দাদাকে পুরো ঠকানোর তেমন কোন ইচ্ছেও জ্যোতিবাবুর ছিল না। কিন্তু শান্তিবাবু যে এতোখানি রেগে সব পরিত্যাগ করে ফেলবেন সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

শান্তিবাবু চলে আসার পরদিন জ্যোতিবাবু স্বস্ত্রীক সেই ক্যাম্পে ছুটে এলেন। দাদার পায়ে পড়ে নানাভাবে দাদাকে বোঝানোর চেষ্টা করে বিফল হলেন। বারবার অন্যায় স্বীকার করেও যখন কাজ হলো না তখন জ্যোতিবাবু মণিবাবু ও তারকবাবুকে অনুরোধ করলেন শান্তিবাবুকে বোঝানোর জন্য। জ্যোতিবাবু অভিমানের সুরে বললেন, 'দেখুন মণিদা, আমি তো তেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। কি বলতে কি বলে ফেলেছি আর দাদা রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে এল। এই উদ্বাস্তুদের মতো জীবন সে কাটাতে পারবে না। আমাদের জমিদারি দেশ ছাড়ার আগেও সামান্য অবশিষ্ট ছিল। দাদাকে লন্ডন থেকে পড়াশোনা করিয়ে এনেছেন বাবা। দেশে ফিরে দাদা জমিদারির কাজে যোগ দিয়েছিল। এহেন লোক কিনা রিফিউজি ক্যাম্পে থাকবে? আর আমি কি এমন কথা বলেছি? টাকা পুরোটা পাইনি তাই তো বলেছি, কিছুই পাইনি তা তো বলিনি। তখন ভুলে গেছি ঠিকই কিন্তু পরে আমার মনে হয়েছে হাজার চল্লিশেক টাকা আমি পেয়েছি।'

মোহিনীদেবী ঘোমটা টেনে স্বামীকে ধমকে উঠলেন, 'কেন, দেশ থেকে পাঠানো গয়না তুমি পাওনি? কেন মিথ্যে কথা বলছ? সাত্ত্বিক মানুষ হলেন দাদা, তোমার এসব অপকর্ম ধর্মে সইবে?

তারকবাবু বললেন, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে শান্তিবাবু, দুষ্টু ছোট ভাইটি যখন অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই ভাল নয় কি?'

শান্তিবাবু বললেন, 'দেখুন ত্রিপুরায় আমি অনেক আশা নিয়ে এসেছি।

ভরসা করেছি নিজের ভাইয়ের উপর। আশা বলছি কেন সম্ভবত সবটুকু নির্ভরতাই ছিল তার উপর। ভেবেছিলাম দেশের মতোই একসাথে আমরা থাকব। কিন্তু আজ আর এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার। স্বপ্ন ভেঙে গেছে আর এখানে থাকবো না আমি। দেশে বাড়ি ও অল্প কিছু জমি আমাদের রয়ে গেছে। প্রথম কিছুদিন ওখানেই থাকব। তারপর নদিয়ায় আমার শ্বশুরবাড়ি আছে, পরিস্থিতি খারাপ হলে ওদিকেই চলে যাব। আর দেশের সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা দেশেই থেকে যাব।'

মণিবাবু সবিস্তারে দুই ভাই থেকে সব ঘটনা শুনে বাধা দিয়ে বললেন, 'একথা বললে তো আর হবে না শান্তিবাবু। আপনি গুণী মানুষ। একবার এই পাহাড়ে এসেই যখন পড়েছেন আপনাকে তো আমরা ছাড়ব না। এই জায়গার দায়িত্ব আপনাকেও নিতে হবে, না হয় আমরা কোথায় যাব? আপনার ভাই আপনাকে আঘাত দিয়েছে কিন্তু আমরা তো কোন অন্যায় করিনি।'

তারকবাবু বললেন, 'আপনার থাকা খাওয়া রোজগারপাতির সব দায়িত্ব আমাদের। আমরা আজকেই আপনাকে আপনার নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

'আমার নিজের বাড়ি!' একটু অবাক হয়ে তাকালেন শান্তিবাবু।

মণিবাবু হেসে বললেন, 'বুঝতে পারছেন নাতো? আসলে কলাবাগানে আমার একটা খামার বাড়ি আছে। ওখানে অনেক লোককে জমি দেওয়া হয়েছে, আপনাকেও ওখানেই জায়গা দিয়ে দেব।'

তারকবাবু বললেন, 'বাড়িঘর উঠোন পুকুর সব রেডিমেড্ আছে। এমনকি কাজের লোকও পেয়ে যাবেন আপনি।'

শান্তিবাবুর চোখে আবার জল এসে গেল। এতোটা তিনি আশা করেননি। এবার হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা আমার কষ্ট দেখে এতোটা করেছেন আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা একদম খারাপ পাবেন না, বিনে পয়সায় কারও অনুগ্রহ আমি নিতে পারব না।'

মণিবাবু ও তারকবাবু এবার আরও জোরে হাসলেন। তারকবাবু বললেন, 'আরে মশাই বিনে পয়সায় আপনাকে কে দেবে? পুরো পয়সাটা আপনার থেকে বুঝে নেওয়া হবে। এখন আপনি ঘরে যান তৈরি হোন একটা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিতে হবে। পারলে দুয়েকদিনের মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে। বাকিটা আমরা দেখছি।'

মণিবাবু বললেন, 'জমিটা আমার শান্তিবাবু। আপনার সামান্য কাজেও যদি লাগে আমি ধন্য হব।'

তারপর তিনি হাবুকে ডেকে বললেন, 'এই হাবু শান্তিবাবুর মালপত্তর নিয়ে কলাবাগান চলে যা আমার খামার বাড়িতে। দেখিস ওনার যেন কোন অসুবিধা না হয়।'

হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন ওরা দুজন। মুগ্ধ হয়ে

ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন শান্তিবাবু। রঘুকে বুকে চেপে ধরে তার মনে হল সত্যিই তাহলে ঈশ্বর আছেন। জ্যোতিবাবু ও তার স্ত্রী অনেক চেষ্টা করলেন শান্তিবাবুকে বোঝাতে। কিন্তু শান্তিবাবু মোটেই টললেন না উল্টে বলে দিলেন, 'যদি দুঃসময় তোমার জীবনে কখনো আসে আর আমি জীবিত থাকি এসো আমি তোমাকে সাহায্য করবো। আর নইলে আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করো না।'

হারুকে নিয়ে শান্তিবাবু হাঁটা পথে নতুন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন এটাতো সম্পূর্ণ তৈরি বাড়ি। ইচ্ছে করলে আজ থেকেই ব্যবহার করা যাবে। নতুন একখানা বাড়ি ফিরে পেয়ে তিনি খুশি হয়ে গেলেন। দুজনে মিলে দেরি না করে ঘর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তরুবালা সন্ধ্যায় তুলসী বেদীতে চাটা জ্বালাতেই একটা নতুন সাংসারিক আবহ যেন বুকের ভেতর তানপুরার মতো বেজে উঠল।

বাড়ি নতুন পরিবেশ নতুন তবু এই এলাকাটার একটা স্নিগ্ধতা আছে। চারিদিকে ঘন কালো সবুজ আর সবুজ। প্রকৃতি যেন দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে রেখেছে সারাক্ষণ। রুক্ষ লালমাটির টিলা জমি দিক থেকে দিগন্তে ছুটে গেছে পাইথনের ঢেউ তোলা শরীরের মতো। আর স্বল্প দূরত্বেই একটা খরস্রোতা নদী এই অঞ্চলকে আরও দুর্গম করে তুলেছে।

এভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তার মধ্যে মনে রাখার মতো কিছুই নেই শুধু অমানুষিক পরিশ্রম ছাড়া। তবে রঘু যেন খুব দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছে। সেদিনের ছোট্ট রঘু আজ স্কুলে যায়, মা বাবার কাজে সাহায্য করে।

একদিন শান্তিবাবু বাঁশের মাচানে শরীর এলিয়ে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছেন। তরুবালা লবণ মিশিয়ে একটু কড়া চা এনে দিলেন। এই কদিন শান্তিবাবুর জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এলাকার কিছু লোক মিলে শান্তিবাবুকে স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেছেন। স্কুলটি প্রাথমিক মানের। সরকার বা শিক্ষা দপ্তরের কোন স্বীকৃতি নেই এই স্কুলের। শান্তিবাবুর মতো আরও একজন স্কুল শিক্ষক রয়েছেন এখানে। ওদের দুজনকেই পন্ডিত বলে নামের শেষে ডাকার প্রচলন হল। তাদের বাঁচার জন্য, খাওয়া পড়ার জন্য কিছু অনুদান একটা কমিটি প্রতিমাসে দিয়ে দিত। যদিও এই অনুদানও এতোই বেশি ছিল শান্তিবাবুদের খাওয়া পড়ার শেষেও যথেষ্ট বিলানোর মতো থেকে যেত। কিন্তু নগদ টাকা কিছুই মিলতো না। শান্তিবাবু বিদ্বান মানুষ দ্রুত ওনার নাম এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তবু তিনি যেন কোন কিছুতেই আনন্দ পেতেন না। সারাক্ষণ অবসন্ন, ক্লান্ত চেহারা নিয়ে মনমরা হয়ে পড়ে থাকতেন।

তরুবালা জীবনী শক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর, কিছুতেই তার দম ফুরিয়ে যায় না। উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন। কদিন হল গাড়ু নামে একটা বিহারি ছেলে তাদের বাড়িতে এসে জুটেছে কাজের জন্যে। তরুবালা তাকেও সন্তানের

মতো আপন করে নিয়েছেন। তাকে পাশে নিয়েই শান্তিবাবু ও তরুবালা মিলে এই তিন কানি জমির বিশাল বাড়িটা বাঁশের শক্ত পোক্ত বেড়া দিয়েছেন। না হয় রাতের আঁধারে শ্বাপদের অতর্কিত হামলায় গরু, ছাগল, হাঁস যে কোন কিছুই গায়েব হয়ে যেতে পারে। সামান্য দূরেই একটা টিলায় গারদ আছে। এখানে সামান্য কজন পুলিসও আছে। তাতে কি? বাঘ দিনের বেলাতেই ঐ গারদটিলায় চলে আসে। ধলাই নদী পর্যন্ত গভীর জঙ্গালের মাঝে সামান্য পায়ে চলার পথ। কৃষকদের হালের বলদ নদীতে জল খেতে খেতেই অপর পারে মুখোমুখি চলে আসে বাঘ। তবে দুর্গমতা কমছে। ব্যাপক হারে গাছ কেটে জঙ্গাল কেটে পরিষ্কার করছে উদ্বাস্তুরা। যদি এভাবে চলতে থাকে, মানুষের অভিমুখ ক্রমশ অগ্রসর হয় জঙ্গালের দিকে, তবে অচিরেই তাদের চারপাশের জঙ্গল উধাও হয়ে যাবে।

তরুবালা পাশে এসে বসতেই শান্তিবাবু উঠে বসলেন। তরুবালা পরম যত্নে স্বামীর পায়ের লাল লাল ফোস্কা পড়া ক্ষতগুলিতে গরম কাঁচা হলুদ বাটা লাগাতেই মৃদু আপত্তি করলেন শান্তিবাবু। 'কেন জখমগুলিতে অষুধ লাগাচ্ছ তরু? এতে শরীর আরও আরাম প্রিয় হয়ে যাবে।' তরুবালার চোখের জল টপ টপ করে ঝরে পড়ে শান্তিবাবুর পায়ের উপর। শান্তিবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'একি তরু তুমি কাঁদছ কেন?'

'জীবনে কখনও নিজের হাতে জলটা পর্যন্ত গড়িয়ে খাওনি তুমি। আর এখানে লাঙ্গল দিয়ে হাল চাষ করছ, মাটি কাটছ? কোথা থেকে কোথায় নেমে এলাম আমরা। এই দৃশ্যও আমাকে দেখতে হবে কোনদিন ভাবিনি। হায় ঈশ্বর।' এবার শান্তিবাবু প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'তুমি কি কম কষ্ট করছো তরু? একাই দশভূজার মতো এই বাড়ির সব কাজ সামলাচ্ছ।'

'দেখো এতো কাজ তোমাকে করতে হবে না। মাস্টারি করে যা পাচ্ছি এতেই দুবেলা আমাদের ভাল করে চলে যাবে।'

'আমার চাঁদের মতো বৌটা তার উজ্জ্বল সোনার অঙ্গ রোদের তাপে পুড়িয়ে ফেলেছে, একবারও নিজের দিকে তাকাচ্ছে না। আমি কি দেখতে পাইনা ভাবছো?'

শান্তিবাবুর যেন কোন তাড়া নেই আজ। তরুবালা সন্ধ্যা ধূপারতি জোকার দিয়ে ফিরতেই শান্তিবাবু ডাকলেন, 'তবে একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করে তরু।'

'কি ব্যাপার?' তরুবালা জানতে চাইলেন।

'এই জমিতে দম কতো দেখেছো? টিলার লাল পাথুরে মাটি, অথচ গাছগুলি কোন যত্ন ছাড়াই কি রকম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে।'

'এই জমি কিন্তু উর্বর। আমার ডাটা আর ঝিঙা গাছগুলি মনে হয় বর্ষা পেলে খুব সুন্দর হবে।'

'এই জমিতে সাংঘাতিক দম আছে এটাকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা

সবাই যদি চাই তাহলে আবার সুদিন নিশ্চিত আসবে।'

তরুবালা বললেন, 'একবার দেশে গিয়ে দেখে এসো না মসন্দর সত্যিই কিছু দেয় কিনা। না পুরো সম্পত্তিটাই মেরে দিয়েছে।'

'না মসন্দর এমন করবে না, তবে বলাও যায় না। নিজের ভাই যদি বেইমানি করতে পারে তাহলে মসন্দরও করতে পারে। যাব, কিন্তু এখন যাব না।'

এমনি একদিন অলস দুপুরে কাজের শেষে দুজনেই গল্প করছিলেন। হঠাৎ তরুবালা লাফিয়ে উঠলেন খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন 'কিগো তুমি শুনেছ?'

'কি?'

'ঐ যে শোন চৌধুরীদের বাড়ির দিকে একটা ময়না ডাকছে?'

'হ্যাঁ শুনেছি।'

'এটা আমাদের কথাকলি! ঐ শোন কথাকলি আমাকে ডাকছে। ঐ - ঐ যে আমাকে ডাকছে।'

চমকে উঠলেন শান্তিবাবু। 'হ্যাঁ তাইতো! আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

তরুবালা হঠাৎ বাড়ির সীমানা পেরিয়ে ঐ চৌধুরী বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন। গলা ছেড়ে চিৎকার করে ডাকলেন - 'কথাকলি - কথাকলি - ফিরে আয় - ফিরে আয় -।'

তরুবালার এই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে যাওয়া দেখে শান্তিবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। স্ত্রীকে পেছন থেকে বারবার ডেকেও তিনি তাকে নিরস্ত করতে পারলেন না। এবার তিনিও পেছনে ছুটতে লাগলেন। চৌধুরী বাড়ির কাছে শিরিষ গাছটার নিচে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন তরুবালা। তারপর অনুচ্চস্বরে আদর করে ডাকলেন, 'কথাকলি- , কথা - কলি -।' কিন্তু কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই, কোন পাখা ঝটপটানিও নেই। আবারও ডাকলেন মিহি সুরে কিন্তু না কোথাও কথাকলির কোন সাড়া পেলেন না। এবার হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন তরুবালা, 'কথাকলি - কথাকলি - সে নেই, সে আবার চলে গেছে, সে আমার সাথে অভিমান করে চলে গেছে। আর কখনো ফিরে আসবে না।'

শান্তিবাবু তরুবালার এই কান্না দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তরুবালার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এতদিনের দুর্বিসহ কষ্ট, শ্রম, অভাব, অবজ্ঞা, প্রতারিত হওয়া, স্বজন হারানো সবই তো হাসি মুখে চোখ বুজে মেনে নিয়েছেন তরুবালা। কিন্তু আজ তার ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। শান্তিবাবু স্ত্রীর পাশে চুপ করে বসে রইলেন, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তিনি হারিয়ে ফেললেন। ধীরে ধীরে তরুবালার বুকের কষ্ট যেন কিছুটা লাঘব হল। শান্তিবাবু স্ত্রীকে কাছে টেনে বললেন, 'তুমি তো কখনো এতোটা উতলা হওনি তরু। আজ তোমার হঠাৎ কি হয়ে গেল?'

'আমি আর পারছি না গো।'

'আমি বুঝতে পারছি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাহলে তুমি এক কাজ

কর। তুমি বরং বাপের বাড়িতে কিছুদিনের জন্যে চলে যাও।'

চমকে ফিরে তাকালেন তরুবালা। 'কেন? আমি বাপের বাড়ি ফিরে যাব কেন? আমার পতি কি দুর্বল আমি অন্যের সাহায্য চাইতে যাব?'

'তাহলে এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন?'

'কতোদিন পর কথাকলি এসে মা বলে ডাকল - মনে হল আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

'এটা তোমার ভ্রমও হতে পারে তরু।'

'না না সে এসেছিল - তুমি ওর ডাক শোননি?'

'হ্যাঁ ওটা ময়নারই ডাক। কিন্তু সে কথাকলি নাও হতে পারে।'

দুজনে কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে ফিরলেন। বাড়ি ফিরতে গিয়ে দেখেন রঘু চিৎকার করে ডাকছে, 'মা - মা এদিকে এসো - দেখে যাও।' রঘু এতো উত্তেজিত হয়ে ডাকছিল প্রায় ছুটে গেলেন দুজনে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলেন তা দেখে দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। ছোট একটা নালা যা প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি একটি ডোবা থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে চলে গেছে। সেই নালার দুদিকে বাঁধ দিয়ে গান্ডু, রঘু আর কুসুম মাছ ধরছে। থালা দিয়ে গান্ডু জল বাঁধের ওপারে হিচে ফেলে দিচ্ছে। আর কুসুম একাই মাছ ধরছে। চৌধুরী বাড়ির মেয়ে কুসুম, রঘুর চাইতেও ছোট। ঐ বাড়ির লোকেরা এই দৃশ্য দেখে হয়তো শান্তিবাবুর উপর বিরক্ত হবেন। কিন্তু তখন তাদের যা অবস্থা তাতে আর লুকানোর কিছু নেই। রঘু ও কুসুম সারা গায়ে কাদা মেখে ভূতের মতো হয়ে গেছে। রঘু ওদের ডেকে চুপচাপ বসে গেল, কোন ছটফটানি নেই। অথচ কুসুম মাছ ধরার চেষ্টা করছে। শান্তিবাবু ডাকলেন, 'ব্যাপার কি রঘু তুমি চুপচাপ বসে আছ?'

'খুব ব্যথা করছে বাবা। শিঙ মাছ কামড় দিয়েছে।'

তার কথা শুনে গান্ডুর হাসতে হাসতে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। গান্ডু বলে, 'না মামা রঘুকে শিঙ মাছে গালা দিয়ে দিল। আমি বললাম এইভাবে শিঙ মাছ ধরবেক নাই। কিন্তু সে আমার কোন কথাই শুনতে চাইল না। কিন্তু গালা খেয়ে প্রথমে বলে সাপ কেটেছে, পরে বলে কুমির কেটেছে। আমি আর কুসুম অনেক বুঝালাম ওকে কিন্তু সে কুছু বুঝতেই চায় না। এখন আর ভয়ে নিচেই নামছে না।'

গান্ডুর কথা শুনে সবাই হাসল। কুসুম বলল, 'পিসু, ট্যাংরা মাছ, শিঙ মাছ রঘুদা ধরতেই জানে না। আমি শিখিয়ে দিয়েছি তবুও পারে না। মুঠ করে শিঙ মাছ কি ধরা যায় রে বুদ্ধু?'

শান্তিবাবু মজা পেয়ে বললেন, 'তুমি পার কুসুম?'

'হ্যাঁ পিসু। এই যে এইভাবে মাছটার মাথায় প্রথমে চেপে ধরতে হয়। তারপর গলায় টিপে ধরে এইভাবে ডোলায় ছেড়ে দিতে হয়।' কুসুম একটা শিঙ মাছ ধরে ধরার কৌশলটা শিখিয়ে দিল।

রঘুর বোধ হয় আত্মসম্মানে লাগল সে তেড়েফুড়ে উঠে বলল, 'ধুর হাদা শিঙ মাছ আমি ধরতে জানি না ভেবেছিস? তোর থেকে ভাল জানি। আমাকে শিঙ মাছ কামড় দেয়নি বাবা আমাকে পানক সাপ কামড় দিয়েছে।'

তরুবালা আঁতকে উঠলেন, 'কোথায় দেখি?'

রঘু মা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলল, 'আরে মিছিমিছি ওদের বলতে হয় তাই - বুঝতে পারছ না?'

তরুবালা আশ্বস্ত হলেও তার উদ্বেগ কাটল না। তিনি বললেন, 'অনেক হয়েছে চল ঘরে ফিরে যাবে না হয় শরীর খারাপ করবে।'

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শান্তিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'কি বলছ তুমি তরু, আমিও তো মাছ ধরতে নামব। ছেলেকে সব শেখাতে হবে না? আয় রঘু মাছ ধরব। তুমিও যাও বড় ডেক্‌চিটা নিয়ে আস।'

বাপ ছেলে দুজনেই আবার নালায় নেমে গেলেন। জল প্রায় শুকিয়ে গেছে মাছগুলি ভেসে উঠেছে। কিন্তু এতো মাছ দেখে শান্তিবাবু বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। 'কিরে গাড়ু এতো মাছ কোথায় রাখবি? পচে যাবে না?'

'না না মামা পচবে কেন। জিওল মাছ জিইয়ে রাখি দিব, আর বাকি গুলান খেয়ে লিব।'

তরুবালা দুইটা বড় ডেকচি নিয়ে এলেন। কই, মাগুর, শিঙ, টাকি, পুটি, ট্যাংরা মাছে ভরে গেল ডেকচি দুটি। শান্তিবাবুও একবার শিঙ মাছের কাঁটা ফুটিয়ে গরম জলে হাত চুবিয়েও দীর্ঘ সময় চেঁচালেন। তবে মাছ দেখে মনটা ভরে উঠল সবার। এই ঝিলে এতো মাছ আছে আগে জানাই ছিল না কারো। চৌধুরী বাড়িতে অনেক মাছ পাঠানো হল। এছাড়া গ্রামেও বিলানো হল যথেষ্ট মাছ।

মাছ ধরার পরিশ্রম আছে। তবু মাছ ধরা যে এতো আনন্দের তা আজই প্রথম উপলব্ধি করলেন শান্তিবাবু ও তরুবালা।

৫

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল খুব দ্রুত। সাথে সাথেই বেড়ে চলল মানুষের ভিড়। শান্তিবাবুরা যখন এদেশে এসেছিলেন তখন অব্দি সরকারি সাহায্য তেমন কিছু ছিল না। তখন কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী লোকেরা ভলান্টিয়ারী সার্ভিস দিতেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। যাদের অধিকাংশই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমবেশি উদ্বুদ্ধ ছিলেন বা তাদের পরিবারের কেউ কেউ হয়তো জড়িত ছিলেন। তারা এই ভূমিহারা স্বজনহারা মানুষদের পাশে দাঁড়ানোটাকে পবিত্র অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতের সাথে যুক্ত হওয়া ত্রিপুরা সম্বন্ধে নেহেরু সরকার ছিল প্রচন্ড উদাসীন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে উদ্বাস্তুদের অস্বাভাবিক ভিড় বাড়তে লাগল। এদিকে ভলান্টিয়ার্সদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় আন্তরিক সাহায্য পেলেও সরকারের উদাসীনতায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি হল। হঠাৎ একদিন সেই ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে চারিদিকে বিস্ফোরিত হয়ে গর্জে উঠল।

এবার কাজ হল। ত্রিপুরা সরকারের কর্তাগণ দিল্লির সাথে যোগাযোগ করে পজিটিভ নির্দেশ পেলেন। কিন্তু তাও যৎসামান্যই। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের সাথে তুলনা করলে এই সাহায্য নেহাৎই ভিক্ষার মতো। পাঞ্জাবে যে সুবিধা উদ্বাস্তুরা পেয়েছে সে সুবিধা এখানকার উদ্বাস্তুরা পায়নি। পাঞ্জাবীরা মাইগ্রেশান করে এপাড়ে ওপাড়ে জমি হস্তান্তরের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু বাঙ্গালীদের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই হল না। নেহেরু সরকার বাঙ্গালীদের সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণ করলেন। তবু উদ্বাস্তুরা যাই পেলেন খুশি মনেই তা গ্রহণ করলেন। যে কাঙালীপনা তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল তা সামান্য সাহায্য পেয়েই প্রশমিত হয়ে গেল। এবার কংগ্রেস দলের কর্মীরা বুক আরও চওড়া করে এগিয়ে আসতে পারলেন। যদিও এদের অধিকাংশই এতোদিন সম্মিলিত উদ্যোগে প্রশংসনীয় কাজটি আন্তরিকভাবেই করে গেছেন।

সরকারি সাহায্য পাওয়ায় জমির পাক্কা বন্দোবস্ত হয়ে গেল। মানুষ নিজের চাষাবাদ যোগ্য জমি তৈরি করার কাজে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শান্তি বাবুদের গ্রামের চারপাশে এখন অনেক বাড়ি ঘর হয়ে গেছে। একদিকে জেলে দাস ও হেলে দাসদের, অন্যদিকে ঘোষদের পাড়া দেখতে দেখতে ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে পড়ল। শিমুলতলায় নতুন করে ছোট্ট একটি বাজার বসে গেল। দুয়েকটা

মুড়ির টিন গাড়ি রাস্তায় ছুটতে শুরু করল। যদিও যোগাযোগের প্রধান পথ ছিল নদী। নৌকা দিয়ে প্রতিদিন শত শত মন পাট, তিল, তিসি, চাল নদীপথেই জ্যোতিবাবু, জগন্নাথ সাহা ও তেওয়ারীরা পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে অন্যত্র চালান করে দেন। পার্বত্য ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগও ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে। ফলে পার্বত্য ত্রিপুরায় রাস্তার সংযোগ স্থাপন করার কোন প্রয়োজন কেউ প্রথমে উপলব্ধি করেননি। কিন্তু উদ্বাস্তুরা নিজেদের প্রয়োজন মতো রাস্তা বানাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বন্ধ্যা মাটি মানুষের স্পর্শে সাড়া দিল।

চৌধুরী বাড়ির মহিম চৌধুরী ষাটোর্ধ্ব মানুষ, ভর দুপুরবেলা চলে এলেন শান্তিবাবুর বাড়ি। সাফ সুতরো মানুষ, গালে বাসি দাড়ি নেই, পরিধেয় ধুতিও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। ওরা এসেছেন শান্তিবাবুর অল্পদিন পর। কিন্তু এই আত্মভোলা উদাসীন লোকটার সাথে তেমন কথা হয়ে ওঠেনি। মহিম চৌধুরী অকৃতদার, তার দুই ভাইপো ও পাঁচ ভাইঝি নিয়ে বিরাট সংসার। কিন্তু মহিমবাবুর সেদিকে কোন নজর নেই। তিনি তার মতোই আছেন। সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে বিশেষ একটা খেয়াল করেন না। অথচ ভাইবোনদের মধ্যে বড় দুই ভাইপো রাণু ও শানু সারাদিন খেটে খেটে নাজেহাল। সামনে যা পাচ্ছে তাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে ওরা।

মহিমবাবু শান্তিবাবুর বাড়ির কাছে এসে চারিদিকে ঘুরঘুর করে কিছু খুঁজছিলেন। তারপর পূর্বদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন দীর্ঘ সময়। শান্তিবাবু এগিয়ে এসে ডাকলেন তাকে। মহিমবাবু একটু সময় নিরুত্তর থেকে সোজা তাকালেন শান্তিবাবুর দিকে। তার চাহনিতে কোন ঔদ্ধত্য নেই, স্নিগ্ধ সরল চাহনি। তার আগোছালো চলাফেরা কৌতূহলের জন্ম দেয়। শান্তিবাবু আবারও মার্জিত স্বরে ডাকলেন, 'আসুন, আপনি ভেতরে আসুন।' মহিমবাবু সামান্য ইতস্তত করে বারান্দায় বাঁশের মাচানে এসে বসলেন। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'এই পাহাড়টা হাজার হাজার বছরের পুরানো, এর অনেক ইতিহাস আছে। আচ্ছা মাস্টারমশাই আপনি কি বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন সম্বন্ধে পড়েছেন?'

শান্তিবাবু একটু অবাক হলেন। এই দুপুরবেলা উনি ইতিহাস নিয়ে ভাবতে পথে বেরিয়েছেন? তার আচরণ অপ্রকৃতস্থের মতোই কিন্তু এতোদিন বিশ্বাস হতো না। কিন্তু আজ প্রকৃত সত্যটা তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। তার ভাবনার মাঝপথেই আবার উত্তেজিত হয়ে মহিমবাবু বললেন, 'বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি যখন বাংলা আক্রমণ করেছিল তখন লক্ষ্মণ সেন তার রাজত্বের উত্তর পূর্বদিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন?'

মহিমবাবু এতো রেগে কথাটা বললেন যেন লক্ষ্মণ সেন পলায়নের পেছনে শান্তিবাবুর কোন অপরাধ আছে। মহিমবাবু একটু থেমে আবার বললেন, 'বৃদ্ধ রাজা অন্য কোথাও তো চলে যেতে পারতেন, কিন্তু গেলেন না কেন?'

শান্তিবাবু হেসে সবিনয়ে বললেন, 'মাপ করবেন। আমি লক্ষণ সেন সম্বন্ধে পড়েছি বটে তবে তেমন বিশেষ কিছু জানি না। আপনি নিশ্চই জানেন, আমাকে বলুন।'

'এখানে জানার তেমন কিছু নেই। আপনি একটু ভাবুন, বলুন তো মশাই উপরের এই যে টিলাটা তার নাম কি? গারদটিলা – ঠিক তো? এই জায়গায় গারদ বানানোর প্রয়োজন কার হল? তার পাশের গ্রামের নাম হাড়েরখোলাই বা কেন হল? কিসের হাড় দেখে এই নামটি দেওয়া হয়েছিল?' শান্তিবাবু এবার আরও অবাক হলেন, লক্ষণ সেনের সাথে গারদটিলার কি সম্পর্ক? লোকটা কি বলছেন এসব? তবে এ ব্যাপারে কিছু না বলে আবারও বললেন, 'আপনিই বলুন, সত্যিই আমি জানি না।'

মহিম চৌধুরী গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর শান্ত সুরে বললেন, 'লক্ষণ সেনের বংশধরদের একটা ছোট অংশ এদিকেই কোথাও পালিয়ে এসে কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন। তাদের কেউ কেউ এখনও এই পাহাড়েই লুকিয়ে আছে। আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।'

'বলেন কি? এমন তথ্য আমি তো অন্য কারও কাছে শুনিনি।'

মহিমবাবু তার কথার গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'আমি তাই খুঁজছি দিনরাত। মানচিত্রে আমি তার হদিশ পেয়ে গেছি। ওরা পালাবে কোথায়? আমি ওদের পিছনে নির্মমভাবে ধাওয়া করেছি, ওরা ধরা পড়বেই। আর কয়েকদিন খুঁজব তারপর সেন বংশের অস্থায়ী রাজধানীর চিহ্ন আমি নিশ্চিত পেয়ে যাব।'

এমন সময় তরুবালা রান্নাঘর থেকে হাঁকলেন, 'কই গো খেতে এসো।'

শান্তিবাবু মহিমবাবুর হাত ধরে বললেন, 'আসুন আপনিও আমার সাথে মধ্যাহ্নভোজনটা সেরে নেবেন।'

মহিমবাবু একটু সময় চুপ করে রইলেন। তারপর নিচু স্বরে বললেন, 'আপনি ডেকে নিলে আমার খেতে আপত্তি নেই।'

কাঠের পিঁড়ি বিছিয়ে দুজনেই খেতে বসলেন। তরুবালা ভাতের থালা এগিয়ে দিতেই মহিম চৌধুরী থালাটা প্রায় টেনে নিয়ে গেলেন তার কাছে। তারপর চেহারার ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগলেন। শান্তিবাবু ও তরুবালা দুজনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। নিমেষে সবটা খাবার যেন গিলে নিতে চাইছেন মহিমবাবু। তার পাগলের মতো খাওয়ার তাড়া দেখে মনে হল যেন কত যুগ ধরে তিনি খেতে পাননি। তার ক্ষুধার্ত চেহারা যে উদাসীনতা ও নিস্পৃহতার চাদরে ঢাকা থাকে ক্ষুধাকে ভুলে থাকার জন্যেই তা বুঝতে পারলেন শান্তিবাবু। পেট পুরে খেয়ে মহিমবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হাত মুখ ধুয়ে দ্রুত ঘর থেকে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে গেলেন।

লোকটা অপ্রকৃতস্থ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না শান্তিবাবুর। উদ্ভট সব ব্যাপার তার মাথায় সারাদিন ঘুরছে। কিন্তু লোকটা যে সাংঘাতিক ক্ষুধার্ত

ছিলেন এটাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। তার স্নিগ্ধ সরল চেহারা, পবিত্র শুভ্র বর্ণ, পন্ডিতসুলভ আচরণ, সংসার বিমুখতা মানুষকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু খিদের তাড়নায় তিনি আর আজ নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। হয়তো নিজে চেয়ে কারো বাড়িতে খাওয়া মোটেই শোভনীয় নয়। তাই মুখে কিছুই বলতে পারছিলেন না। তার পারিবারিক মর্যাদাবোধ কিছু চেয়ে খাওয়াতেও বাধা দিচ্ছিল।

এলাকার সবকটি পরিবারই ছিন্নমূল। কার বাড়িতে খাবার জুটতো, কার বাড়িতে দীর্ঘ উপবাস, কেউ বুঝতে পারতো না। সবার মুখেই একটা মিথ্যে সুখের হাসি লেগে থাকতো। কেউ কাউকে বুঝতেই দিত না তার দিনটা কি করে কাটছে। মহিমবাবুদের মতো অনেক মানুষ আছেন যাদের কোনদিন কিছু করে খাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাদের অবস্থাটা হল আরও সঙ্কটজনক। দেশের বাড়িতে তারা মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, প্রাচুর্য্য তো ছিলই। কিন্তু এদেশে এসে আর কোন কিছুতেই নিজেকে কাজে লাগাতে পারলেন না। অন্যের গলগ্রহ বা বোঝা হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

প্রায় প্রতিটি সকালবেলা দু-চারটে থালা বাটি তরুবালার হাতে গ্রামের মানুষ দিয়ে যেতেন। প্রত্যেকেই গরু অথবা ছাগলের জন্য ভাতের ফেন চাইতেন। তারা যে মোটেই তাদের পশুর খাদ্য হিসেবে ফেন নিতেন না, নিজেদের তীব্র খিদের জ্বালা সইতে না পেরে ভাতের ফেনটুকু চেয়ে নিতেন, সেটা বুঝতে তরুবালার অসুবিধে হত না। শান্তিবাবুর অবস্থাও তেমন ভাল নয়। তবু এখানে নতুন যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন তাদের চাইতে অনেক ভাল আছেন শান্তিবাবু। তরুবালা বাড়ি থেকে বের হোন না। তবু বাড়িতে বসেই এলাকার অবস্থা টের পেতেন তিনি। চৌধুরীবাড়ির কুসুম প্রায় সারাদিন তরুবালার পাশে পাশেই থাকে। স্কুলে রঘুদের সাথে একসাথে যায়, আবার স্কুল থেকে ফিরে এসেই রঘুর মার চারপাশে ঘুরঘুর করে। মাঝে মাঝে রাণুবাবু ওকে ডেকে নিয়ে না গেলে প্রায় সারাদিন রঘুদের বাড়িতেই কুসুম থেকে যায়। ছোট্ট কুসুম একদিন পিত্তজল বমি করতে দেখে তরুবালার মায়া হল। 'কি রে কুসুম আজ সকালে তোদের রান্না হয়নি?'

ম্লান হেসে কুসুম বলল, 'হয়েছে পিসিমা।'

তরুবালা ওর মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললেন, 'রান্না হলে দুটো খেয়ে বেরুতে পারিস না। সারাদিন খেলা খেলা করে নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলে চলবে? নে আয় আমার রান্না করা আছে একটু খেয়ে নে।'

কুসুম চট্ জলদি বলল, 'না না পিসিমা আমি খেয়ে এসেছি, খাব না।'

ছোট্ট মেয়ের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে তরুবালা অবাক হলেন। হবে নাই বা কেন? কত বড় ঘরের মেয়ে কুসুম। দেওয়ান বাড়ি বলে দেশে তাদের বাড়ির পরিচিতি ছিল। অথচ আজ প্রায় নিঃস্ব সর্বহারা। শুধু অতীতের গৌরব স্মৃতি শরীরে ও মনে বহন করে চৌধুরী পরিবার প্রাণপণ লড়াই করছে টিকে থাকার জন্য।

চারিদিকে শুধু অভাব আর অভাব। ক্লান্ত অবসন্ন চেহারার মানুষগুলির রক্তজল করা লড়াই কেউ মনে রাখবে কিনা জানা নেই। তবু এই মহাকাব্যিক লড়াইটা মানুষের মনে ইতিহাস হয়ে থাকবে। একটা ছিন্নমূল জাতিগোষ্ঠি প্রতিবেশীর বিষাক্ত তীর বুকে বয়ে অবাঞ্ছিতের মতো এদেশে এসেছে। দেশের চোখে অবাঞ্ছিত সর্বহারা কিছু মানুষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই করে সেদিন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কতো ইতিহাস হারিয়ে গেছে অনাদরে পৃথিবীর বুক থেকে বারবার, এই লড়াইও পরবর্তী প্রজন্ম ভুলে যাবে একদিন। উদ্বাস্তুরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে খসে পড়লেও এই অরণ্যে তাদের কারও অর্থনৈতিক ভাবে শ্রেণিগত বৈষম্য রইল না। তবু সমাজের আদব কায়দার ইতর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সমাজের উঁচুস্তরের লোকেরা গরিবদের আগের মতোই সম্বোধন করতেন। নীচুস্তরের লোকেরা উঁচুদরের লোকদের উপযুক্ত সম্মান দিয়েই কথা বলতেন।

এবার তরুবালা কুসুমকে টেনে কোলে তুলে নিলেন। 'এই পাকা বুড়ি, তুই যদি খেয়েই আসিস তাহলে পিত্তজল বমি করছিস কেন রে?'

কুসুমের দুচোখ ভরে জল চলে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কুসুম। তরুবালা পরম স্নেহে ভাত নিজের হাতে তুলে দিলেন কুসুমের মুখে। কুসুম পরম তৃপ্তি নিয়ে খেল। বাচ্চা মেয়েটার এতো ধৈর্য্য দেখে বিস্মিত হলেন তরুবালা। রঘু যদি এমন দু-তিন বেলা খাবার না পেত তাহলে বাড়ি মাথায় তুলে ছাড়তো। অথচ কুসুম মেয়ে বলেই কিনা জানি না, ঈশ্বর যেন সর্বংসহা করে পাঠিয়েছেন তাকে। কুসুম কিছু বলতে চাইলে তরুবালা ওকে থামিয়ে দিলেন, 'না কুসুম বাড়ির কথা অন্যকে বলতে নেই। তোরা কত বড় বংশের মানুষ আমি জানি। ঘটনার ফেরে তোর বাবা কাকারা বিপদে পড়ে গেছে সাময়িক। কিন্তু এই দুঃসময় তোরা কাটিয়ে উঠবি অচিরেই।' কুসুম তাও বলতে লাগল, 'বাবা আর কাকা প্রতিদিন অনেক রাতে ফেরে তখন আমাদের রান্না হয়। দিনের বেলা কাঁঠালের বিচি পুড়িয়ে, থোর সেদ্ধ করে লবণ দিয়ে আমরা খাই। আমি একদম খেতে পারি না পিসিমা।'

'তোর ওসব খেতে হবে না কুসুম। এটাও তো তোর বাড়ি, তুই সবসময় এই বাড়িতেই খাবি। আজ থেকে তুই রঘুর সাথে পড়াশোনা করবি এই বাড়িতে, খাবিও এই বাড়িতে।'

পরদিন সকালে একটা চটের বস্তা ও বইপত্তর নিয়ে কুসুম চলে এল রঘুদের বাড়ি। রঘু ও কুসুম পাশাপাশি বসে পড়ছে। শান্তিবাবু গরুগুলিকে খোলা জায়গায় ছেড়ে দিয়ে তাদের পড়াতে বসে গেলেন। দুজনে মিলে একসাথে পড়াশোনা করায় রঘুর একঘেয়েমিটা দূর হল। কিন্তু রঘু বরাবরই চঞ্চল, কুসুম ধীর স্থির। রঘু সারাদিন কুসুমের পেছনে লেগেই আছে। সারাদিন বিচার করতে করতে তরুবালার অবস্থা কাহিল। তরুবালা যদি কুসুমের পক্ষ নেন তাতেও বিপদ। রঘু কুসুমকে খোঁটা দিয়ে বলে, 'এটা তো আমার বাড়ি, আমার মা, তুই আসিস কেন? তুই যা তোদের বাড়ি।' মাঝে মাঝে কুসুম রাগ করে চলে যেত বটে। কিন্তু রঘুই আবার ডেকে

নিয়ে আসতো মার নির্দেশে। স্বভাবত কুসুম চুপচাপ থাকলেও সবকিছুই যে সে নীরবে সইতো তা কিন্তু নয়।

এভাবেই দিন কাটছিল উদ্বাস্তুদের। একদিন চানমণি দেব শান্তিবাবুর কাছে স্কুলে যাওয়ার ঠিক আগে এসে বললেন, 'পন্ডিতমশাই জীবনটায় ঘেন্না ধরে গেছে আর ভাল্লাগছে না।'

শান্তিবাবু হেসে বললেন, 'কেন? এতো বিরক্ত কেন চানমণিদা?'

'ধুর মশাই এটা একটা জায়গা হল? এইভাবে বাঁচা যায়? এতোদিন পেটে গামছা বেঁধে পড়ে থাকতাম খিদের জ্বালায়। এখন দুটো খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে বটে কিন্তু মনে যে শান্তি আসছে না পন্ডিতমশাই।'

শান্তিবাবু হেসে বললেন, 'অধৈর্য্য হচ্ছেন কেন চানমণিদা? একটা পর্যায় আমরা অতিক্রম করেছি। অন্নের ব্যবস্থা যখন হয়ে গেছে বাকিটাও হবে।'

'একটা কিছু করেন পন্ডিতমশাই মন যেন একটু শান্তি পায়।'

'ঠিক বলেছেন চানমণিদা, আসুন সার্বজনীন কালিপুজোর আয়োজন করি সামনের অমাবস্যায়।'

'আপনি আমার মুখের কথাটাই কেড়ে নিলেন পন্ডিতমশাই। একটা পুজো পার্বন না হলে যে মনের দুঃখ আর যায় না।'

'তাহলে একটা মিটিং ডাকুন, তিনদিন ব্যাপী কালিপুজো হবে সামনের এই মাঠে। অধিবেশন, পুজো ও বিসর্জন মিলিয়ে তিনদিন ধরে অনুষ্ঠানও থাকবে। প্রথম দিন পুরুষদের যাত্রাগান, দ্বিতীয় দিন মেয়েদের কীর্তন ও ধামাইল আর শেষ দিন শ্রীমঙ্গলের ঢপ্ যাত্রা। তবে তিনদিনই কাঙাল ভোজনের ব্যবস্থাও থাকবে।'

'কিন্তু অনেক পয়সা যে লাগবে পন্ডিতমশাই?'

'আপনি আয়োজন করুন দেখবেন সব হয়ে যাবে। গ্রামে প্রতিটি পরিবার সাহায্য করবে। সবার সাহায্য পেলে ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন।'

কালিপুজোর তিনটে দিন উদ্বাস্তুদের জীবনকে নাড়িয়ে দিল। কলাবাগানের প্রতিটি মানুষ এতো আনন্দ আর কোনদিন পায়নি। দুঃখের সাগরে সবাই নিমজ্জিত ছিল বলেই হয়তো এই আনন্দে সবাই পাগল হয়ে গেল। উদ্বাস্তুদের যেন বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা দিল। এই তিন দিন গ্রামের কোন বাড়িতে উনুন ধরেনি। ছেলে বুড়ো মেয়েরা দিনরাত পড়ে রইলেন পুজো মন্ডপে।

তাঁবু টাঙিয়ে, খড় বিছিয়ে পুজোর মন্ডপ ও বসার জায়গা তৈরি হল। চাল, ডাল, সবজি বাড়ি বাড়ি থেকে চলে এল। বাড়ির মেয়েরা সবাই রান্নার কাজে নেমে পড়ল। পুরুষরা সারাদিন ব্যস্ত হয়ে রইলেন যাত্রাগানের শেষ তুলির টান দিতে মহড়ায়। তিনদিন ব্যাপী অনাবিল আনন্দে ডুবে গেলেন সবাই। শেষদিন ঢপ যাত্রার শিল্পীরা শ্রীমঙ্গল থেকে এসে নামতেই পার্শ্ববর্তী সাত গ্রামের মানুষের পাহাড় যেন ভেঙে পড়ল কলাবাগানে। সকাল থেকেই মানুষ নিজের আসন দখল রাখতে ঠায় বসে রইল। এক অনাবিল আনন্দে ভেসে গেল সবাই। তিনদিন পর

যখন আসর ভাঙল তখন সব মানুষের চোখে জল। এই দিনটা চলে যাক কেউ যেন মেনে নিতে পারছে না। তাই সমাপ্তি দিনের পরেও অতিরিক্ত একদিন গীতা পাঠের আসর বসাতে হল দুঃখ ভুলতে। তবে এই পরম্পরা জারি ছিল বহু বছর।

উদ্বাস্তুদের মরনপণ লড়াইকে আরও কঠোর করে দিল নানাহ প্রতিকূলতা। তারমধ্যে অন্যতম হল বাঘের উপদ্রব। দেশ বিভাগে উদ্বাস্তুদের যা ক্ষতি হয়েছে তার চাইতে বেশি ক্ষতি হয়েছে বাঘ, হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের। তাদের নিরুপদ্রব আবাসস্থল ধীরে ধীরে অন্যের দখলে চলে যেতে লাগল। চলতে ফিরতে সারাদিন উদ্বাস্তুদের আশেপাশে বাঘের দেখা মিলতো। ফলে মাঝে মাঝেই হত সংঘাত। সেই সংঘাতে কখনো বাঘ মরেছে জিতেছে মানুষ অথবা কখনো মানুষ মরেছে জিতেছে বাঘ। যদিও এই হার জিত একটা সাময়িক হিসেব মাত্র। কিন্তু এই লড়াই শেষে বাঘ আর ফিরে আসেনি কোনদিন, হয়তো আর আসবেও না। নির্মূল হয়ে গেছে চিরতরে ত্রিপুরার মাটি থেকে।

নন্দিনী ও ঘনার মৃত্যুর পর যে দুঃখের ছায়া চারিদিকে নেমে এল তা আজও কাটেনি। ঘনার মার এই বুকফাটা আর্তনাদ সহৃদয় মানুষ মাত্রেই নাড়া দিয়ে যায়। শান্তিবাবুর বুকের মধ্যে এই আর্ত কান্না যেন হিম্ হয়ে আজীবন বসে গেল। কিন্তু তারপরই ঘটে গেল আরও একটা দুর্ঘটনা। জলধর দাসের মেয়ে মালতী তাদের ছাগলটাকে খুঁজতে জঙ্গালে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। কিছু লোক দূর থেকে দেখতে পেল বিশাল এক থাবায় মালতীকে ধরাশায়ী করে ওকে মুখে নিয়ে পালিয়ে গেল একটি বাঘ। যারা দেখেছে তারা এতো আতংকিত হল সারা গ্রামে চেঁচিয়ে সবাইকে খবর দিল। মালতীর মা বাবা ততোটা ভাগ্যবান নন, মালতীর দেহাবশেষ ওরা কোথাও খুঁজে পায়নি।

বাঘ যেন সেই দিনগুলিতে উদ্বাস্তু জীবনে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করতে লাগল। একদিন সকালবেলা বলাই ঘোষের বাড়ি থেকে চিৎকার ভেসে এল। সাথে সাথে চারিদিকে টিনের থালা, ঘটি, বাটি, ড্রাম বাজিয়ে চিৎকার শুরু হল। বুঝতে কারোর অসুবিধা হল না নির্ঘাৎ বাঘ এসেছে। কিন্তু সাধারণত রাতের বেলা বাঘের আহট পেলে সবাই যে যার হাতের কাছে যা পান তা বাজিয়ে বাঘ তাড়ানোর চেষ্টা করেন। কেউ কেউ আগুনের লুক্কা জ্বেলে আকাশে ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু সকালবেলা অনুরূপ শব্দ পেয়ে শান্তিবাবু চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। বিপদের গন্ধ পেয়ে গোপাল দত্ত, চানমণি দেব, রাণু চৌধুরী এমন অনেকে যে যার বাড়ি থেকে লাঠি সোটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। সবাই একজোট হয়ে দ্রুত ঘোষদের ঘরে গিয়ে এক অভাবনীয় ঘটনা দেখতে পেলেন।

বলাইবাবুর ছয়টি গরু বাঁশের বেড়া দেওয়া গোয়াল ঘরে বাঁধা ছিল। সাধারণ একটা বাঁশের বেন্দা দিয়ে সেই ঘরের দরজা আটকানো থাকে। ঐ ঘরেই রাতে ঢুকে যায় একটা বাঘ। দুটি বাছুরের একটাকে মেরে অনেকটা খেয়ে ফেলে

বাঘটি। কিন্তু খেয়ে আর ফিরে যায়নি সে সেই গোয়াল ঘরেই ঘুমিয়ে থাকে। এদিকে বলাইবাবু দিনের আলো ফুটতেই গরু বের করতে এসে দরজা খুলতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। প্রাথমিকভাবে বলাই ঘোষ আহত হলেও তারপরই তিনি জাপটে ধরেন বাঘকে। তার একটা হাত বাঘের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে ধরেন বাঘের জিভ। অন্য হাতে চেপে ধরেন বাঘের ঘাড় ও মাথাটা। এভাবে বাঘে মানুষে এক ভয়ঙ্কর লড়াই চলতে থাকে। বলাইবাবু তার স্ত্রী ও ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আসতে নিষেধ করেন ।

শান্তিবাবু প্রথমে এই দৃশ্য দেখে, মানুষের অবিরাম চিৎকার চেঁচামেচি শুনে একটু সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অবশেষে সম্বিত ফিরতেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাঘের উপর। দা, লাঠি, গদা দিয়ে মুহুর্মুহু আঘাত হেনে বাঘকে নিস্তেজ করে দিলেন। গোপাল দত্ত এতো বেপরোয়া হয়ে বাঘকে মারতে লাগলেন, তাকে সামলানোই যাচ্ছিল না। শান্তিবাবু ও চানমণিবাবু ওকে টেনে ধরে বিরত করলেন, বোঝালেন। এদিকে আরও ছেলে ছোকড়ারা এসে জুটেছে। সবাই মিলে বাঘকে বেঁধে বাইরে আনা হল। তারপর বলাইবাবুকেও বাইরে এনে তার চিকিৎসা শুরু হল। তিনি তখনও জ্ঞান হারাননি। এতো রক্তপাত, এতো আঘাত সহ্য করেও হেসে বললেন, 'বাঘটাকে প্রাণে মারবেন না। যদি সে বেঁচে থাকে তাকে ছেড়ে দিন।'

যদিও বাঘের অবস্থা তখন প্রায় যায় যায়। প্রবল আগ্রহে যারা বাঘটাকে দেখছিল তারাই বাঘটা একটু নড়ে উঠলেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে পালাচ্ছিল, আবার ফিরে আসছিল। দিনভর মানুষের ভিড় সামলানো মুশকিল হয়ে গেল ঘোষ বাড়িতে। তবে বলাইবাবুর একটা হাত প্রায় নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। সেদিন থেকে বলাইবাবুর নাম হয়ে গেল বাঘাবলাই।

এদিকে নবগ্রামে একদিন হাজির হলেন বন দপ্তরের একজন রেঞ্জার। পন্ডিত খবর পেয়ে আর দেরি করেনি। সোজা সদর থানা থেকে দুনলা বন্দুক সহ ধরে নিয়ে এল রেঞ্জারসাহেবকে তার নিজের বাড়িতে। বাড়িতে লোকজন নেই, পন্ডিতের স্ত্রী মনসার পুঁথি পড়তে পাশের বাড়িতে গেছে। ঐ বাড়ি থেকে মনসা মঙ্গলের গান ভেসে আসছে। পন্ডিত নিজের হাতেই পেট পুরে খাওয়াল সাহেবকে। সাহেব খুশি হলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর অনেক রাত অব্দি ঐ বাঘটার গতিবিধি ও আচরণ নিয়ে কথা হল। ম্যান্-ইটার বাঘটাকে মারার জন্য তিনি কৌশল স্থির করলেন। পেন্সিল দিয়ে এঁকে তার কৌশলগুলি এক দুই তিন করে পন্ডিতকে বুঝিয়ে দিলেন। পন্ডিত সবকিছু বুঝে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, 'স্যার আমি কিন্তু আপনার সাথে থাকব বাঘ শিকারে।'

রেঞ্জারসাহেব সবিনয়ে বললেন, 'আপনি বয়স্ক মানুষ। তাছাড়া শারীরিক ভাবেও দুর্বল, সম্ভবত হাঁপানির দোষও আছে। আপনি কেন এসব ঝুঁকি নিতে যাবেন? আপনি বরং একজন সাহসী যুবককে ঠিক করে দিন আমি সঙ্গে নিয়ে

যাব।' পন্ডিত রেঞ্জারের কথা শুনে প্রচন্ড আহত হল। 'আপনি আমাকে বয়স্ক লোক বললেন স্যার। আমার মতো একজন সাহসী যুবক আপনি এই তল্লাটে পাবেন?'

ভিমড়ি খেয়েও রেঞ্জারসাহেব সামলে নিলেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন পঞ্চাশোর্ধ বেঁটেখাটো, ফাঁকা তালু, উস্কখুস্কু পাতলা চুলের গেঁজেল লোকটা নিজেকে যুবক বলছে! কিন্তু তার অতিথি আপ্যায়ন দেখে তিনি নিজেকে সংবরণ করলেন। তাড়াতাড়ি আপনি থেকে তুমিতে লাফিয়ে চলে এলেন সাহেব।

'না না তোমাকে তো যেতেই হবে, তুমি ছাড়া এত বড় কাজটা আমি একা করতে পারব না। তবু বলছিলাম একজন যুবক ছেলে থাকলে সুবিধে হতো। মালটাল বয়ে নিয়ে যেতে পারতো।'

'পাবেন না।' দীর্ঘ সময় থেমে থেকে পন্ডিত আবার বলল, 'পাবেন না স্যার। এই পন্ডিত ছাড়া দাদাগিরি দেখাবার মতো একটা লোকও এই এলাকায় পাবেন না। সব শালাদের শরীর মোটা, জানটা ছোট, এই পিঁপড়ের ডিমের মতো।'

পন্ডিতের স্ত্রী এসে ঘরের এক কোণে দাঁড়ালেন। ছোট ছেলেমেয়ে দুটো শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে রেঞ্জারকে দেখছিল। পন্ডিতকে শাসনের সুরে সাহেব বললেন, 'কিন্তু পন্ডিত ঐ দিন কিন্তু সারাদিন তুমি সুস্থ থাকবে। ওসব চলবে না।'

পন্ডিতের স্ত্রী যিনি এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিলেন তিনি বললেন, 'আপনাদের ঐ বুড়ো ছাগলটা কি কাজে লাগবে বাবু?'

'এটাকে টোপ হিসেবে বেঁধে রাখব। বাঘ যখনি ওকে খেতে আসবে-'

কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিলেন তিনি, 'তা এই অবুঝ প্রাণীটাকে চারা করছেন কেন? এই বিট্কেলে পন্ডিতকে ছাগলের জায়গায় জুড়ে দিন না, দেখবেন ভাল কাজ হবে।'

রেঞ্জারসাহেবের তখন বুক ফেটে হাসি উঠল। কিন্তু পন্ডিত তখনও নির্বিকার, একটা বড় হেঁচকি তুলে সে হেসে বলল, 'স্যার আমার ইস্ত্রী রণরঙ্গীনি দিব। একাই সামলায় পরিবারের সব কিছু, তবে আদব কায়দা একদম জানে না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'এই আর ভালমানুষ সাজতে হবে না। প্রতিদিন বাড়িতে লোক ধরে নিয়ে এসো। শালা বুড়ো মিন্‌সে রাতে বাচ্চা দুটি কি খাবে সেই চিন্তা আছে তোমার? এতো লোক মরে, কেন মরণ হয় না তোমার? আমার হাড় মাস্ সব জ্বালিয়ে খেল।'

লজ্জায় অপমানে রেঞ্জারসাহেবের অবস্থা তখন শোচনীয়। তিনি তখন হাসবেন না কাঁদবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। আক্রমণটা যে এভাবে বাঁক নিয়ে তার উপর ঘুরে আসবে তিনি বুঝতে পারেননি। পন্ডিতের স্ত্রী তখনও বলে যাচ্ছেন, 'আপনি বাবু এটাকে চারা করে দিন। আর বাঘ ওকে না খেয়ে ফেলা পর্যন্ত বাঘকে গুলি করবেন না। চারা খেয়ে শেষ করার পর গুলি ছুঁড়বেন।'

রাত পোহাতেই আর এক মুহূর্ত দেরি করলেন না সাহেব, সমস্ত সরঞ্জাম

নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তার মতো অফিসার সে সময় খুব একটা মহকুমা সদরে দেখা যেত না। কারো ঘরে তার পদার্পণ করা এক বিশাল ব্যাপার। পন্ডিত বুক ফুলিয়ে ডেকে ডেকে গাঁয়ের মানুষজন জড়ো করে গতকাল জানিয়েছিল রেঞ্জারসাহেবের আগমনবার্তা। সে সময় রেঞ্জার বেশ আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু মাঝরাতে যখন বিছানায় যাবেন তখনি তাঁর ঘুম ছুটে গেল। পন্ডিতের কোন সম্মান যে তার বাড়ির লোকের কাছে নেই সেটা বুঝতে সাহেবের যথেষ্ট বেগ পেতে হল না।

ছোট্ট একটা চায়ের দোকান আছে রামুর। রাস্তার পাশে হওয়ায় অনেক মানুষ এখানে খানিক বিশ্রাম করে সামনে এগিয়ে যায়। রেঞ্জার সেখানেই চা খেয়ে নিলেন। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থাও এই দোকানেই হয়ে গেল। দুজন বিহারি শ্রমিককে নিয়ে তিনি জঙ্গালে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে অতি অবশ্যই পন্ডিতও ছিল। সারাদিন ঘুরে মোটামুটি বাঘের গতিবিধি নিয়ে একটা ধারনা তৈরি হল তাঁর। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরাও বাঘের সঠিক আকারটা কি রকম হতে পারে কেউ বলতে পারল না। সবাই একবাক্যে একটাই কথা বলল 'বিশাল বড় বাঘ'। কিন্তু বিশালটা কতো বিশাল কেউ বলতে পারল না।

রেঞ্জারসাহেব বেশ উঁচুতে দুটো মাচান বাঁধার ব্যবস্থা করে দুপুরের খাবার খেতে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে যে সকল যুবকদের সাথে কথা হল সবাইকেই একে একে তার সঙ্গী হওয়ার জন্য আমন্ত্রন জানালেন। কিন্তু কেউ রাজি হওয়া তো দূরের কথা উল্টে ভয়ে পালিয়ে গেল। স্থানীয়রা অনেকেই এই বাঘটাকে 'কালোপাহাড়' নামে ডাকতেন। কেউ কেউ কালোপাহাড়কে অসীম শক্তিধর দেবতার অংশ মানতেন এবং নিয়ম করে পূজা আচ্চা দিতেন। কালোপাহাড়কে কেউ মেরে ফেলতে পারে অনেকেই সেটা বিশ্বাস করতেই পারতেন না।

দিন শেষের রোদ মরে যেতেই পন্ডিত পুরো তৈরি হয়ে চলে এল। কিন্তু তার অবস্থা দেখে রেঞ্জার ঘাবড়ে গেলেন। লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। বিরক্ত হয়ে সাহেব বললেন, 'এই পন্ডিত তুমি থাকো। আমার সাথে তোমার যেতে হবে না। এই যে, আপনারা ওকে আটকান আমার সঙ্গে যেন না আসে।'

দুই একজন বাধা দিয়ে বললেন, 'স্যার ওকে নিয়ে যান, ওসব খেলেও তার আজ্ঞে কোনও অসুবিধা হয় না। তাছাড়া সে অনেক তুকতাক জানে। বিপদের সময় ঠিক কাজে লেগে যায়।'

'না না দয়া করে ওকে পাঠাবেন না। আমি ওখানে রঙ্গা করতে যাচ্ছি না। অমন ভয়ানক জানোয়ারের সামনে যাওয়ার আগে যে কোন মানুষের মনের অবস্থাটা কি হয় নিশ্চয় আপনারা বুঝবেন। ওকে এখানে আটকে রাখুন।'

কথাটা শেষ করে পন্ডিতের দিকে বিরক্ত হয়ে একবার তাকালেন সাহেব। তারপর সোজা হাঁটতে লাগলেন গন্তব্যের দিকে। একা পন্ডিত তখন যেন হুকে ঝুলে আছে ফুলহাতা ইস্ত্রিহীন শার্টের মতো। সবাই বিরক্ত হয়ে কালোপাহাড়ের

উদ্দেশ্যে প্রণাম করে চলে গেলেন। এদিকে রেঞ্জারসাহেব দ্রুত পা চালালেন। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে আর অল্পসময় বাকি। তার আগেই নিরাপদ জায়গায় পজিশন নিতে হবে। কিন্তু রেঞ্জারসাহেব প্রথমেই একটা ভুল করে ফেললেন। যে রাস্তায় তার যাওয়ার কথা ছিল সে রাস্তাটাই ভুল করে অন্যদিকে চলে গেলেন। ফলে অনেকটা পথ হেঁটেও তিনি সেই বটগাছটা পেলেন না। তার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ভেসে উঠল। মূল রাস্তার সামান্য দূরেই ছিল বটগাছটা। অথচ তিনি কোথায় চলে এলেন! জঙ্গল সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকায় উনি বুঝতে পারলেন আর দেরি করা ঠিক হবে না। রাতের শিকারীরা বেরুনোর সময় হয়ে গেছে। বেকায়দায় পড়ে গেলে তিনি নিজেও শিকার হয়ে যেতে পারেন। রেঞ্জার দ্রুত ফেরার চেষ্টা করলেন। বনের কিছু শব্দ আছে সময় ভেদে সেগুলি সারাক্ষণ বাজতে থাকে। বড় প্রাণীদের আনাগোনা থাকলে এই শব্দের অনেক তারতম্য ঘটে। যারা অভিজ্ঞ, জঙ্গল সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান আছে, তারা এই শব্দটা পড়তে পারেন। দ্রুত হাঁটছিলেন রেঞ্জার। তখনি পেছন থেকে কেউ ডাকল, 'স্যার।' সাহেব তাকিয়ে দেখেন পন্ডিত ছাগল নিয়ে অন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি ছাগলটাই তো ফেলে চলে এলেন, কি দিয়ে শিকারকে চারা দেবেন? অবশ্য আমি থাকলেও কাজ হোত, আমাকে চারা করা যেত। তাও ফেলে এলেন। আপনি কি রকম শিকারী মশাই? শিকারের অ - আ - ক - খ পর্যন্ত জানেন না!'

সাহেব সত্যিই লজ্জিত হলেন। রাগ করে বেশ কিছু জিনিস চায়ের দোকানে ফেলে এসেছেন তিনি। পন্ডিত ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'চলুন। আমি সবকিছু নিয়ে এসেছি। আর হাঁ-করে দেখছেন কি? কালোপাহাড় আসার সময় হয়ে গেছে - আসুন আসুন।' অগত্যা সাহেব আর কিছু বললেন না। ওরা দুজন সামান্য হেঁটে ঐ বটের তলায় এসে দাঁড়ালেন। ছাগলটার মুখ বাঁধা থাকায় চিৎকার করতে পারছে না। তা এক প্রকার ভালই হল, না হয় ওর ভয়ার্ত চিৎকারে বন্যপ্রাণীরা সজাগ হয়ে যেত।

বটগাছের একটু পশ্চিমে একটা জায়গায় সকালেই জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানেই একটা খুঁটিতে ছাগলটাকে বেঁধে ফেলা হল। তারপর শিকারের প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে একে একে দুজনেই গাছে চড়ে মাচানে উঠে বসলেন। রেঞ্জার সাহেব নিজেকে মাচানের উপরের ডালে বেঁধে নিলেন। যদিও মাটি থেকে তারা অনেক উপরে তবুও হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায়। পূর্ব নির্দেশ মতো পন্ডিতও নিজেকে গাছের সাথে বেঁধে ফেলল। এবার শুরু হল প্রতীক্ষার পালা।

অন্ধকার নিবিড়ভাবে জঙ্গলের গায়ে জড়াল। ছাগলটার মুখের বাঁধন খুলে দেওয়ায় সে ভয়ে থেমে থেমে চেঁচিয়ে উঠল। তাছাড়া ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা শব্দ আর বুনো পোকা মাকড়ের শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ।

একটা পেঁচার ডাক দুর থেকে ভেসে এল। দুয়েকটা বন্য জন্তুর অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। কিন্তু যে পথে কালোপাহাড়ের আসার কথা সে পথে কোন শব্দ নেই, একদম নিশ্চুপ। কোথাও কোন আলো নেই শুধু আকাশের তারাগুলি জ্বলছে। চাঁদ হয়তো উঠবে কিন্তু দুপুর রাতের আগে চাঁদের দেখা পাওয়া যাবে না।

সাহেব পন্ডিতের দিকে তাকালেন কিন্তু সে জেগে না ঘুমিয়ে আছে বোঝা গেল না। সাহেব চাপা স্বরে ডাকলেন, 'পন্ডিত -।'

'স - স - স - একদম কথা বলবেন না স্যার। কালোপাহাড় কাছাকাছিই আছে। সে ছাগলের ডাক শুনতে পেয়েছে।' পন্ডিত ফিস্ ফিস্ করে বলল।

'তুমি কি করে বুঝলে?'

'এটাও বুঝতে পারছেন না স্যার। ওর আসার পথটা ধরে দেখুন কি চুপচাপ হয়ে আছে। তার মানে কি? সবাই বুঝে গেছে যমদুত আসছে। এখন দুষ্টুমি ছেড়ে চাচা আপনা পরাণ বাঁচা।'

'তুমি টর্চটা ঠিকঠাক ধরে রেখেছো তো?

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার।'

এবার নিশ্চিন্ত হলেন রেঞ্জারসাহেব। না পন্ডিত যতই মদো মাতাল বা গেঁজেল হোক আসল কাজে ঠিকই আছে। প্রহর গোনা আর শেষ হচ্ছে না। সময় যে এতো দীর্ঘ হতে পারে তা এই রকম মুহূর্ত ছাড়া বোঝা যায় না। গতিময় পৃথিবীটা যেন এখানে স্থির হয়ে আছে। হঠাৎ পন্ডিত নড়তেই রেঞ্জারসাহেব তাকালেন, অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে নিশ্চিত পন্ডিত কিছু একটা করছে। একটু পরেই ছিপি খুলে ঢক্ ঢক্ করে কিছু গেলার মৃদু শব্দ পাওয়া গেল। সাহেব ডাকলেন 'কি করছ তুমি পন্ডিত?'

'না স্যার তেমন কিছু না। ভয় ভয় লাগছিল তো, তাই একটু অষুধ খেয়ে নিলাম।'

চোলাই মদের কটু গন্ধ সাহেবের নাকে জোর ধাক্কা দিয়ে গেল। তার একটু পরেই পন্ডিতের হাত থেকে কাঁচের বোতল নিচে 'থপ্' করে পড়ে যাওয়ার শব্দ কানে এল। সাথে সাথে একটা জংলী ইঁদুর শোরগোল করে ছুটে পালিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য রাতের শান্তি ও নিস্তব্ধতা ভেঙে গেলেও পরক্ষণেই আবার সব নিশ্চুপ অন্ধকারে ডুবে গেল।

আরও কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকতে হল সাহেবকে। দুনলা বন্দুকটাকে আরও নিখুঁতভাবে চেপে ধরলেন বুকের কাছে। খুবই আস্তে করে পন্ডিত ডাকল, 'স্যার, সে আসছে।'

সাহেবের বুঝতে আর দেরি হল না কে আসছে। হঠাৎ একটা শেয়াল তীব্র বেগে প্রাণভয়ে ভয়ার্ত চিৎকার করে পালাল। সাহেব অনুধাবন করলেন পন্ডিত সম্ভবত ঠিকই বলছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে ছাগলটার উপর কেন্দ্রীভূত হল। ছাগলটাকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবু ছাগলের বাঁচার জন্য ছটফটানি,

দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ও ভীত ডাককে তার চোখ দুটি অনুসরণ করতে লাগল। ছাগল ও তার মাঝখানের দুরত্বটা যেন ক্রমশ মুছে গেল। তিনি ছাগলের চারপাশটা অনুভব করতে পারছিলেন। তখনি দুয়েকটা পাখি ডানা ঝাপটে দূরে চলে গেল। শুকনো ডালের মর্মর ধ্বনি ও ভারি পায়ের শব্দ অনুভূত হল। রেঞ্জার ভয় পেয়ে গেলেন। তার অনুভব বলছে এটা বিশাল বড় জানোয়ার। এতো বড় বাঘকে দুনলা বন্দুক দিয়ে মেরে ফেলা সহজ কথা নয়। বাঘ গর্‌র্‌র্‌ করে একটা গলার আওয়াজ করে ছাগলটার একটু সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছাগলটার প্রাণপণ চিৎকারে তখন চারিদিক তোলপাড়। ছাগলটা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার এদিক ওদিক লাফাচ্ছে। ঠিক তখনি টর্চের আলোটা জ্বলে উঠল।

রেঞ্জারসাহেব অবাক হয়ে দেখলেন একটা বিশাল বড় বাঘ। তার ধারনার চাইতে প্রায় দশ গুণ বড়। এই বিশাল জানোয়ারকে গুলি করা ঠিক হবে কিনা, কাজটা করা নিরাপদ হবে কিনা, দ্রুত ভাবছিলেন রেঞ্জার। যদি গুলি করে মারা না যায় আহত বাঘ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখলেন পন্ডিতের হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা বট গাছটার নিচের ডালে 'ঠকাং' করে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল নিচে। তখনও জ্বলে থাকা টর্চের আলো এসে আটকে গেল একটা ঝোপের পাতায়। আর পন্ডিত ঝুলে রইল উপরের ডালে বাঁধা দড়িতে। অবাঞ্ছিত শব্দে কালোপাহাড় যেন একটু বিরক্ত হল। সামান্য ধমক দিয়ে ছাগলটাকে নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। যাওয়ার আগে ছাগলটার 'ভ্যাঁ' করে সামান্য মৃত্যু চিৎকার কানে ভেসে এল।

বাঘটা চলে যাওয়ার পর সাহেব তাঁর পেন্সিল টর্চটা জ্বেলে দেখেন পন্ডিত তখনও ঝুলছে। এবার তার দুশ্চিন্তা হল দড়ির প্যাঁচ যদি লেগে যায় তাহলে পন্ডিতের ফাঁসও লেগে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডাকলেন, 'পন্ডিত – পন্ডিত।'

'এখন আর চুপিচুপি ডেকে কাজ নেই স্যার। কালোপাহাড় চলে গেছে।'

সাহেব অবাক হলেন, পন্ডিত এখনও জ্ঞান হারায়নি। তিনি হেসে বললেন, 'তুমি হার্ট ফেল করোনি তাহলে?'

পন্ডিত অনুনয় করে বলল, 'স্যার আমাকে একটু ধরুন মাচানে উঠব। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

এবার সাহেব একটু এগিয়ে পন্ডিতকে উপরের দিকে টেনে ওঠাতে লাগলেন। পন্ডিত চেষ্টা করে মাচানে উঠে বসল। তারপর রেঞ্জারের দিকে চেয়ে বলল, 'কেমন দেখলেন স্যার?'

রেঞ্জারসাহেব মুগ্ধ নয়নে বললেন, 'দারুণ!'

পরদিন সকালবেলা রামুর দোকানের সামনে উৎসুক এলাকাবাসীরা জড়ো হতে লাগলেন। সবাই কৌতূহল নিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকলেও সাহেব বা পন্ডিত কারো কোন দেখা পাওয়া গেল না। লোকেরা ধৈর্য হারিয়ে নানা জনে নানা কথা বলতে শুরু করল। একজন বললে, 'কালরাতে গুলির শব্দ শোনা যায়নি তো কি

করে বাঘ মরবে?'

অন্যজন বললে, 'এই রেঞ্জারের চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি কালোপাহাড়কে মারা তার কম্ম নয়। এই লিকপিকে চেহারার লোক এতো সাহস পাবে কোত্থেকে?'

আরও একজন বলল, 'সাথে আবার নিয়ে গেছে পন্ডিতকে। দেখো দুজনে গাঁজা টেনে ঘুমিয়ে আছে কিনা গাছে।' প্রথম জন জানতে চাইল, 'রেঞ্জারটা বিয়ে থা করেনি তো?'

'মনে হয় না। বাচ্চা ছেলে। গোঁফের গোছা এখনো মোটা হয়নি বিয়ে করবে কি?'

'ঠাকুর রক্ষা করেছে তার কোন পিছুটান নেই। না হয় এই কচি বয়সে বউটার কি অবস্থা হোত।'

'বউ যেহেতু নেই, বাচ্চাও বোধয় নেই।'

'আমরা কি এগুবো নেপুইদা?'

'দুটো লাশ বাঘ একদিনে খেতে পারবে না। নিশ্চয় সে আশেপাশেই ফেলে চলে যাবে। না বাবা আমার সাহসে কুলোবে না।'

তার ফাঁকেই হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরে ফিরে এলেন রেঞ্জার ও পন্ডিত। তারা ফিরতেই তাদের আপ্যায়নের ধুম পড়ে গেল। রামুর দোকানে বসে দুজনে গরম চা আর 'এস' মার্কা কুকিজ চায়ে ভিজিয়ে খেতে লাগলেন। ভিড় তখন উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে রোমাঞ্চকর ভয়ানক কিছু শোনার জন্য। কিন্তু সাহেব সবাইকে হতাশ করে বললেন, 'না। কালো পাহাড়কে আমরা মারতে পারিনি।'

ভিড় এই নীরস কথা শোনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করেনি। তাই প্রতিক্রিয়া হল মারাত্মক। পন্ডিত সবাইকে থামিয়ে দিলে সাহেব আবার বললেন, 'তবে সে মরবে। আমি আজ ফিরে যাচ্ছি, দুদিন পরে আবার আসব আরও নিখুঁতভাবে তৈরি হয়ে। এই কটা দিন আপনারা একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করবেন।'

কথাগুলি বলেই রেঞ্জারসাহেব ঘোড়ার পিঠে চড়ে সদরের দিকে চলে গেলেন। সেখানে কালেক্টরের অফিসে তার হাতিটা আছে। সেই হাতি নিয়ে তিনি ফিরে যাবেন কৈলাশহরে। এদিকে ভিড়ের মধ্যে থেকে নানা মন্তব্য ভেসে আসতে থাকল। পন্ডিত এসবের উত্তর না দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কালোপাহাড়ের বিশাল শরীর ও অপরিসীম সাহসের গল্প চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পন্ডিত কাউকে কিছু না বললেও স্ত্রীর কাছে পুরো ঘটনাটা বলল। তবে বাঘ দেখে ভয় পেয়ে সে যে মাচান থেকে পড়ে গিয়ে ডালে বাঁধা দড়িতে আধ ঘন্টা ঝুলে ছিল সেই কথাগুলি বলেনি। তবুও কথা চাপা রইল না। গৃহকোণ থেকে গৃহকোণে, তারপর সদরে ছড়িয়ে পড়ল। তবে পন্ডিত ও রেঞ্জারের বীরত্বের কাহিনি মোটেই আদর পেল না। বরং রূপকথার মতোই লোমহর্ষক বাঘের কাহিনি চারিদিকে ছড়িয়ে

পড়ল। রেঞ্জারসাহেবের দুদিন পরে ফেরার কথা ছিল, কিন্তু সাতদিন কেটে গেলেও সাহেবের কোন দেখা পাওয়া গেল না। লোকজন ধরেই নিয়েছেন এই রেঞ্জার আর এমুখো হবেন না। যে ভয় তিনি পেয়েছেন এই জীবনে তা ভুলবেন না।

এদিকে ভয় আর আতংকে মানুষের অবস্থাও ওষ্ঠাগত। জঙ্গলে কাঠ কেটে বিক্রি করা দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য একটা ভাল আয়ের পথ। তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। মানুষ জন সবাই সন্ধ্যার আগেই বাজার হাট করে বাড়ি ফিরতে লাগল। পন্ডিতকে লোকেরা আর শান্তি দিল না। প্রায় প্রতিদিন লোকজন এসে জানতে চাইতো রেঞ্জার সত্যি আসবেন কি না? একদিন থানার বড়বাবু কাশীনাথ ভট্চাযও এলেন পন্ডিতের কাছে। পন্ডিত ঘরে বসিয়ে চা খাইয়ে বলল, 'স্যার আসল শিকারীরা কখনো পালায় না। আপনি যদি ঐ বাঘ দেখতেন ওকে মারা তো দুরের কথা এই ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাতেন। কিন্তু রেঞ্জারসাহেব পালাবেন না। উনি ঠিক আসবেন।' বড়বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কিন্তু সেদিন তোমরা কাছে পেয়েও গুলি করলে না কেন? তাহলেই ল্যাটা চুকে যেত।'

'আমাদের গ্রাম বাংলায় একটা কথা আছে স্যার, বাঘ দেখছো বাঘের ভিড়িঙ্গি দেখছো না? যদি আমরা কালোপাহাড়কে মারতে পারি, তাহলে সারা কমলপুরে হাতির পিঠে চড়িয়ে ওকে ঘোরাব। তখন দেখবেন কালোপাহাড় সত্যিই কি।'

তারও দুদিন পর রামুর দোকানের সামনে রেঞ্জার আবার হাতির পিঠ থেকে নামলেন। অনেক লোক ছিল সেখানে, পন্ডিতও ছিল। দুপুর শেষের অলস বিকেলে তার আগমন যেন গ্রামবাসীদের মনে অদ্ভুত এক আশার সঞ্চার করল। রেঞ্জারসাহেব একফোটাও সময় নষ্ট না করে পন্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে গেলেন। দুজন মুটে মালপত্র বয়ে নিয়ে এল। প্রথম দিনের প্ল্যানমাফিক ছাগলটা নির্দিষ্ট জায়গায় বেঁধে সেই মাচান দুটিতেই উঠে বসলেন সাহেব ও পন্ডিত। তখনও সন্ধ্যা হতে অনেক দেরি। পন্ডিত হেসে বলল, কি স্যার, আজ এতো তাড়াহুড়ো করে চলে এলেন? ভাল করে রেডি হতে পারলাম না।'

'তুমি রেডি হয়ে গেলেই সমস্যা।'

'সে জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না স্যার। আমি সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই বাঘ না মেরে আমি আর কিছু ছুঁব না।'

'কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেও সেটা তুমি রাখতে পারনি। এখনও তোমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, শরীর টলছে।'

'এটাই তো আমার দুঃখ স্যার, আমি যদি একমাসও না খেয়ে থাকি কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না। আমার মুখে কথাও আটকাবে, পাও ঠিক টলবে। তাই দুয়েকবার ভেবেছি ছেড়ে দেব, ছেড়েও দিয়েছিলাম। পরে দেখি আমার স্ত্রীই বিশ্বাস করতে চায় না আমাকে। তাই ভাবলাম, না, শেষ বয়েসের সঙ্গিনীকে আর ছেড়ে লাভ নেই।'

সাহেব কাঠের লম্বা বাক্সে সযত্নে রক্ষিত নতুন রাইফেলটা বের করলেন। রাইফেল দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল পন্ডিত, 'স্যার এ যে নতুন বন্দুক!'

'হ্যাঁ পন্ডিত, এর ক্ষমতা অসাধারণ। তবে পুরানোটাও আছে।'

'স্যার ভেতরে মাল ঢুকিয়ে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ লোডেড্।'

অন্ধকারের মায়াবি চাদর সযত্নে নেমে এল জঙ্গাল জুড়ে। সন্ধ্যা হতেই আধেক চাঁদ পুবের আকাশে দেখা গেল। অসংখ্য তারার মিছিল সমগ্র আকাশ জুড়ে। তবে নতুন একটা উপদ্রব দেখা দিল এবার। একটু রাত বাড়তেই দূর থেকে কীর্তনের শব্দ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। ফলে জঙ্গালের মৃদু শব্দগুলি শিকারীদের কানে ঠিক মতো পৌঁছতে পারল না।

সেই প্রতীক্ষা আবার শুরু হল। কিন্তু কালোপাহাড়ের আর দেখা পাওয়া গেল না। রাত প্রায় একটা নাগাদ কীর্তন থেমে গেলে সাহেব আস্তে করে ডাকলেন, 'পন্ডিত'।

'আমি রেডি স্যার।'

'তুমি আহট পেয়েছো?'

'না স্যার। আজকে আর ওকে সম্ভবত দেখা যাবে না।'

'কেন?'

'জঙ্গাল ওরকম কথা বলছে না।'

'আচ্ছা পন্ডিত দু-চার দিনের মধ্যে সে কোন বড় শিকার করেনি তো?'

'ও হ্যাঁ স্যার, একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলেই গেছি। নারায়ণ চক্কোত্তির একটা ঘোড়া প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে বাঘে খেয়েছে। লোকে বলাবলি করছে এটা ঐ কালোপাহাড়েরই কাজ।'

'কি করে বুঝলে?'

'সন্ধ্যার সময় চক্কোত্তির ঘোড়া দুটি উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। চক্কোত্তির ছেলেমেয়েগুলি বারান্দায় ছালা পেতে কুপি জ্বালিয়ে পড়াশোনা করছিল। তিনি নিজেও উঠোনে লাকড়ির বোঝার উপর বসে বসে গল্প করছিলেন। একটু রাত হতেই চক্কোত্তিবাবু গিন্নিকে সাহায্যের জন্যে রান্না ঘরে ঢুকলেন। তখনও তার ছেলেমেয়ে চার পাঁচটি বারান্দায় বসে পড়ছিল। হঠাৎ সামান্য একটু শব্দ পেলেন মাত্র, কিন্তু তেমন কিছু তখনও আঁচ করতে পারেননি। তারপর ছেলেমেয়েগুলি ভয়ঙ্কর চিৎকার করে ঘরে ঢুকে গেল। চক্কোত্তিবাবু, তার স্ত্রী ও অন্যরা ছুটে এলেন। তারপর যা শুনলেন তাতে ভয়ে ওরা কাঁপতে লাগলেন। ঘটনা হল, পড়তে পড়তেই চক্কোত্তির বড় ছেলেটা হঠাৎ লক্ষ্য করল যমদুতের মতো একটা বিশাল বাঘ তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। বাচ্চাগুলি মরণ চিৎকার করে চেঁচিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। কিন্তু বড় ছেলেটা ছোট ভাই বোনদের ঘরে না ঢুকিয়ে ঢুকতেও পারছিল না। বিশাল বাঘ তখন প্রায় তার সামনেই এসে পড়েছে। হঠাৎ ছেলেটা দেখল তাদের ঘোড়া

দুটি বাঘের সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর সে আর কিছুই দেখতে পায়নি, ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। চক্কোত্তিবাবু, তার স্ত্রী ও অন্যরা অনেক খুঁজে দেখলেন একটা ঘোড়া আছে অন্যটি নেই। তবে উঠোনের একমাথায় কয়েক জায়গায় কাঁচা রক্তের দাগ লেগে ছিল। আর অন্য ঘোড়াটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে তখনও কাঁপছে. ছটফট করছে। পরদিন সকালে প্রায় তিন মাইল দূরে জঙ্গালে ঘোড়ার হাড়গুলি পাওয়া গেল। চক্কোত্তিবাবু, তার স্ত্রী ও বাড়ির অন্যান্যরা এই ঘোড়ার শোকে বুক চাপড়ে কাঁদছেন এখনও। সত্যিই এমন প্রভুভক্ত প্রাণী পাওয়া বিরল।'

'তিন মাইল দূরে?'

'হ্যাঁ। তাই মনে হচ্ছে, এতো শক্তি একমাত্র কালোপাহাড় ছাড়া কারো নেই।'

রেঞ্জার তখন চিন্তায় পড়লেন। যদি ব্যাটার পেটে খিদে না থাকে তাহলে তো আর এই পথে আসবে না। দেখা যাক কি হয়। এই ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলেন দুজনে। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ জঙ্গাল যেন অন্য কথা বলতে লাগল। পন্ডিত সাহেবকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'স্যার কিছু টের পাচ্ছেন?'

ছোট্ট শব্দ ভেসে আসল, 'হুঁ।'

টানটান হয়ে দুজনেই প্রস্তুত হয়ে রইলেন। এত নিস্তব্ধতা যেন রেঞ্জারসাহেব তাঁর হৃদস্পন্দন টের পাচ্ছেন। ছাগলটা দড়ি ছিঁড়ে পালানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ছোট ছোট কয়েকটি প্রাণী এদিক ওদিক প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। একটু পরেই মূর্তিমান কালোপাহাড় ছাগলটার সামনে এসে দাঁড়াল। তার কোন তাড়া নেই। ছাগলের প্রাণপণে পালানোর চেষ্টা দেখে সে যেন বিরক্ত হয়ে একটা হুঙ্কার দিল। কিন্তু তার পেছন দিকটা বন্দুকের দিকে থাকায় কিছুতেই গুলি করা যাচ্ছিল না। উত্তেজনায় দুজনেই কাঁপছিলেন। সাহেব পন্ডিতকে টর্চ মারতে নিষেধ করলেন। বাঘটা ছাগলটার কাছে গিয়ে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ থেমে নিজের মুখটা সামনের পা দিয়ে চুলকোতে থাকল।

আর তখনি নির্দেশ অনুযায়ী পন্ডিতের পাঁচ ব্যাটারি টর্চের আলো আঁধার চিড়ে বাঘের বিশাল মুখটার উপর পড়ল। টগবগ করে বাঘ তাকাল টর্চের দিকে, আর তখনি রেঞ্জার বাঘের পুরো মাথাটা পেয়ে গেলেন। চকিতে ট্রিগার চেপে ধরলেন। পরপর কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দুটি শব্দ হল 'দড়াম – দড়াম'। সারাটা জঙ্গালে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। অসংখ্য পাখি ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ে গেল। বন্য জন্তুরা এদিক ওদিক ছুটে গেল। কিন্তু গুলি ছোঁড়ার পর যে অভাবনীয় দৃশ্যটা দেখা গেল তার জন্য রেঞ্জার ও পন্ডিত মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বাঘটি মুহূর্তে ছুটে টর্চটাকে লক্ষ্য করে ভয়ানকভাবে লাফিয়ে উঠল। প্রায় নয় দশ মিটার লাফিয়ে উঠে সে একটা ডালে প্রবল আক্রোশে থাবা বসাল, ঐ ডালের বুক থেকে চেলির মতো একটা অংশ নিচে খসে পড়ে গেল। বাঘের লাফ দেখে মনে হচ্ছিল মাচান দুটো বোধ হয় নাগাল পেয়ে যাবে। প্রাণ ভয়ে এমন চিৎকার

করে উঠল দুজনে আশেপাশে তো বটেই, দূর দূর থেকে এই চিৎকার শোনা গেল। গাছের ডাল যখন চিড়ে ফেলল ভয়ঙ্কর বাঘটা, তখন গাছটা এমনভাবে দুলে উঠল, গাছের সাথে বাঁধা না থাকলে দুজনেই উল্টে পড়ে যেত। বাঘটা নিচে পড়ে কোনদিকে পালিয়ে গেল আর বোঝা গেল না। পন্ডিত টর্চ মেরে এদিক ওদিকে আর বাঘকে দেখতে পেল না। রেঞ্জার তাড়াতাড়ি জলের বোতল থেকে গলায় ঢক্ ঢক্ করে জল ঢালতে লাগলেন। বুকটা শুকিয়ে প্রায় কাঠ হয়ে গেছে। পন্ডিতও জল খেল সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে। শুকনো খাবারও সাথে খেল।

দুজনের আর্ত চিৎকারে আশেপাশের মানুষ আতংকে জেগে উঠল। যে যার মতো করে আগুনের লুকা জ্বালিয়ে, টিন বাজিয়ে চিৎকার করতে লাগল। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, এক টিলা থেকে অন্য টিলা হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। গাছের ডালে বসে বসে রেঞ্জার ও পন্ডিত এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। কৃত্রিম আলোয় উদ্ভাসিত হল কাছ থেকে দূরের গ্রামগুলি। ভোর হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মানুষ যেন নতুন ভোরকে আহ্বান করছে। এসো হে নতুন দিন, নবরূপে এসো।

ভোরবেলা থেকে মানুষজনের ভিড় বাড়তে লাগল রামুর দোকানের আশেপাশে। আতংকিত মানুষ ধরেই নিল যে দুজনেই বাঘের পেটে চলে গেছে। থানার বড়বাবু এলেন একটু দেরিতে। আশেপাশের লোকজনের কাছ থেকে স্টেটম্যান নিয়ে ডাইরীতে লিখলেন। যখন মোটামুটি কনফার্ম হয়ে গেল রেঞ্জার ও পন্ডিত আর বেঁচে নেই তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। গতদিনও ব্যর্থতার তক্‌মা লাগিয়ে যারা ওদের গালাগাল দিয়েছিল, তারাই আজ অনভিজ্ঞ রেঞ্জার ও গেঁজেল পন্ডিতকে মন খুলে তারিফ করতে লাগলেন। কেউ কেউ তাদের দেবদূতের সঙ্গো তুলনা করতে শুরু করে দিলেন। ভাবা যায় দেশি ও ভিন দেশি দুটি মানুষ কি মহৎ উদ্দেশ্যে, শুধুই অন্যের জন্য জীবনটা দিয়ে দিলেন।

নানাহ আলোচনার মধ্যেই রেঞ্জারসাহেব ও পন্ডিত জঙ্গালের ভিতর থেকে রাস্তায় নেমে এলেন। জনতার ভিড় হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দুজনকে জীবিত দেখে হৈ চৈ শুরু করে দিল। কেউ কারো কোন কথাই শুনতে পারছিল না। হুজুগে জনতা কারণে অকারণে হোড়াহুড়ি শুরু করে দিল। বড়বাবু ওদের থামালেন। সবাই থামল এবং হাঁ করে তাকিয়ে রইল রেঞ্জার ও পন্ডিতের দিকে। সাহেব বললেন, 'আমাদের একটু চা বিস্কুট খাওয়ান। আমরা দুজনেই খুব ক্ষুধার্ত।'

বড়বাবু বললেন, 'কিন্তু আমাদের কৌতূহলী না রেখে বাঘের কি হল সেটা বলুন?'

সাহেব হাসলেন, পন্ডিতও রহস্যজনক ভাবে হাসল। তারপর রেঞ্জারসাহেব নিজের গলার কাছে হাতটা রেখে একটানে গলা কাটার ইঙ্গিত করে বললেন, 'ফিনিশ।' বড়বাবু থেকে সমস্ত জনতা হৈ হৈ করে জয়ের আনন্দে চিৎকার করে উঠল। এ যেন যুদ্ধ জয়ের মতো আনন্দ। একে অন্যকে অভিবাদন

জানাতে গলা জড়িয়ে ধরল। বড়বাবু বললেন, 'আপনি আমার বুক থেকে একটা বিশাল পাথর সরিয়ে দিলেন। কোথায় পড়ে আছে বাঘটা? ওকে হাতির পিঠে তুলে দুনিয়া ঘোরাব। মানুষের মন থেকে তখন খতরনাক বাঘের ভয়টা চলে যাবে।'

বড়বাবু গ্রামের উৎসাহী লোকদের নিয়ে সেই বটগাছের দিকে হাতির পিঠে চড়ে এগোতে লাগলেন। পেছনে প্রচুর গ্রামবাসী হাতে লাঠি সোটা দা নিয়ে ছুটল। বটগাছ থেকেও বেশ কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সবাই। হঠাৎ হাতিটা চেঁচিয়ে উঠল। সে আর এগুতেই চায় না, মাহুত বারবার চেষ্টা করেও হাতিকে সামনে নিয়ে যেতে পারল না। হাতির পিঠ থেকে নেমে এলেন বড়বাবু কাশীনাথ ভট্টাচার্য। কোথাও বাঘটাকে দেখা যাচ্ছে না তাই এদিক ওদিক খোঁজা শুরু হল। হঠাৎ একজন পুলিশ লাফিয়ে উঠল, 'স্যার, এই যে বাঘটা!' এরকম দানবাকৃতি বাঘ দেখে বড়বাবুর কপালে ঘাম গেল গেল। দুয়েকজন কালোপাহাড়কে দেখে প্রথম এক দু-লাফ মেরে পিছিয়ে এল। ধীরে ধীরে সবাই সাহস সঞ্চয় করে মৃত বাঘের কাছে গেল। বিশাল বাঘটি মরে গেছে তখনও ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। মাছিরা ভন্ ভন্ করছিল মড়া বাঘটির উপর। মাথায় পাশাপাশি দুটি গুলির চিহ্ন, নিখুঁত শিকারীর কাজ।

হাতি বারবার ভয় পাচ্ছিল বাঘটার কাছে যেতে, কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। মাহুত দীর্ঘ সময় ধরে হাতিকে আদর করে বুঝিয়ে তারপর বাঘের কাছে নিয়ে গেল। অবশেষে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে ধরে বাঘটাকে হাতির পিঠে বাঁধতে পারল। লোকালয়ে ওকে নিয়ে এসে সদর রাস্তায় এদিক থেকে ওদিকে ঘুরানো হল। রাস্তার দুধারে কয়েকশো নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কালোপাহাড়কে দেখার জন্য ভিড় জমাল। তার আগে মহকুমার কোথাও কোন মানুষের মৃত্যুও এতো মর্যাদা পায়নি। সত্যিই রাজকীয় মৃত্যু বটে!

রেঞ্জারসাহেব ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ডাকলেন পন্ডিতকে। কি মনে করে ঘোড়া থেকে নেমে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। 'সত্যিই তোমার সাহস আছে পন্ডিত। আবার যদি আমার প্রয়োজন হয় আমাকে ডেকো। তুমি ডাকলে আমি অবশ্যই আসব।' ঘোড়া ছুটে চলে গেল মহকুমা সদরের দিকে, ওখান থেকে হাতির পিঠে চড়ে ফরেস্ট গার্ডদের নিয়ে তিনি চলে যাবেন কৈলাশহরের দিকে। পন্ডিত তার চলে যাওয়ার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। স্বজনকে বিদায় দেওয়ার মতো অনুভূতি হল তার। রেঞ্জারসাহেব যেন স্বপ্নের দেশের রাজকুমার, এলেন, দেখলেন, সবার হৃদয় জয় করলেন, চলে গেলেন। আর যাওয়ার আগে এক গুরুত্বহীন, সবার চোখে ফালতু মদো মাতাল একটা লোককে, এলাকার নায়ক বানিয়ে দিয়ে গেলেন। চোখের পাতা ভিজে উঠল তার।

তবে এটা সত্যি কালোপাহাড়ের মৃত্যুর পরও বাঘের আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু তা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা। বাঘ আর স্থায়ীভাবে এখানকার মাটিতে পা রাখতে পারেনি। ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে এই ত্রিসীমানা থেকে।

৬

উদ্বাস্তু জীবনের কষ্টের দিনগুলি যেন ধীরে ধীরে মসৃণ হতে লাগল। রঘুও বড় হচ্ছে দ্রুত, তার বন্ধুরাও বড় হচ্ছে এক সাথে। নতুন রাস্তাঘাট বাজার হাট তৈরি হওয়ায় এলাকাটা প্রতিদিন পাল্টে যাচ্ছে। পাহাড় ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে নতুন চেহারায়। গ্রাম, তারপর আরও নতুন নতুন গ্রাম, একের পর এক তৈরি হচ্ছে। নতুন স্কুলও হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে। শান্তিবাবু এর মধ্যে সরকারি নিয়োগপত্র হাতে পেলেন। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে শান্তিবাবু প্রোমোশনও পেয়ে গেলেন। শান্তিবাবুর বাড়ির সুনাম ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত চারিদিকে। কারণ এই বাড়ির ছেলে রঘু স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে সামনে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে মহকুমা জুড়ে তার নাম। হবে নাই বা কেন! শান্তিবাবুর মতো শিক্ষকের ছেলে ভাল না হয়ে পারে! কিন্তু শান্তিবাবু ছেলেকে খুব একটা সময় দিতে পারেন না। যদিও তরুবালা ছেলের লেখাপড়া নিয়ে সব সময় খুব যত্নবান।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই শান্তিবাবু ও বিনয়বাবু বগলে ছাতা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। এই ক-বছরে এলাকার দুর্গমতা অনেক কমেছে। মানুষের বসতি ছুটে গেছে জঙ্গালের দিকে। আর জঙ্গাল ক্রমাগত পালিয়েছে দূর থেকে আরও দূরে। ফলে রাত বিরেতে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে আর অসুবিধা রইল না। দুই শিক্ষক মিলে কোন এক ছাত্রের বাড়িতে হঠাৎ ভর সন্ধ্যেবেলা উপস্থিত হলেন। ছাত্র তখন তার বাপের সাথে পাকা ধানে গরু জুতে উঠোনে ধান মাড়াই করছে। ছেলের বাপ ছেলের মাকে ডাকলেন, 'ওগো পন্ডিতমশাইরা এসেছেন, জলচৌকি দাও।'

তৎক্ষণাৎ ছাত্রের মা লম্বা ঘোমটা টেনে দুটো জলচৌকি নিয়ে এলেন। অশীতিপর দাদু লণ্ঠনটা এগিয়ে দিলেন শিক্ষকদের দিকে। কিন্তু শিক্ষকদের সেদিকে খেয়াল নেই। হাঁক ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে বরুণ, তুই তিনদিন স্কুলে যাসনি কেন?'

বরুণ আমতা আমতা করে বলল, 'স্যার তিনদিন ধরে সমানে ধান কাটতে হচ্ছে বাবার সাথে।'

কথাটা শেষ করতে পারেনি বরুণ তার আগেই হাতের কাছে লাঠি, ছাতা, বই যা পেলেন তাই দিয়েই দুই শিক্ষক ওকে পেটাতে লাগলেন। মা, বাপ, দাদু, ভাই, বোন এমনকি জোয়ালে বাঁধা গরু দুটিও এই শাসনের নির্বাক সাক্ষী হয়ে রইল। বরুণ মার খেতে খেতে একসময় পালিয়ে গেল। তখন শান্তিবাবু এগিয়ে

এলেন বরুণের বাপের সামনে। 'ছেলেকে তোমাদের মতো মুখ্যু বানাতে চাও নাকি? স্কুল বন্ধ করে দিয়ে তাকে হালের কাজে বলদের মতো জুতে দিয়েছ।'

বরুণের বাপ ইতস্তত করে বললেন, 'না না পন্ডিতমশাই, এটা খুব ভাল করেছেন। এই শাসনটা ওর দরকার ছিল। আমি বললেই তুই ধান কাটতে যাবি কেন? পন্ডিত মশাইর কথা বড়, না বাপের কথা বড়?'

বরুণের মা নিচু স্বরে বললেন, 'শাসন তোমাকেও করার দরকার ছিল। বরুণ তো ইস্কুলে যেতেই চেয়েছিল। তুমিই ওকে বারণ করলে।'

ফেঁসে গিয়ে বরুণের বাপ স্ত্রীর দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন। বিনয়বাবু গলা ছেড়ে ডাকলেন, 'বরুণ - বরুণ এদিকে আয়।' পাশেই লুকিয়ে ছিল বরুণ। ছুটে এল হাঁক শুনে। ভয়ে লজ্জায় মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইল উঠোনে। বরুণের মা মুড়ি, কলা, মাঠা, সন্দেশ বাটিতে করে এনে দিলেন। খেতে খেতে শান্তিবাবু বরুণের পিঠে আদর করে বললেন, 'কিরে ব্যথা পেয়েছিস?'

মার খেয়ে বরুণ ব্যথা পায়নি তেমন, কিন্তু পন্ডিতমশাইদের এই আদরটা সে আর সহ্য করতে পারল না। সে মাথা নেড়ে 'না' বলল বটে কিন্তু দুচোখ জলে ভরে গেল তার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। শান্তিবাবু বললেন, 'শোন্ তুই স্কুলের ভাল ছাত্র, তুই পড়াশোনায় ঢিলেমি করলে মাথাটা ঠিক থাকে বল। আমাদের মতো হলে তোদের হবে? তোদের আরও বড় কাজ করতে হবে। ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার হতে হবে। বাবার মতো চাষ বাস করে জীবন কাটালে হবে না। দেশটাকে নতুন করে গড়তে হবে, আমাদের স্বপ্নকে তোদের সার্থক করতে হবে। তোরা মানুষ না হলে আমাদের মানুষ বলবে কি?'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'তাই বলে বাপকে কৃষি কাজে সাহায্য করবি না তা কিন্তু হবে না। সবই করবি, কিন্তু পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়া চলবে না।'

তারপর দুই পন্ডিত মিলে রাত্র নটা অব্দি গল্পগুজব করলেন এই বাড়িতে বসে। রাত প্রায় নটার সময় ফেরার পথে রত্নার বাড়িতে ঢুকে পড়লেন দুজনে। রত্নার বাবার মুদির দোকান, সচ্ছল পরিবার। তবু রত্না স্কুল ফাঁকি দেয় কেন জানতেই রত্নার বাড়িতে ঢুকলেন দুই শিক্ষক। বিছানায় শুয়ে আছে রত্না। গায়ে হাল্কা জ্বর, বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না মেয়েটা। রত্নার বাবা তখনও বাড়িতে ফেরেননি। মা ও অন্যান্যরা রত্নার অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন।

বারন্দায় কাঠের টুলে বসে আছেন একজন কবিরাজ, তুলসী অধিকারী। তিনি গত পনেরদিন ধরে অষুধ দিয়ে যাচ্ছেন রত্নাকে। তবু সে সেরে উঠছে না। কিন্তু কবিরাজ ক্রমাগত অভয় দিয়ে আসছেন ভাল হয়ে যাবে রত্না। কিন্তু ভালো সে আর হচ্ছে না, দিন দিন তার বরং আরও অবনতি হচ্ছে। শান্তিবাবু, বিনয়বাবু বাড়িতে গিয়ে সব শুনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'এই গেয়ো ভূত কবিরাজকে দিয়ে মেয়ের চিকিৎসা করাচ্ছেন আপনারা? সে বুঝে চিকিৎসার কিছু? তাহলে পড়াশোনা করে ডাক্তার হোত না কেউ। সবাই তুলসী অধিকারীর মতো কোব্‌রেজ

হোত।'

বিনয়বাবু বললেন, 'হরিভূষণ সাহার চুলোয় টান পড়েছে এমন খবর তো আমাদের জানা নেই। তাহলে এতো কৃপণতা কেন? পয়সা কড়ি ওদের জন্যই তো জমাচ্ছেন আপনারা। মেয়েটা মরে গেলে কার জন্য পয়সা রাখবেন, কাশীবাসী হওয়ার জন্যে?' রত্নার মা কি বলবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। কবিরাজের অবস্থা আরও খারাপ। তিনি পালাবেন, না বসে থাকবেন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। তখনি ধমকে উঠলেন শান্তিবাবু, 'তুমি এখনও বসে আছ? চিতার আগুন না দেখলে তোমার কি মনে শান্তি আসে না? কিসের বটিকা এসব খাওয়াচ্ছ কচি মেয়েটাকে? নিজের সন্তানদের কখনও এই বটিকা খাইয়েছ?'

আর কালবিলম্ব না করে তুলসী অধিকারী সোজা লেজ তুলে পালালেন। বিনয়বাবু ডাকলেন, 'রত্না - রত্না - দেখি এদিকে আয় মা।' রত্না গায়ে কাঁথা জড়িয়ে খুব কষ্ট করে ওর মাকে ধরে উঠে এল। বিনয়বাবু বললেন, 'শান্তিদা, লক্ষণ দেখে তো মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া।'

'হতে পারে। ওকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এই একটি চাঙ্গারি বাঁধো, রত্না হেঁটে যেতে পারবে না, ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

চাঙ্গারি তৈরি হল। মশারি, বিছানা নিয়ে তৈরি হলেন রত্নার মা ও দাদা। রাত প্রায় বারোটায় রত্নাকে মহকুমা সদরের হাসপাতালে ভর্তি করা হল। একজন ডাক্তারই আছেন এই হাসপাতালে। তিনি দেরি না করে ওর চিকিৎসা শুরু করলেন। প্রায় সাত দিন চিকিৎসার পর রত্না কিছুটা সুস্থ হল। দুই শিক্ষক পিতার মতো রত্নার পাশে ছিলেন যতদিন সে সুস্থ না হয়। রত্নার পিতার কোন ক্ষোভ নেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বরং অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তিনি আনত হয়ে রইলেন। অথচ তার অনুমতি ছাড়া রত্নাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রত্নার বাবার ক্ষোভ থাকা সংগত ছিল। উল্টে তিনি শিক্ষকদের দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কারণ যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে আর রক্ষে থাকবে না তার।

এমন অজস্র কাহিনি ওরা ছড়িয়ে দিলেন পবিত্র গীতার শ্লোকের মতো গ্রামেগ্রামে। ওরা যেন সেই শিক্ষক যারা শুধু বিদ্যালয়ের আঙিনায় নয়, শুধু ছাত্রদের নয়, সমগ্র সমাজকেই আজীবন শিক্ষা দিয়ে যাবেন। শিক্ষা ব্যবস্থার এক স্বর্ণযুগ তৈরি করলেন এই প্রাচীন ও চিরন্তন মূল্যবোধের মানুষগুলি।

প্রায়শই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তরুবালা দেখতেন দু-একজন ছাত্রছাত্রী চৌহদ্দির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আসবে কি আসবে না ভয়ে স্থির করতে পারছে না। তরুবালা খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেন। কিন্তু শান্তিবাবু ও রঘু এতো ভোরে কখনই ঘুম থেকে উঠতে পারেন না। রঘু অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা করে। শান্তিবাবুও তার পাশে জেগে সবসময় বসে থাকেন। তরুবালা খুব প্রয়োজন পড়লে ওদের ডাকেন, না হয় একটু বেলা অব্দি ঘুমিয়ে ওরা বাপ ছেলে উঠে।

তরুবালা বাচ্চাগুলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাকলেন। নিঃশব্দে চুপিচুপি ছুটে এলো সবাই বাড়ির ভেতরে। তরুবালা বারান্দাটা গোবর, মাটি ও জল গুলে লেপ দিতে আরম্ভ করলেন। এক ছাত্রী দ্রুত ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট দিতে লাগল। তারপর বাড়ির চারিদিকে গোবর গোলা জল ছিটিয়ে দিলেন তরুবালা। প্রায় আধঘন্টা পরে বাড়িটা যেন পবিত্র হয়ে উঠল। তখন বাচ্চা তিনটিকে বললেন, 'কি হয়েছে রে বাসব?'

বাসব রঘুর বন্ধু। রঘুর থেকেও বছর দুয়েকের বড় সে। কিন্তু দুজনের পড়াশোনায় একেবারেই মিল নেই। রঘু সামনেই স্কুল ফাইনাল দেবে আর বাসব পড়ছে ক্লাস ফাইভে। তার সাথে আসা বাচ্চা দুটিও পড়ে একই ক্লাশে অথচ বয়সে বাসবের অর্ধেক। বাসবের পরনে হাতে সেলাই করা থান কাপড়ের ঢোলা ট্রাউজার আর প্রায় হাটু অব্দি ঝোলানো ফতোয়া। ছেলে মেয়ে প্রায় সবাইকেই হাতে সেলাই করা স্কুল ড্রেস পরতে হয়। তরুবালার ডাক শুনে বাসব মাথা নুইয়ে বলল, 'কাকিমা অংক আর ইংরেজি কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। ওরাও কিছুই বুঝতে পারছে না। স্যার ক্লাশে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব না, বেদম মার খাব।'

তরুবালা বাটিতে মুড়ি ও পাকা কাঁঠাল ওদের খেতে দিলেন। উনি জানেন শান্তিবাবু ঘুম থেকে উঠলেই ওরা বিপদে পড়ে যাবে। ক্লাশে কেন বোঝেনি তার জন্য একবার মার খাবে। তারপর আবার খাবে না বোঝেও ক্লাশে বলেনি কেন। হয়তো মন ভাল থাকলে রেগে নাও যেতে পারেন। আদর করে তিনি ওদের সব কিছু বুঝিয়েও দিতে পারেন। তবু একদম ঝুঁকি না নিয়ে তরুবালা পরম মমতায় ওদের বইপত্তর খুলে প্রথমে অংকগুলি কষে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর ইংরেজিটাও বারবার সহজ করে বোঝালেন। ওরা যে বুঝতে পেরেছে সেটা বুঝেই তরুবালা ওদের তাড়া দিলেন, 'যা যা তোরা চলে যা, আর দেরি করিস না। গরুটা ডেকেছে এক্ষুণি তোদের স্যার ঘুম থেকে উঠে যাবেন।' সবকটা ছেলেমেয়ে এমনিতেই তটস্থ ছিল, এবার প্রায় লাফিয়ে উঠে চোরের মতো পালিয়ে গেল।

শান্তিবাবু ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর প্রণাম করে বললেন, 'বেশ হৈ চৈ শোনা গেল। কি বাসব এসেছিল?'

তরুবালা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'না বাচ্চারা আম কুড়োতে এসেছিল।'

পুকুরে বাসন মাজতে গিয়ে তরুবালা দেখেন পটল তাকে ডাকছে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে। সে তখনও যায়নি, আবার ফিরে এসেছে। তিনি বাসন রেখে পুকুর পারে ঝোঁপের পাশে গিয়ে নিচু স্বরে বললেন, 'কি হয়েছে রে পটল, তুই এখনো যাসনি?

'গিয়েছিলাম তো কাকিমা, বাসবদার জন্য আবার ফিরে আসতে হল।'

'কেন কি হয়েছে?'

'আপনি বললেন এম ইউ এন মুন মানে চাঁদ। বাসবদা বলছে মুন নাকি সূর্য। সূর্য তো এস ইউ এন সুন তাই না কাকিমা?

তরুবালা নিজেই হাসতে লাগলেন। 'তুই ঠিকই বলেছিস পটল মুন মানে চাঁদ। কিন্তু বানানটা এম ইউ এন নয় - এম ডাবল ও এন, মনে থাকবে?'

'থাকবে কাকিমা, আমি যাই।'

'এই শোন, আর এই যে বললি এস ইউ এন সুন এটা ঠিক নয়, এস ইউ এন হবে সান মানে সূর্য, মনে রাখিস।'

পটল 'এস ইউ এন সান মানে সূর্য' জপতে জপতে মুহূর্তে পুকুর পাড় পেরিয়ে পাট খেতের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল।

বহুদিন পর জ্যোতিবাবু তার দুই ছেলে, স্ত্রী ও মাকে নিয়ে রঘুদের বাড়িতে এলেন দুপুরবেলা। তাদের সাথে ভার দিয়ে চারজন ভারী এলো প্রচুর খাবার দাবার, শাকসবজি ও ফলমুল নিয়ে। জ্যোতিবাবু বাঁশের ঘাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই শান্তিবাবুকে পেয়ে গেলেন বারান্দায়। জ্যোতিবাবু তার স্ত্রী ও ছেলেরা সবাই নুয়ে শান্তিবাবুকে প্রণাম করলেন। তরুবালা কুসুমের সাথে গল্প করে রান্না ঘরের কাজ করছিলেন। তখন মোহিনী তার দুই ছেলেকে নিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে গেলেন তরুবালার কাছে। একটু অপ্রস্তুত হয়েই কুসুম সরে দাঁড়াল। জ্যোতিবাবুর ছেলেরা পার্থ ও পরমার্থ তরুবালাকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাঠিমা রঘু কোথায়?'

'রঘু পুবের ঘরে পড়ছে। তোরা যা বাবা, একসাথে গল্প কর গিয়ে।'

ওরা চলে যেতেই তরুবালা কুসুমকে বললেন, 'ওকে চিনিস কুসুম?'

'না পিসিমা।'

'আমার জা-ছোট জা। ওরা বিরাট বড়লোক, পাশেই নবগ্রামে ওদের বাড়ি।'

'তোমাদের কোন আত্মীয় আছে আগে বলোনি তো পিসিমা?'

'বলব কি করে বল, আমাদের কি কেউ খোঁজ রাখে? প্রায় দশ বার বছর পর আমাদের কথা বড়লোক গিন্নির মনে পড়ল।'

মোহিনীও ছাড়ার পাত্র নন, 'আমার তাও মনে পড়ল দিদি। কিন্তু তোমারা তো একবারও মনে করলে না অভাগিনিকে। যতই দোষ করুক আমার স্বামী আমরা তো কোন অন্যায় করিনি। জ্ঞাতি গোষ্ঠির লোককে কেউ এমন করে ভুলে যায়?'

তরুবালা খৈ গুড় দিয়ে তৈরি একটা লাড্ডু মোহিনীর মুখে দিয়ে বললেন, 'নে এবার চুপ কর নবাবগিন্নি। কুসুম তুইও একটা খা। আর শোন, পরমার্থ পার্থ রঘু ওদের একটা বাটিতে করে দিয়ে আয় তো মা।' তারপর মোহিনীকে বললেন, 'এই ছোট নে জল চৌকিটা নিয়ে বোস।' মোহিনী বসলেন।

'কিরে কদিন থাকবি তো?'

'কদিন থাকব সেটা তোমার দেওর জানে, আমি জানি না। তবে আমি থাকতেই এসেছি দিদি।'

'তা হঠাৎ কি মনে করে চলে এলিরে ছোট।'

'তোমার দেওরের এতোদিনে ঘুম ভেঙেছে দিদি। তোমাদের যে ঠকিয়েছে তার হাতে নাতে ফল পাচ্ছে।'

'কেন কি হয়েছে?'

'কি হবে আর পাপের ফল পেয়েছে। পাহাড়ের যে সব জমি পাহাড়িদের ঠকিয়ে নিজের নামে দখল করে নিয়েছিল সেগুলি এখন বেদখল হয়ে যাচ্ছে।'

'কি করে বেদখল হল?'

'ঐ যে দিদি, মুক্তি পরিষদ না কমুনিষ্ট কি জানি পাহাড়িদের একটা দল আছে না? তারা হুলিয়া জারি করেছে - পাহাড়িদের সম্পত্তি যে সব মহাজন অবৈধভাবে দখল করেছে তা দখল করে পাহাড়ি জুমিয়াদের আবার দিয়ে দেবে।'

'বলিস কিরে পাহাড়িদের কাছ থেকে তো প্রচুর জমি রেখেছিল ঠাকুরপো। সব চলে গেছে?'

'এখনো পুরোটা যায়নি, তবে যাবে।'

'একি কথা শোনালি ছোট, আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'এটা কি শুনেছ দিদি, আরও অনেক ঘটনা আছে।'

'আরও? কি বল?'

'সুইক্যাবাড়ি, শ্রীরামপুর, হালাম পাড়ায় তোমার দেওরের বড় বড় তিনটে ধানের আড়ত ছিল। সব ধান পাহাড়িরা লুট করে নিয়ে গেছে।'

'কেন? লুট করবে কেন?'

'করবে নাই বা কেন বল দিদি? মুক্তি পরিষদের লোকেরা আমাদের বাড়িতে এসে অনুরোধ করেছে, পাহাড়ে খুব অভাব চলছে, তারা পরে ফেরত দিয়ে দেবে, এখন মুক্তি পরিষদকে মজুত ধানটা দিয়ে দেওয়ার জন্যে। তোমার দেওর বললে, আমি তোমাদের দেব কেন? বাইরে পাঠালে অনেক বেশি দাম পাব। তারা দামও দিতে রাজি ছিল মুক্তি পরিষদের ঠিক করা দামে। কিন্তু তোমার দেওর রাজি হল না। বেশ, এখন সব লুট হয়ে গেল।'

'তোদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল ছোট।'

'পাপের ধন দিদি এভাবেই যায়। তোমাদের ঠকিয়েছে, হাজার হাজার মানুষকে নিঃস্ব করে কি কখনো উপরে উঠা যায়? শুনেছি কংগ্রেস দল থেকেও ওকে বের করে দিয়েছে।'

'কেন রে?'

'কি জানি বাড়িতে ওসব নিয়ে কিছু বলেনি, আমি অন্যের মুখে শোনলাম। তাছাড়া ছেলে দুটির একটাও মানুষ হবে না দেখে নিও। এগুলি বাপের থেকে আরও বড় লম্পট হবে।'

এবার একটু বিরক্ত হলেন তরুবালা, ধমক দিয়ে বললেন, 'কি যা-তা বলছিস, ওরা এখনও তো কত ছোট।'

'ছোট কি বলছো দিদি! পরমার্থ রঘুর চাইতে তিন বছরের বড়, পার্থ এক বছরের। রঘু স্কুল ফাইনাল দেবে সামনের বছর, আর ওরা দুজন এখনও সিক্স ও সেভেন। কিন্তু বিড়ি টানায় বাপের থেকেও ওস্তাদ। পেকেছেও কম না। 'রূপবান' গানের কলি সারাদিন মুখে মুখে আওড়ায়।'

তরুবালা পৃষ্ঠা উল্টে দিলেন, 'চল ছোট, রঘুকে তো তুই অনেকদিন দেখিসনি ওকে দেখে আসবি।'

রঘুর কথা উঠতেই ঝটপট উঠে দাঁড়ালেন মোহিনী। তখনি ছুটে ঘরে ঢুকল কুসুম। ঘরে ঢুকেও সে হাঁপাচ্ছিল।

'কি হয়েছে কুসুম? ভূত দেখেছিস মনে হচ্ছে?' তরুবালার প্রশ্ন শুনে কুসুম নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

'কিছু না পিসিমা পুকুরে বাটিটা ধুতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেছি।'

মোহিনী ওদিকে কোন গুরুত্ব দিলেন না বটে, তবে তরুবালার চোখের দিকে তাকিয়ে কুসুমের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। এই মহিলা যেন চোখের দিকে তাকিয়ে মানুষের হৃদয় পড়ে ফেলতে পারেন। মোহিনী হঠাৎ বললেন, 'শোন দিদি তোমার পায়ে পড়ি আমার একটা কথা রাখো। তোমার দেওর এবার যা চাইবে তা তোমরা মেনে নিও।'

তরুবালা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাইবে রে আজ তোর কর্তা?'

'সে বোধয় পাগল হয়ে যাবে দিদি। হঠাৎ একদিন চিৎকার করে বলতে লাগল, আমি দাদার সাথে অন্যায় করেছি তাই আমার ভরাডুবি হচ্ছে। আমি দাদার সব কিছু ফিরিয়ে দেব, না হয় আমি শেষ হয়ে যাব।'

'তোরা কি আমাদের সবকিছু ফিরিয়ে দিতেই এসেছিস ছোট?'

'আমি এসব জানি না গো তোমার দেবর জানে।'

'ভুলেও এই কাজটি করতে যাসনে তোরা। আমরা এখন কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছি, বিপদের দিনগুলি কেটে গেছে। এখন আমাদের যা ঈশ্বর দিয়েছেন তাতে দুবেলা অন্ন আমাদের জুটবে। তোর ভাসুরকে তো জানিস, বিপদের দিনেও এতো এতো টাকার উপর লাথি মেরে চলে এসেছে।'

'সেটাই তো বলছি দিদি। তোমাদের নাম ডাক, সামাজিক সম্মান সব শুনে ওর তো মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। তোমরা শূন্য থেকে এই জায়গায় এসেছো। আর ও সব পেয়েও একফোটাও এগোতে পারেনি। তাই ও ভেবেছে তোমাদের সব ফেরত দিয়ে দেবে।'

'ভাল। চেষ্টা করে দেখ, তোর ভাসুর যদি নেয়, নেবে।'

পরমার্থ ও পার্থ ঘরে ঢুকতেই রঘু উঠে দাঁড়াল। 'আরে বড়দা, মেজদা তোমরা কখন এসেছো, বসো।'

বাঁশের মাচানের উপর বিছানা পাতা, এ ঘরে রঘু শুধু পড়াশোনা করে।

পরমার্থ ঘরে ঢুকেই বিড়ি বের করে ফস্ করে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে নিল। পার্থ দাদার বিড়ি থেকে আগুন নিয়ে নিজের বিড়িতে টান দিল। সারা মুখে ধোঁয়া ছড়িয়ে পার্থ বলল, 'সারাদিন এতো পড়া পড়া করিস কেন রঘু? এতো পড়ে-টরে হবেটা কি?'

পরমার্থ বলল, 'কেন আইএ বিএ পাশ করে সরকারি চাকরি করবে। তোর মতো মুখ্যু হবে নাকি?'

পার্থ বলল, 'সরকারি চাকরি করে জ্যাঠুর মতো ষাট টাকা বেতন পাবে। বাবা যেমন বলে বিলেত ফেরত ভিখিরি। আমি তো এতো পড়াশোনা করিনি কিন্তু এখনি আমার ট্যাঁকে মাসের শেষে দুশো টাকা থাকে।'

রঘু ভয়ানক বিব্রত বোধ করল। সবে কৈশোর পেরিয়েছে রঘু, কিন্তু শৈশবের সারল্য এখনো তার চোখে মুখে লেগে রয়েছে। এখনও রঘুর চাইতে দুষ্ট ছেলে এলাকায় খুব কম আছে। প্রতিদিন একটা দুটো নালিশ তার নামে বাড়িতে আসে। শান্তিবাবু প্রায়শই রঘুকে মারধর করেন দুষ্টুমির জন্য। তবু পরমার্থ ও পার্থর বড়দের মতো আচরণ রঘুর অস্বস্তি বাড়িয়ে দিল। পরমার্থ পার্থকে বলল, 'পার্থ জ্যাঠিমার পাশে যে মেয়েটা বসেছিল, সেটা কে রে?

'আমি কি করে বলব? এই রঘু মেয়েটা কে রে ভাই?' পার্থ জিজ্ঞেস করল।

রঘু ইতস্তত করে বলল, 'না কেউ না মেজদা, ঐ যে আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে।'

পার্থ মজা করে বলল, 'কিরে দাদা তোর চোখে আটকে গেছে মেয়েটা? তাইলে তো রক্ষে নেই। তবে মেয়েটা জিনিস বটে, দেখ লাগবে নাকি?'

ওদের কথার মাঝখানেই কুসুম এসে ডাকল, 'রঘুদা - রঘুদা।' রঘু প্রায় লাফিয়ে উঠে দরজায় গিয়ে কুসুমকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিল। 'কি হয়েছে কুসুম? তুই আবার এখানে এলি কেন?'

'পিসিমা নাড়ু দিয়ে পাঠালেন। নে তোরা খেয়ে নে।'

রঘু নাড়ুর বাটিটা হাতে নিল। প্রস্থানোদ্যত কুসুমের উদ্দেশ্যে পরমার্থ বলল, 'এই তোমার নাম কি গো?' কুসুম এর মধ্যেই অনেক পরিণত। যুবক ছেলেদের চাহনি, গলার স্বর দেখে শুনে সে এখন তার মানে বুঝতে পারে। তাছাড়া রঘুর চাইতে ছোট হলেও সে বরাবরই রঘুর চাইতে এগিয়ে থাকে। দুটি ছেলের চোখের ভাষা প্রথম থেকেই ওর ভালো লাগেনি। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'রঘুদা তোমাদের সামনেই তো আমার নাম ধরে ডাকছিল শুনতে পাওনি?'

পার্থ চমকে উঠে বলল, 'এই দাদা এতো রণচন্ডী।'

পরমার্থ নরম সুরে বলল, 'মেয়েদের তেজ থাকা ভাল পার্থ। এই কুসুম ভেতরে এসো। আমরা এতো দুর থেকে এসেছি আমাদের সাথে আলাপ পরিচয় করবে না?'

রঘু পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে আঁচ করতে পেরে নার্ভাস হয়ে গেল। তাছাড়া কুসুম যেরকম কড়া ধাতের মেয়ে অনর্থ না বেধে যায়। সে তাই দরজা আটকে বলল, 'না না তুই চলে যা কুসুম। পরে, তোর সাথে কথা বলব আমরা তুই যা। আমাদের এখন কাজ আছে।'

কুসুম রঘুকে ঠেলে সরিয়ে ঘরের ভেতরে চলে এল, 'কি কাজ আছে তোর রঘুদা? তুইও ছোটলোকদের মতো বিড়ি ফুঁকবি নাকি?' তারপর পরমার্থর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলবে বল?'

পরমার্থ এইবার দমে গেল, 'না বলব আর কি। তোমাদের বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাবে কুসুম?'

'নিশ্চয় এই কথাটা বলতেই শুধু আমাকে ডাকোনি?'

'না না এটা কোন কথাই নয়। দাদা বলছিল তোমাদের বাড়ির সবাই কি তোমার মতো সুন্দরী?' পার্থ মুচকি মুচকি হেসে প্রশ্ন করল। কুসুম রঘুকে জিজ্ঞেস করল, 'রঘুদা ওদের বাবা কি করেন?'

রঘু অবাক হয়ে বলল, 'কেন কুসুম?'

'তোমার কাকাকে বলে দিও ছেলেদের সঠিক শিক্ষাটা উনি দেননি। অবশ্য বাপেরও যদি চারিত্রিক গুণ থাকে তাহলে বলে লাভ নেই। আর তোমরাও শোন, বাপের পয়সায় যারা ফুটানি করে তাদের যে মেয়েরা পছন্দ করে তারা অন্যরকম। ভদ্রলোকের বাড়িতে ওদের খুঁজতে যেও না। বুঝলে?'

রঘু এবার ঠেলে বের করে দিল কুসুমকে ঘর থেকে। পরমার্থ কথাগুলি হজম করতে পারল না। সে অবাক হয়ে বলল, 'আমরা কি এমন বললাম, মেয়েটা রাগ করে ফেলল। কিরে পার্থ?'

'না বড়দা আমরা তো খারাপ কিছুই বলিনি। তবে আমার মনে হয় কি জানিস রঘুর, সাথে মেয়েটার হয়তো লাইন আছে। তাই তো রঘু দেখলে না সারাক্ষণ ওকে আড়াল করে গেল।'

'কিরে রঘু তুই যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস আমাদের আগে বললেই পারতিস। ছিঃ ছিঃ আমরা ফালতু বাজে কথাগুলি শোনলাম।'

এইরকম আলোচনায় রঘু অভ্যস্ত নয়। কুসুম ও সে ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছে। অথচ কোনদিন বুঝতেই পারেনি সে রঘু ছেলে, আর কুসুম মেয়ে। এখনও খেলা, পড়া, মারপিট, আনন্দ সব একসাথেই ওরা করে। পরমার্থ ও পার্থর কথায় একটা ধাক্কা খেল রঘু। একটা অদৃশ্য দেয়াল যেন উঠে গেল রঘু ও কুসুমের সামনে। রঘুর ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল, আর সে সহ্য করতে পারল না। রঘু পরমার্থের চোখে চোখ রেখে বলল, 'শোন বড়দা, মানুষকে মেপে কথা বলবে। আমাদের কতো বড় ক্ষতি তোমরা করেছো আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না। তবে হ্যাঁ তোমরা ঠিকই ধরেছ মার ইচ্ছে কুসুম এই বাড়ির বউ হয়েই থাকুক। আমারও তাই ইচ্ছে।'

কুসুম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। রঘুর কথা শুনে সে ভয়ানক চমকে উঠল। রঘু এতোটা বুঝতে শিখেছে, এতোটা পরিণত হয়ে গেছে আগে কখনোই আন্দাজ করতে পারেনি। রঘুকে কখনও পুরুষ হিসেবে ভাবেইনি সে। হঠাৎ কুসুমের নাক কান লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। শ্বাস প্রশ্বাস যেন দ্রুত বইতে শুরু করল তার। সে ছুটে চলে গেল রান্না ঘরে। রঘুও কুসুমের পায়ের শব্দ টের পেল। কুসুম কথাগুলি নির্ঘাত শুনেছে।

শান্তিবাবু বারান্দায় লম্বা বাঁশের মাচানে শুয়ে ছিলেন। উঠে তিনি মা'র পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মাকে বসালেন ঘরের ভিতরে নিয়ে। সুরবালা বড় পুত্রের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। জানিস শান্তি, সেই কবে থেকে তোর কাছে আসব আসব করে পাগল হয়ে আছি। বারবার বলি, জ্যোতি সময় করে একবার নিয়ে যা আমাকে শান্তির বাড়িতে। কিন্তু সে সময়ই পায় না। রঘুটাকে দেখার জন্য বুকের ভিতরটা সবসময় ছটফট করতো।'

শান্তিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক না মা ওসব কথা। এক যুগ পর তুমি আমার বাড়িতে পা দিয়েছো এতেই আমার বাড়ি পবিত্র হয়ে গেছে। আজ আমার পরম আনন্দের দিন।'

জ্যোতিবাবু বললেন, 'আমারও খুব ভালো লাগছে দাদা, পরিবারের সবাই আজ আবার এক হলাম।'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। একেই বলে শেকড়ের টান। তা তুই এতো মোটা হচ্ছিস কেন? শুধু টাকা রোজগার করলেই হবে, শরীরকেও তো কিছু দিতে হয়।'

'আর বলো না দাদা, যা ধকল যায় সারাদিন, এক্কেবারে সময় পাই না।'

সুরবালা রঘুর ঘরের দিকে দ্রুত ছুটে গেলেন। রঘুকে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন, তারপর আবার ফিরে এলেন। শান্তিবাবু ভারীদের বয়ে আনা মাটির ভার টুকরিগুলি দেখে বললেন, 'এসব কি নিয়ে এলি জ্যোতি?'

'তেমন কিছু না দাদা, ভাতিজা বৌদির জন্য কিছু মাছমাংস, ফলমূল, শাকসবজি এই আর কি।'

'ওসব আবার এত দূর থেকে বয়ে আনতে গেলি কেন? ভেবেছিলি দাদা মাছ মাংস খাওয়াতে পারবে কি না?'

'কেন লজ্জা দিচ্ছ দাদা। আমি সময় পাই না বলে আসতে পারি না ঠিক। কিন্তু তোমার প্রতিদিনকার খবর আমি পাই। সত্যি ক-বছরে তুমি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছো। যা আমি আজও পেলাম না।' তারপর ভারীদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন, 'এই যা বৌঠানের কাছে রান্নাঘরে এগুলি দিয়ে তোরা চলে যা।'

সুরবালা জ্যোতিবাবুকে বললেন, 'তুই তো কোথায় চলে যাবি বলেছিলি জ্যোতি, তাহলে কাজের কথাগুলি আগে সেরে নে।' জ্যোতিবাবু কাপড়ের ঝোলা থেকে তিন বান্ডিল মোড়ানো কাগজ বের করে মাচানে রাখলেন। তারপর শান্তি বাবুর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দাদা আমাকে মাপ করে দাও। আমি না বুঝে

অনেক অন্যায় করে ফেলেছি তোমার সাথে। এই নাও সমস্ত দলিল পত্র, জমির সব কাগজ এখানেই আছে । সব তোমার চরণে আমি রেখে দিলাম, এখন তুমি এগুলি গ্রহণ করে আমাকে পাপমুক্ত কর। আর আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও।'

'এসব নাটক কেন করছিস জ্যোতি? আসল কথাটা আগে বল, কি চাস তুই?'

সুরবালা ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাঝখানে, 'তুই ওরকম ভাবিস না শান্তি, জ্যোতিতো তোরই ছোট ভাই। তোকে ঠকিয়ে সে নিজেই অনুতপ্ত। তুই এবার ওকে মাপ করে দে বাবা।'

'তোমরা কি আরম্ভ করেছো মা? আমি এখনও বুঝতে পারছি না। আমার যা কিছু আছে তা নিয়ে আমি সুখেই আছি, এখন আর আমার কিছু দরকার নেই। তোমার আশীর্বাদ যদি থাকে আমাকে ঠকাতে পারলেও আমার কপাল তো কেউ নিতে পারবে না।'

'এসব কথা আমি শুনব না দাদা। তুমি প্রথমে এই জমির দলিলগুলি গ্রহণ কর। তারপর রেজিস্টারীর দিন ঠিক কর। তখন আমি বুঝব তুমি আমাকে মাপ করেছো। তারপর তোমার যা খুশি কর আমার কোন আপত্তি থাকবে না।'

শান্তিবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন। বারবার পা ছাড়তে বললেও জ্যোতিবাবু কিছুতেই কথা শুনছেন না। তিনি তখন বাধ্য হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে জ্যোতি আমি এই জমি গ্রহণ করলাম। নে এখন পা ছাড়।'

জ্যোতিবাবু ও সুরবালা এমনভাবে চমকে উঠলেন তাদের মুখটা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল। শান্তিবাবু হেসে বললেন, 'এখন কাজের কথাটা বল।'

জ্যোতিবাবু কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না। কুসুম খৈয়ের নাড়ু ও জল রেখে গিয়েছিল, সেখান থেকে জল পুরোটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিলেন। তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'দাদা ইদানীং দলের সাথে আমার কিছু সমস্যা হচ্ছে। কথা হচ্ছে আমাকে হয়তো দল থেকে বের করে দেওয়া হবে। তুমি যদি একটু ভট্চাযের সাথে কথা বল তাহলে ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যাবে। তোমার সাথে তো ভট্চাযের ভাল সম্পর্ক, তুমি বললে উনি হয়তো তোমার কথা রাখবেন। না হয় আমি ভয়ানক বিপদে পড়ে যাব।'

শান্তিবাবু এবার বুঝতে পারলেন জ্যোতিবাবুর এতো নাটকের আসল কারণটা কি। দলের নাম ভাঙিয়ে রিলিফের নামে উদ্বাস্তুদের বহু টাকা লুটে নিয়েছেন জ্যোতি। এছাড়াও নারীঘটিত কিছু কেলেঙ্কারীও তার নামে আছে। ফলে দলের মধ্যে তাকে নিয়ে সীমাহীন অসন্তোষ। এটা শান্তিবাবু আগেই শুনেছিলেন। তিনি ভট্চাযের সাথে কথা বলবেন কথা দেওয়ায় জ্যোতিবাবু আশ্বস্ত হলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোরে হাঁকলেন, 'পরমার্থ, পার্থ, রঘু তোমরা এদিকে এসো। গাড়ু তোর দুই মামিদেরও ডাক, এখানে আসতে বল।'

সবাই প্রায় ছুটে এখানে চলে এলো। শান্তিবাবু সবাইকে বললেন, 'আমার

কাছে এখন অনেক জমির কাগজ আছে। এটা আমাদের এজমালি সম্পত্তি, যার যার চাই বলবে। পরমার্থ তোমার জমি চাই?'

'হ্যাঁ জ্যাঠু, আমার চাই।'

'পার্থ তোমার?'

'হ্যাঁ জ্যাঠু, আমারও চাই?'

'রঘু?'

রঘু ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো মার দিকে তাকাল। তরুবালা হেসে বললেন, 'কি হল আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? তোমার জমির দরকার? থাকলে বল, চাই, না হয় না বলে দাও।'

রঘু বলল, 'আমি জমির কি বুঝি বাবা। জমি দিয়ে আমি কি করব? ওসব আমার চাই না, আমি পড়তে যাচ্ছি।'

রঘু পড়তে চলে গেল। শান্তিবাবু সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'আর কারো জমি চাই তাহলে বল, না হয় পার্থ ও পরমার্থকে সব জমি দিয়ে দেওয়া হবে।'

কারো কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে শান্তিবাবু জ্যোতিবাবুর কাগজগুলি তাকেই তুলে দিয়ে বললেন, 'শোন জ্যোতি, তুই প্রথম যেদিন বেইমানি করলি সেদিন ঠিকই মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। কারণ সেদিন আমাকে তুই বানিয়ে দিয়েছিলি সর্বহারা। তবে পরে যখন ভেবেছি তখন মনে হয়েছে ভালই হয়েছে। এসব জমিদারির সম্পত্তিতে অনেক মানুষের অভিশাপ লেগে থাকে রে ভাই। তোর মতো বড়লোক নাই বা হলাম, খেয়ে পড়ে চলে যাচ্ছে তো দিনগুলি।'

সুরবালা হঠাৎ জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলেন। জ্যোতিবাবু দাদাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি মানুষ না দাদা, দেবতা। আমায় তুমি শুধু একটু আশীর্বাদ করো, তাহলেই আমার হবে।'

সুরবালা বললেন, 'রঘুকে এভাবে ঠকানো তোর উচিত হয়নি শান্তি। কিছু জমি রঘুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তোর রাখা উচিত ছিল। এতো ভালমানুষ হতে নেইরে তাহলে কষ্ট পেতে হয়।'

শান্তিবাবু কাউকে কিছু বললেন না। তার মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলির কথা - এই সম্পত্তির টাকাগুলি কতো কষ্ট করে তিনি এপাড়ে পাঠিয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে পুরো টাকাটাই তিনি হজম করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি, ছোট ভাইকে তিনি ঠকাতে চাননি। অবশ্য জ্যোতিবাবু হয়তো সব সময় ভাবতেন, দাদা নিজের জন্য রেখেই বাকি টাকা এপাড়ে পাঠিয়েছে। ফলে এই টাকার উপর জ্যোতিবাবুর হক একশো ভাগ। যদিও পরে তার ভুল ভেঙে যায়, যখন দেখলেন একজন সাধারণ উদ্বাস্তুর মতো তার বড় ভাই বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই লড়ছেন। নিজের আখের যদি আগেই গুছিয়ে রাখতেন তাহলে নিশ্চয় এতো কষ্ট করে তার দিন কাটাতে হোত না। শান্তিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি মনে মনে

ভাবলেন, এখনো যে সম্পত্তিটা ওপাড়ে রয়ে গেছে তার মূল্যও তো কম নয়। যদি কোনদিন সুদিন আসে সেদিন ঐ জমি ফিরেও পেতে পারেন। নিজেকে সামলে ধুতির উপরে একটা ফতোয়া গলিয়ে বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। পুনরায় সব হারিয়েও ছেলের জন্য তার গর্বে, তৃপ্তিতে, বুকটা ভরে উঠল।

পরদিন থেকে কুসুম আর রঘুদের বাড়িতে আসে না। রঘুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। চার পাঁচদিন জ্যোতিবাবুরা রঘুদের বাড়িতে ছিলেন। তাই ক-দিন বাড়িতে যথেষ্ট হৈ হুল্লোড় ছিল। কিন্তু তারা সবাই চলে যাওয়ার পর বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। তরুবালারও যেন সময়ই কাটে না। তার মনে হল প্রতিটি দিন অযথা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সেদিন কুসুমকে দেখেই তরুবালার ধারণা হয়েছিল কিছু একটা হয়েছে। এই কদিন তরুবালা ঘাপটি মেরে বসেছিলেন রহস্যটা কি জানার জন্য। কিন্তু একটা সপ্তাহ পরেও যখন কুসুম এলো না তখন আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি রঘুকে ডেকে বললেন 'রঘু, যা তো বাবা, কুসুমকে ডেকে নিয়ে আয়।'

রঘু চৌধুরী বাড়িতে যখন গেল তখন পড়ন্ত বিকেল। ইদানীং রঘু কারও বাড়িতেই খুব একটা যায় না। বাড়ি, স্কুল ও খেলার মাঠেই তার জীবন। চৌধুরী বাড়িতে রঘু যেতেই কুসুমের মা ডাকলেন, 'আরে রঘু, আয় আয় বাবা, বোস।'

'মামি কুসুম কোথায়?'

'কুসুম! সে তোদের বাড়িতে নেই?'

'না মামি। সে তো আজ এক সপ্তাহ হল আমাদের বাড়িতে যায় না।'

সরোজীনিদেবী অবাক হয়ে তাকালেন রঘুর দিকে। 'বলিস কিরে - কুসুম তোদের বাড়িতে যায়নি? সাত দিন! ঠিক শুনছি তো কানে? যে মেয়ে তোদের বাড়িতেই বড় হল সে তোদের বাড়িতে যায়নি? দাঁড়া দেখছি।'

সরোজিনী আঁচলে হাত মুছে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ডাকলেন, 'কুসুম - কুসুম -।' এক ঝাঁক বাচ্চা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা এখানে।'

সরোজিনী এগিয়ে এসে রঘুকে বললেন, 'ঐ তো কুসুম পুকুর পাড়ে জামগাছের তলায়।' রঘু কাছে যেতেই কুসুম ছুটে এল। কুসুমের মুখের হাসিটাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল সেও রঘুদের অভাব কতোটা অনুভব করছিল। হেসে আরও কাছে গিয়ে রঘু জিজ্ঞেস করল, 'কিরে কুসুম, তুই আমাদের বাড়ি যাস না কেন?'

'তোর ঐ অসভ্য ভাইগুলির জন্য যাই না।'

'ওরা তো দুই দিন হল চলে গেছে। তুই জানিস না?'

'জানি।'

'তাহলে যাস না কেন?'

কুসুম কোন উত্তর দিল না। কামরাঙা গাছের পাতা ছিঁড়ে সে দাঁতে চিবোতে লাগল। দুদিকে পুকুর মাঝখানে কচি সবুজ ঘাসে ভরা পাড়। সাদা বকেরা পা ডুবিয়ে ধ্যানে বসে আছে পুকুরের জলে। গরুর পালকে হিন্দিতে গালি দিচ্ছেন

বুম্বাই ফেরত উষাকাকু। তিনি রেগে গেলে গরু, ছাগল, মানুষ সবার সাথেই হিন্দি বলেন। গরুর পালকেও গালি দিচ্ছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ না হয়ে ঘরে ফেরার জন্যে। দুজনে হেঁটে হেঁটে রঘুদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

'কিরে কথা বলছিস না যে?'

'কি বলব?'

'আমাদের বাড়ি আসিস না কেন?'

প্রশ্নটা বারবার এড়িয়ে গেলেও অবশেষে সলজ্জভাবে বলেই ফেলল কুসুম, 'তোকে দেখলেই আমার লজ্জা করে।'

'কেন?'

'তুই কেন বলেছিলি আমাকে – ?'

কুসুমের না বলা কথাটা রঘু অনুমান করতে পারল, 'ও সে কথা, এ কথা না বললে ঐ বাঁদরগুলি তোকে ছাড়তো? তাই তো তোকে বাঁচাতে মিথ্যে কথাটা বলেই ফেললাম।'

'মিথ্যে কথা!' কুসুম যেন আকাশ থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়ল। রঘুর চাইতে কুসুম বছর দেড় দুয়েকের ছোট। কিন্তু কুসুমের মনের বয়েস রঘুর চাইতে দশ বছরের বড়। কুসুম তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, কিন্তু রঘু সে তুলনায় নিতান্তই ছেলেমানুষ। চলতে চলতেই রাস্তার মাঝখানে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল কুসুম।

'কিরে আবার দাঁড়িয়ে পড়লি যে? মা তোকে ডেকেছে।'

'আমার ভাল্লাগছে না রঘুদা। তুই যা। পিসিমাকে বলবি, আমি কাল যাব।'

'না এক্ষুনি যেতে হবে মা বলেছে।'

'না আমি আজ যাব না, কিছুতেই যাব না।'

কুসুম নিজের বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। রঘু কুসুমকে এক হ্যাঁচকা টানে কাছে এনে চেপে ধরল। কুসুম ক্রমাগত জোরাজুরি করছিল ছাড়া পাওয়ার জন্য। কিন্তু রঘু কোন গুরুত্বই দেয়নি। যদিও এ দৃশ্য নতুন নয়। মারামারি, হুড়োহুড়ি, মান অভিমানের পালা দুজনের মধ্যে প্রায়ই লেগে থাকে। কিন্তু আজ কুসুমের একটু অন্যরকম লাগছিল। যে লজ্জা এতোদিন কুসুমকে ছুঁতে সাহস পায়নি, তা যেন আজ হঠাৎ কুসুমের উপর জাঁকিয়ে বসল। যে ছেলেমানুষি করার জন্য দুজনেই গালি শুনতো ,তা আজ কুসুম থেকে উধাও হয়ে গেল। 'এই রঘুদা, ছাড় না ছাড় না – আমার লজ্জা করছে। সত্যি বলছি।'

'কিসের লজ্জারে তোর? খুব যেন বড় হয়ে গেছিস?'

'বড়ইতো। তুই এবার স্কুল ফাইনাল দিবি আর আমি তোর দুবছর পর। তুই যদি বড় হোস তাহলে আমি তোর চাইতেও বড়। জানিস না, মেয়েরা তাড়াতাড়ি বড় হয়।'

'বড় হলে হোগে, লজ্জা পেলে পা, আমি কি করব? তবে তুই এখন আমাদের বাড়িতেই যাবি।'

'না আমি আর তোদের বাড়িতে যাব না।'

'কেন?'

'তুই তখন কেন বললি মিথ্যে কথা বলেছিস তোর ভাইদের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে?'

'কি মিথ্যে বলেছি?'

কুসুম আর কিছু বলল না। চুপ করে রইল। রঘু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কুসুমকে ছেড়ে দিল। তার মানে সত্যি কথা বললে কুসুম খুশি হোত? রঘুর ভেতরটা যেন ধরাস ধরাস করে কেঁপে উঠল। কুসুমের কথার অর্থ বুঝতে রঘুর অসুবিধে হয়নি। সে অবাক হয়ে বলল, 'কিরে কুসুম, তাহলে সত্যিই তুই বড় হয়ে যাচ্ছিস?

'হুঁ।'

'মা এতোদিন বললেও আমি বিশ্বাস করিনি।'

'আমার জন্যে দু-তিনটে সম্বন্ধ এসেছে মশাই। যে কোন দিন আমার বিয়ে হয়ে যেতে পারে।'

'তোর বিয়ে !' রঘুর ভয়ানক হাসি পেল। 'ধ্যুৎ তোকে আবার কে বিয়ে করবে খেঁদি, বুচি।'

'কি বললি আমি ইয়ে-। হাসবি না রঘুদা একশ দাঁত মেলে? তোর সাথে আর কথা বলব না আমি।' কপট রাগ দেখিয়ে কুসুম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু রঘু ডাকতেই আবার দাঁড়াল।

'সত্যি বলছিরে মা বলে দিয়েছেন, বাড়ি থেকে বেরুবি না কুসুম, বড় ছেলেদের সাথে মিশবি না। তোর সাথেও মিশব না আমি, যা তুই।'

রঘু খানিকক্ষণ চুপ মেরে রইল। কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় তারা দাঁড়াল। সেই সাতসকালে মুড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল রাধাবোষ্টমী। সে মুড়ি বেচে ফিরছে তিনসন্ধ্যেবেলা। ওদের দেখে বুড়িও দাঁড়িয়ে পড়ল। ফোঁকলা দেঁতো হাসি দিয়ে বলল বোষ্টমী, 'কি রে কেষ্টা, শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন হল? এই করে হবে না ঠাকুর, এই করে হবে না।' বোষ্টমী হঠাৎ পদাবলী কীর্তনের সুরে গান গেয়ে নাচতে শুরু করে দিল। রাধাবোষ্টমীর স্বরচিত পদাবলী ও তার সাথে অঙ্গাভঙ্গি প্রায়শই শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু না শুনে পালানোর এখন আর উপায় নেই। বুড়ি তখন গেয়ে চলেছে -

'বাহুতে বাহু ঢালি কহ কথা ওরে কানাই।
নয়নে নয়ন রাখ
শরীরে শরীর
অঙ্গো মোর লেগেছে আগুন
অকালে ভ্রমর করে গুন গুন

আ লো মরি মরি পরাণে বাজে মোর প্রেমের সানাই।
বাহুতে বাহু ঢালি কহ কথা ওরে কানাই।'

রঘু বুড়িকে ঠেলে বিদেয় করল। মনে মনে ভাবল, এই করে বলেই বুড়ির সারাটা দিন মাঠে মারা যায়। অন্যরা যখন মুড়ি বেচে দুপুরের মধ্যে বাড়ি ফেরে, সেখানে বোষ্টমীর হয় বিকেল। তবে কিই আর করবে বুড়ি, আপন বলতে তো আর কেউ নেই। ফলে যেখানেই যায় ওর আমুদে স্বভাবটা বজায় রেখে দুঃখ ভুলে যেতে চায়। এদিকে কুসুম লজ্জা পেয়েছে ঠিকই কিন্তু ওর তানপুরায় যেন ঝংকার তুলে দিয়ে গেল রাধাবোষ্টমী। আনমনা রঘুকে কুসুম জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছিস, রঘুদা?'

'ভাবছি তোর বিয়েটা কি করে আটকানো যায়। দাঁড়া মাকে বলব সবকিছু, দেখিস মা বাবা মিলে মামা ও মামিকে একদম টাইট্ করে দেবে। বিএ পাস করার আগে যেন তোর বিয়ে না হয় সে ব্যবস্থা পাকা করে দেব।'

'বিয়ে আটকে দিবি? সে কি! মেয়েরা বড় হলে তো বিয়ে হবেই, না হলে আমার কি লাভ রঘুদা?

'তোর লাভ মানে, তোর আবার লাভ ক্ষতি কি রে?'

'মেয়েদের সুপাত্রে বিয়ে হয়ে গেলেই তো লাভ। মেয়েরা তাই চায়। আর তুই হনুমান আমার বিয়ে ভেঙে দিতে চাস?'

'আচ্ছা তোরা তো ব্রাহ্মণ, আমাদের সাথে তোদের সম্বন্ধ হয়?'

কুসুম হেসে উঠল রঘুর কথা শুনে। মুচকি হেসে 'জানি না' বলে ছুটে গিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। তরুবালা কুসুমকে দেখে কোন কথা বললেন না। বাসনগুলি ধুয়ে ধুয়ে পুকুর পাড়ে বাঁশ দিয়ে বানানো যে ঘাট আছে তার উপর রাখছিলেন। কুসুম পাশে গিয়ে বসে বাসনগুলি গুছিয়ে রাখতে শুরু করল। 'আমার উপর রাগ করেছো পিসিমা?'

তরুবালা ছাই দিয়ে হাতা খুন্তিগুলি ঘষে আঁশটে তেল পড়া দাগ তুলতেই ঝক্ ঝক্ করে উঠল। গায়ে পড়ে কুসুমই কথা বলল, 'তুমি এতো সুন্দর বাসন মাজ, আমার মা কাকিমারা তোমার মতো পারে না।'

'সাতদিন পর পিসিমার কথা মনে পড়ল তোর ডাইনি?'

কুসুম চুপ মেরে গেল। উত্তর না পেয়ে তরুবালা বললেন,'পিসিমা মরে গেলে শান্তি পাবি হতভাগী?' তারপর একটু অপেক্ষা করে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে পার্থ পরমার্থ তোকে কিছু বলেছে?'

এবারও চুপ করে রইল কুসুম, কোন কথাই সে ভয়ে বলতে পারল না। তরুবালা বাসনগুলি গুছিয়ে হাতে নিলেন, আদ্ধেক বাসন কুসুমও নিল। 'শোন কুসুম, আমিও তো মেয়ে, তোর মুখ দেখেই আমি সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম কিছু একটা হয়েছে। কিরে কিছু বলছিস না যে, রঘু তোকে কিছু বলেছে?'

'না – না পিসিমা রঘুদা কিছু বলেনি।' দ্রুত আপত্তি জানাল কুসুম।

'তাহলে পার্থ পরমার্থ বলেছে?'

কুসুম মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে তরুবালা জানতে চাইলেন, 'রঘু প্রতিবাদ করে ওদের কিছু বলেনি?'

'হ্যাঁ রঘুদাই তো অনেক কথা বলল ওদের। তাছাড়া আমিও যা খুশি তাই বলেছি।'

তরুবালা হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। তার মনে হল নিষ্পাপ দুটি কিশোর মনে ঘৃণ্য কিছু জীব এসে যেন বিষ ঢেলে দিয়ে গেল। তিনি কাপড় ছেড়ে ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন। ঠাকুরের ভোগ দিয়ে নীরবে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন ঠাকুরের সামনে। তারপর কাঁসার ঘন্টা টানা বাজাতে লাগলেন। কুসুম শঙ্খ ফুঁ দিয়ে এলাকাটা মুখরিত করে তুলল। তরুবালা মাটির ধূপদানিতে শুকনো নারিকেলের ছোলা দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে ঘরের চারিদিকে, তুলসী তলায় ঘুরে ঘরে এলেন। ধূপের গন্ধে চারিদিক যেন পবিত্র হয়ে গেল। তারপর প্রসাদ নিয়ে বাইরে আসতেই রঘু আগে হাত এগিয়ে দিল। তরুবালা রঘুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে আগে কুসুমকে দিলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'কোথাকার কে এসে তোকে কি বলল আর তুই আমাদের ভুলে গেলি কুসুম?'

'এই তো আমি, তুমি ডাকতেই চলে এলাম।'

'ওরে বাবা তোকে এখন ডেকেও আনতে হবে?'

'না পিসিমা, মা বলেছে, এখন তুমি বড় হয়েছ, বাড়ি থেকে যখন তখন বেরুবে না।'

'তাই নাকি! কিরে তোর কি বিয়ের সম্বন্ধ চলছে?'

রঘু বলল, 'হ্যাঁ মা কুসুমের বিয়ের কথা চলছে। ওর বিয়ে হয়ে যাবে।'

ভ্রূ কুচকে তাকালেন তরুবালা, 'কিরে কুসুম, তোর মা আমাকে তো কিছু বলেননি?'

লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল কুসুমের। দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল সে। রঘু মাকে বলল, 'ও মা, কুসুমের বিয়ে হয়ে গেলে কি করে হবে? এতো ছোট মেয়ের বিয়ে হয়? কুসুমের শুক্লা পিসির যে বিয়ে হল মাত্র কদিন আগে। শুক্লা পিসির তো অনেক বয়েস। সে তুলনায় কুসুমের বয়স আর কত? তুমি মামা মামিকে বুঝিয়ে বল, কুসুম পড়াশোনায় যখন ভাল তখন বিএ পাশ করুক না, তারপর বিয়েটা হোক।'

তরুবালা হাসলেন, 'ওমা আমাদের কুসুম তাহলে বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি তো খেয়াল করিনি। ঠিক আছে রঘু তুই পড়তে যা।' রাতের খাওয়া দাওয়ার পর তরুবালা কুসুমকে নিয়ে পড়লেন। অনেক রাত ধরে সাতদিনের জমানো সব কথাই বলা হলে কুসুমকে পাশে নিয়ে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

৭

রঘু ভাল ছাত্র, ভাল ছেলেও বটে। তবু রঘুর দুষ্টুমিতে বারবার বিব্রত হতেন শান্তিবাবুরা। প্রায় প্রতিদিন একটা নালিশ রঘুর নামে আসত। মাঝে মাঝে এই নিয়ে রঘুকে মারধরও করেছেন শান্তিবাবু। তাতে সাময়িক বিরতি দিলেও কদিন পর আবার পুরানো ফর্মেই দুষ্টুমি শুরু করতো রঘু। রঘুদের একটা পুরো দল ছিল প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন ছেলেমেয়ে মিলে। তারা সবাই রঘু ও রেণুকে দলনেতা বলে মানতো। যদিও রেণুরও আনুগত্য ছিল রঘুর প্রতি। রেণু সব চাইতে ভাল কুস্তি লড়তে পারতো। মেয়ে হলেও মারপিটে সবসময় নেতৃত্ব দিত রেণু। অন্য পাড়ার ছেলেমেয়েদের সাথে ঝগড়া হলে রেণু সবার আগে চলে আসতো। রেণুকে এই পাড়া এবং অন্য পাড়ার ছেলেমেয়েরা সবাই ভয় পেতো।

রঘুদের বাড়ির অনতিদুরেই ভট্টাচার্য্যদের বাড়ি। ঐ বাড়ির লোকেরা আশেপাশের লোকদের সাথে তেমন মেশে না। ঐ বাড়ির ছেলেমেয়েগুলিও তেমনি। বাড়ির দুই ছেলে খগেশ ও ভবেশকে সবাই যমের মতো ভয় পায়। বিশেষ করে ভবেশ যেমন বিশালাকায়, তেমনি বদরাগী। তাদের বাড়িতে একটা জাম্বুরা গাছ আছে তার ফল অত্যন্ত সুস্বাদু। রঘুরা পরিকল্পনা করল ঐ বাড়িতে লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাতে জাম্বুরা চুরি করবে। পরপর দু-তিন বার বৈঠক হল কিভাবে নিখুঁতভাবে চুরি করা যায়। দলে সব চাইতে ভাল গাছ বাইতে পারে সমর। ফলে তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হল গাছে ওঠার। নিচে থাকবে রেণু ও রঘু. বিশাল কড়ই গাছ এবং আম গাছের আড়ালে। দুর থেকে সুজিত লক্ষ্য রাখবে কেউ এলো কিনা। যদি কেউ চলে আসে তখন কি হবে? তারও সমাধান হল। জাম্বুরা গাছের নিচে ভটরা একটা গর্ত করে রেখেছে। বেশ বড়সর গর্ত। ঐ গর্ত থেকে মাটি নিয়ে ওরা মাটির ঘর তৈরি করছে। গর্তটা বেশ গভীর এবং জল মাটি পা দিয়ে মাড়িয়ে থক্থকে কাঁদা করে রেখেছে।

পরিকল্পনা হল যদি কেউ এসে পড়ে, সুজিত দুর থেকে দেখে সংকেত দেবে আর তখন রঘু ও রেণু তৈরি হবে। এদিকে বাড়ির মালিক বা অন্য কেউ যখন গাছের তলায় এসে সমরকে ধরতে চাইবে তখন সমর বাধ্য ছেলের মতো নাগালের মধ্যে আসবে। যখনই এক বা একাধিক লোক সমরকে ধরতে চাইবে তখন ওদের ধাক্কা দিয়ে গর্তের কাঁদায় ফেলে দেওয়া হবে। তখন সমর লাফিয়ে নিচে পড়লেই দে ছুট - দে ছুট। কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না। কুসুমকে কিছুই জানানো হয়নি,

কারণ ওরা ভটদের আত্মীয়, পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

সে রাতে মধ্যাকাশে যখন চাঁদ তখন কথানুসারে চুপি চুপি ভটদের বাড়ির জাম্বুরা গাছের তলায় চলে গেল তারা। সমর কালবিলম্ব না করে গাছের মাথায় তিন লাফে উঠে গেল। রঘুও কড়ই গাছের তলায় চুপ করে বসে রইল। রেণু ফাঁকে সাহস করে ভট্দের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। তাদের বাড়িতে তখন হৈ হুল্লোড় চলছে। বাচ্চা ও মেয়েরা সব পিকনিক করছে তার খাওয়া দাওয়া চলছে। রেণু এসে খবর দিতেই জাম্বুরা পারা শুরু হল। গাছের পাতার ঝোপের তলায় বেশ অন্ধকার। বারবার জাম্বুরা হাতে না পড়ে নিচে পড়ে 'ধুপ - ধাপ' করে শব্দ হল। কিন্তু কোন অসুবিধা হল না। কেউ টের পায়নি, ঝামেলা ছাড়াই চুরি চলছিল।

হঠাৎ আমগাছটার গোড়ায় গলা খাঁকারির আওয়াজ শুনে পুরো দলটাই এমনভাবে চমকে উঠল যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে গেল। রঘু ও রেণু দুজনেই তৎপরতার সাথে লুকিয়ে গেল গাছের আড়ালে। কিন্তু সমর কিছুই টের পেল না। সে মনের সুখে তখনও ডালে ডালে ঘুরছে। রঘু উঁকি দিয়ে দেখল - লোকটার আকার দেখে তার ভবেশ বলেই মনে হল। অবশেষে দুজনেই বুঝল এটা নির্ঘাৎ ভবেশ। খাটো যজমানি গামছা পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করছে রেণুর সামান্য দূরে। ভবেশ জাম্বুরা গাছের ডাল নড়তে দেখে এগিয়ে এল। গাছে কেউ উঠেছে কিনা সন্দেহ করে ডাকল, 'কে রে গাছে?' কিন্তু কোন উত্তর এল না। তার কর্কশ শব্দে রেণু রঘু ঘাবড়ে গেল। ভবেশ দু-তিন বার ডেকেও যখন উত্তর পেল না তখন ধমকে উঠল। গাছের মগডাল থেকে ছোট্ট লাজুক ভীত উত্তর এল, 'আমি।'

ভবেশ হাঁকল 'আমি কে?'

সমর বারবার শুধু বলতে লাগল, 'আমি।'

ভবেশ বলল, 'ঠিক আছে, নিচে নেমে আয়। তাহলেই বুঝব আমিটা কে।'

সমর ধীরে ধীরে নিচে নামছে তবে এখনো নাগালের মধ্যে আসেনি। আর একটু নেমে আসুক তাহলেই লাফিয়ে পড়ে পালাতে পারবে। রঘু রেণু দুজনেই পজিশান নিয়ে নিল। ওরা নিজেদের হৃৎপিন্ডের প্রতিটি ধুকপুক যেন শুনতে পাচ্ছে। শুকনো পাতায় সামান্য সতর্ক মর্মর ধ্বনি বেজে উঠল। লক্ষী পূর্ণিমার রাত হলেও গাছের তলার অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না সমর ঠিক কোথায় আছে। যখন মনে হল সমর সঠিক জায়গায় আসতে পেরেছে আর দেরি করেনি রঘু রেণু। ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়ে ভবেশকে গর্তের কাঁদায় ফেলে দিল। ভবেশ আচমকা ধাক্কা খেয়ে বেশ চিৎকার করে চিৎপটাং হয়ে গর্তে পড়ে গেল। এদিকে সমরের লাফিয়ে পড়ে পালানোর কথা ছিল কিন্তু সে তো ওদের পাশে পালালো না। মুহূর্তকয়েক পরে গর্তে আরও একটা কিছু পড়ার শব্দ হল এবং সাথে সাথে ভবেশের আর্তনাদ কানে এল রঘুর।

রঘু ও রেণু ছুটতে ছুটতে লুকানোর পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায় সুপারি বাগানে

ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। সুজিত ওখানে আগে থেকেই ছিল। সুজিতকে দেখেই রেণু রেগে মারতে গেল। 'ভবেশ যে এসেছে তুই আমাদের সিগ্‌ন্যাল দিলি না কেন? সুজিত অকপটে স্বীকার করল, 'আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম রেণু।'

রঘু বলল, 'তুই ভয় পেয়েছিলি এতদূর থেকে? আহ্‌মক কোথাকার। আমাদের আগেই তোকে ধরে ফেলতো নাকি?'

হঠাৎ ভট্‌ বাড়িতে অনেক মানুষের চিৎকার শোনা গেল, 'ধর, ধর - ।'

একটু পরে সমর এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। তার সারা গায়ে কাঁদা। সমর কথা না বললে তাকে চেনাই যেত না। সমর তড়িঘড়ি করে বলল, 'রঘু তাড়াতাড়ি পালা ওরা এদিকেই আসছে।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে সবাই ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। ছুটতে ছুটতে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। রঘু জিজ্ঞেস করল সমরকে, 'তুই গর্তে কি করে পড়ে গেলি সমর?'

সমর যা বলল তার সারমর্ম এই রকম। সমর খুব সাহসী ছেলে। ভবেশকে দেখে ভয় পেলেও তার মনে তখনও সাহস ছিল। সেও অপেক্ষা করছিল রঘু ও রেণু কখন ভবেশকে ধাক্কা দেবে। যেই না ভবেশ ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল গর্তে তখনই সমর গাছ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে পড়ে গেল ভবেশের ঘাড়ের উপর। এমনিতেই আচমকা গর্তে পড়ে ভবেশ খুব ব্যথা পেয়েছে তার উপর সমর পড়েছে তার ঘাড়ে। রাগে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল ভবেশ। সমর ভাবল এবার নির্ঘাৎ তাকে তুলে আছাড় মারবে ভবেশ। কিন্তু না, সে রকম কিছুই ঘটল না। সমরও প্রথম খেয়াল করেনি। পরে লক্ষ্য করে দেখল ভবেশ কোনমতে লজ্জা নিবারণের যে যজমানি গামছাটি পরেছিল, সেটা ধাক্কা খেয়ে গর্তে পড়ার সময় কোথায় কাঁদায় ডুবে গেছে। অপ্রস্তুত নির্বস্ত্র ভবেশ সেটা খুঁজতেই ব্যস্ত হয়ে রইল। সমরের দিকে নজর তো করলই না বরং সমর পালিয়ে গেলেই যেন ভবেশ বেঁচে যায়। নিজেকে লুকানোর জন্য সে কাঁদার ভেতর আরও শরীর ডুবিয়ে বসে রইল। আর সেই সুযোগে সমর পালিয়ে এল।

রঘু ও রেণুর হাসি যেন আর থামতেই চায় না। ওরা আর কথা না বাড়িয়ে সোজা চলে গেল প্রত্যেকের বাড়ি। রঘু জানালা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়তে বসে গেল। তার ঠিক দশ পনের মিনিট পরে ভবেশ ও তাদের বাড়ির চার পাঁচ জন রঘুদের বাড়িতে এল। ভবেশের এই কাঁদামাখা কিম্ভুতকিমাকার চেহারা দেখে কুসুম ভয়ে চিৎকার করে উঠল। শান্তিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার ভবেশ, তোমার এই অবস্থা কেন? কোথাও পড়ে গিয়েছিলে নাকি?'

ভবেশ কষ্টের হাসি দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ দাদা, গর্তে পড়ে গিয়েছিলাম। আপনাদের পুকুরে একটু স্নান করব?'

'তা কর না কি অসুবিধে।'

ভবেশের দাদা খগেশ আমতা আমতা করে বলল, 'দাদা রঘুকে দেখছি

না। ওকে একটু লণ্ঠনটা ধরতে বলুন না খুব অন্ধকার।'

শান্তিবাবু অবাক হলেন পূর্ণিমার রাতে অন্ধকার শুনে। তবুও তিনি রঘুকে ডেকে ঘরে চলে গেলেন। তরুবালা তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছেন। রঘু লণ্ঠন নিয়ে বাইরে আসতেই ওরা সবাই চমকে উঠল। রঘুর শরীরের কোথাও কাঁদার চিহ্ন নেই। রঘু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি ভবেশকাকু কেন ডেকেছো বল?'

'না তেমন কিছু না। তোর লণ্ঠনটা একটু দে তো বাবা, চান করে আসি।'

'তোমাদের এতো বড় পুকুর আছে তবুও আমাদের পুকুরে যাবে কেন কাকু?'

'তাও ঠিক। কি মনে করে তোদের এখানে চলে এলাম? এই দাদা তাহলে চল নদীতেই চলে যাই।'

'হ্যাঁ চল।'

ওরা চলে গেল নদীতে, রঘুর আর পড়া হল না। রেণু আর সুজিত প্রসাদ খেতে একটু পরেই চলে এলো। তরুবালা কুসুমকে সাথে নিয়ে ওদের প্রসাদ দিলেন। খিচুড়ি দিতে গিয়ে তিনি রঘুর চোখের দিকে তাকালেন।

'কিরে রঘু ওরা কেন এসেছিল?'

রেণু রঘু দৃষ্টি বিনিময় করল দ্রুত। রঘু গাল ফুলিয়ে বলল, 'তুমি সবকিছুতেই আমাকে সন্দেহ কর মা।'

'তোকে সন্দেহ করেছি কে বলল?'

'না করলে কেন জিজ্ঞেস করছ ওরা কেন এসেছিল? তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ সন্ধে থেকে আমি পড়ছি।'

'ঠিক আছে আগামিকালকে সকালেই ভট্ গিন্নির থেকে খবর আমি পেয়ে যাব। তখন তোমাদের সাথে কথা হবে। কি বলিস রেণু?'

এই পাড়ার ছেলেদের উপর রঘুর নিয়ন্ত্রণ অপরিসীম। কিন্তু তার সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিল নতুন একটি ছেলে। তার নাম শংকু। সে গৌহাটি থেকে এখানে এসেছে কয়েকদিন হল। তার কথা বলার ধরন, চলাফেরা, সবই আলাদা। এমনকি রঘুরা যে সব গতানুগতিক খেলা খেলে, যেমন কবাডি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, বন্দী তার সাথে শংকুর খেলাগুলির মিল নেই। শংকুর খেলাগুলি নতুন ধরনের। ফলে ছেলেমেয়েরা সবাই শংকুর প্রতি আকৃষ্ট হল এবং তার কর্তৃত্ব মেনে নিল। রঘু মন মরা হয়ে একা কয়েকদিন ঘুরে বাড়িতে বসে গেল। এমনকি রঘুর একান্ত অনুগত সুজিত সমর পর্যন্ত শংকুর দলে মিশে গেল। তবে রেণু যায়নি রঘুকে ছেড়ে। রেণু একদিন শংকুকে বেদম মারলও বটে। তবু শংকু ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়নি, বেহায়ার মতো মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ফলে রঘুর প্রতি এখনও যাদের আনুগত্য আছে বা দোটানায় ছিল তারাও হতোদ্যম হয়ে পড়ল।

একদিন রাতে শিকারের গল্প পড়তে পড়তে রঘুর মাথায় একটা বুদ্ধি

এল। পরদিন সকালেই গাভুকে পীড়াপিড়ি করতে লাগল সে তীর ধনুক বানিয়ে দেওয়ার জন্য। গাভুর পিছনে ঘুরঘুর করে দশ বারোটা ধনুক ও তীর জোগাড় করল। আর এতেই মহা খুশি হয়ে ছুটে গিয়ে রেণুকে বলল, 'রেণু চল, তুই আর আমি হরিণ শিকারে যাব, আমরা শংকুর ওসব বাজে খেলা খেলব না।'

একটু চমকে উঠে রেণু বলল, 'হরিণ শিকার! কি করে হবে রঘু? আমাদের তো বন্দুক নেই?'

'বন্দুক না থাকলে কি হয়েছে, তীর ধনুক তো আছে।'

'তীর ধনুক! কোথায় পেলি?'

'আয় না দেখবি চল।'

কুসুমও পাশে ছিল। তারা তিনজন ছুটে গেল পাট খেতের ভিতর। রঘু তার সমস্ত মালামাল ঐ পাটের খেতে সুরক্ষিত রেখেছে মা বাবার নজর এড়ানোর জন্য। জলজ্যান্ত তীর ধনুক চোখের সামনে দেখে রেণুতো লাফিয়ে উঠল। তিন জনে পাট খেতের ভিতরেই একটা মিটিং হল। মিটিংয়ে স্থির হল ওরা কাউকে কিছুই জানাবে না। তিনজন মিলে পরশুদিন স্কুল থেকে এসেই শিকারে বেরিয়ে পড়বে। আগামিকালের মধ্যে আরও কিছু জিনিস জোগাড় করতে হবে। যেমন কয়েকটা টর্চ, কিছু চিঁড়া, গুড়, দা, কুড়োল ইত্যাদি।

তারা লুকানোর চেষ্টা করলেও ঘটনাটা চাপা রইল না। পরদিন সকালেই শংকুর দল ছেড়ে প্রায় সবাই রঘুর কাছে চলে এল। এমনকি অসহায় শংকুও সন্ধ্যার দিকে রঘুর নেতৃত্ব মেনে নিল। রঘু এদের প্রথম গুরুত্ব না দিলেও পরে রাজার মতোই ওদের ক্ষমা করে দিল। অবশ্য শংকুকে পেয়ে রঘুর লাভও হল। কিছু নতুন আইডিয়া পেয়ে তার শিকারের পরিকল্পনাটা নিখুঁত করে নিতে পারল। পরদিন স্কুল থেকে এসে ছেলেমেয়েরা সব তীর-ধনুক, বর্শা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে গারদটিলার জঙ্গলে চলে গেল। ইদানীং বাঘের খুব একটা উপদ্রব নেই বটে তবু মাঝে মাঝে বন্য জন্তুরা এদিক দিয়েই লোকালয়ে চলে আসে।

বিকেলের দিকে তিন চারটে গাছের উপর ছেলেমেয়েরা সব চড়ে বসল। গাছগুলির সামনে ফাঁকা জায়গা আছে, তেমন ঘন জঙ্গল এখানে নেই। ছেলেরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল কখন হরিণ আসবে। এদের মধ্যে কয়েকজন আছে ভীতু তারা সন্ধ্যার আগেই গাছ থেকে নেমে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু তারপরও কুড়ি, বাইশজন ছেলে ও দুটি মেয়ে রেণু ও কুসুম অধীর আগ্রহে হরিণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। শংকু, সমর, নকুল, বিজয় ও রঘুদের একাগ্রতা দেখার মতো। তারা তীর ধনুক নিয়ে অর্জুনের মতো লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্যরা অপেক্ষা করতে করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। কেউ কেউ চিঁড়া গুড় খেয়ে শেষ করে ফেলল, তবু হরিণ এলো না বরং চিঁড়া খেয়ে ওদের ভয়ঙ্কর জল তেষ্টা পেল। জল ওরা নিয়ে আসেনি ফলে তেষ্টা বুকে নিয়েই ঠায় বসে থাকতে হল।

অবশেষে হঠাৎ একটা আশার আলো জ্বলে উঠল। শংকু সংকেত করল

হরিণের ঝাঁক আসছে। টান্ টান্ হয়ে সবাই অপেক্ষা করে রইল কখন হরিণ আসবে। কিন্তু কোথায় হরিণ? প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে হরিণের কোন খোঁজ নেই। তখনি একটা শেয়াল তাদের সামনে এসে উপস্থিত হল। শেয়ালটা হঠাৎ এতগুলি মানুষের বাচ্চা গাছে গাছে দেখে থমকে দাঁড়াল। হাল্কা অন্ধকারে শেয়ালের চোখ দুটি টর্চের মতো জ্বলে উঠল। রণজিৎ 'হরিণ - হরিণ' বলে চিৎকার করে উঠল, অমনি সবাই শেয়ালকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটা তীরও কল্পিত হরিণের দিকে গেল না। সব ছুটে গেল এদিক ওদিক। এমনকি দুয়েকটা তীর দূরে যাওয়া তো দূরের কথা, হাত থেকে ছুটে না গিয়ে হাত ফস্কে পড়ে গেল গাছের নিচে। মহাবীর শংকুর অবস্থা আরও করুণ। সবাই যখন শেয়ালকে হরিণ বলছে তখন শংকু 'বাঘ -বাঘ' বলে চিৎকার করতে লাগল। সে এমন ভয় পেল যে তীর মারবে কি হাত থেকে ধনুকটাই তার খসে পড়ে গেল। শেয়াল বেচারা বিন্দুমাত্র ভয় পেল বলে মনে হল না। সে বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর তিড়িং বিড়িং করে দুই লাফ দিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা হয় হয়। অভিভাবকরা পোশাক পরে তৈরি হচ্ছেন বাজারে যাবেন, কিন্তু টর্চ নেই। টর্চের খোঁজ শুরু হতেই বাচ্চাদের খোঁজা শুরু হল। খেলার মাঠ, নদী চর, বাড়ির কোথাও ছেলেদের কোন খোঁজ না পেয়ে অভিভাবকরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কোন কোন বাড়িতে কান্নাকাটিও শুরু হয়ে গেল। এক সাথে এতগুলি বাচ্চা হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার কথা নয়। রঘুদের খেলার সাথী যারা ভয়ে পালিয়ে এসেছিল তাদের ডাক পড়ল শান্তিবাবুর বাড়ির উঠোনে। তাদের একজন ধমক খেয়ে বলে দিল রঘুরা কোথায় আছে। অভিভাবকরা আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে এখনও ওরা ফিরছে না। জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। শ্বাপদেরা রাত হলেই এই অঞ্চলে চলে আসে। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা তখন দল বেঁধে ওদের ফিরিয়ে আনতে টিলা লুঙ্গা পেরিয়ে ঐ দিকে যেতে লাগলেন।

এদিকে হতাশ রঘুর দল হরিণ না পেয়ে রাতটা গাছেই কাটিয়ে দেবে ভাবল। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস রাত হলেই হরিণ নিশ্চিত এদিকটায় আসবে। তখন দু-চারটে হরিণ মেরে বাড়িতে নিয়ে গেলে মা বাবা সবাই খুশি হবেন। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। সবগুলি ছেলেমেয়ে গাছেই ঠায় বসে রইল। ওরা আজ স্বাধীন। ধরা বাঁধা জীবনের নাগালের বাইরে আজ ওরা উদ্দাম। হঠাৎ রঘুর কানে টান পড়ল। রঘুর পাশে রেণু ছিল, রঘু রেণুকে ধমক দিয়ে উঠল, 'এই রেণু কানে ধরছিস কেন?' রেণু নিরুত্তর। আবার কানে হাত পড়তেই রঘু প্রচন্ড রেগে ঘুরতেই দেখে কান ধরে টানছেন চানমণি কাকা। নিচে রঘুর বাবা ছাড়াও দাঁড়িয়ে রয়েছেন এলাকার সমস্ত অভিভাবকেরা। এক এক গাছের নিচে এেকেক জনের উপর চলতে থাকল বেদম মার। রঘু উপর থেকে তার সৈন্যদলের এই অপমান স্বচক্ষে দেখল। কিন্তু প্রতিবাদের কোন ভাষা নেই। সাক্ষাৎ যমের মতো নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শান্তিবাবু। অসহায়ভাবে নিচে নেমে এল রঘু, রেণু ও কুসুম। শান্তিবাবু ও রেণুর বাবা হাতের

লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত হলে অন্যরা বাধা দিলেন। শান্তিবাবুকে বুঝিয়ে বিরত করে একজন বললেন, 'এখানে মেরে কি লাভ? আগে বাড়ি যাক কথা বলুন তাদের সাথে তারপর মারুন।' সন্ধ্যা প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে রঘুদের পুরো দলটা বাবা, বড় ভাই বা কাকা, মামাদের ভর্ৎসনা, গঞ্জনা, থাপ্পর চোপ্পর খেতে খেতে বাড়িতে এসে পৌঁছল।

যাই হোক তারপর দীর্ঘদিন এলাকার সমস্ত ছেলে মেয়েদের উপর নানা রকম বিধি নিষেধ আরোপ করা হল। খেলতে যাওয়ার সময়ও অনেক কমিয়ে দেওয়া হল। রঘু সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিল বটে মার প্রাণপণ চেষ্টায়, কিন্তু তার কীর্তির এখানেই শেষ হল না। একটা শেষ হলেই নতুন ভাবনা আসে আবার, তবে আর যাই হোক হরিণ শিকারের ঘটনা রঘু ও তার বন্ধুদের মনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

রঘু যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তখন তার মাথায় এরোপ্লেন শব্দটা পোকার মতো ঢুকে গেল। গরুর জন্য ঘাস তুলতে গেলে মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে শোঁ করে চলে যায় প্লেন। ইস্ রঘুর যদি একটা থাকতো, এই কথাটা ভাবলেই রঘুর মনটা লাফিয়ে উঠে। রঘুদের ঝিলের পাশে একটা পাট খেত আছে। সেই পাট খেত রঘুদের বাড়ি ও ঝিলের ঠিক মাঝখানে। রঘু স্কুল থেকে এসে প্রতিদিন পাট খেতের ভেতর দিয়ে ঝিলের পাড়ে চলে যেত। পাট খেতের ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে যেতে হয়। অদৃশ্য বোলতার বাসায় নাড়া পড়লেই বিষাক্ত বোলতা ঝাঁপিয়ে পড়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। তাছাড়া বিষাক্ত সাপের চলাফেরাও বেশি থাকে এই পাটের খেতে।

সেখানেই আপন মনে গাছের ডাল, বাঁশ, কাগজ ইত্যাদি জুড়ে [illegible] এরোপ্লেন বানাতে লাগল রঘু। এটা নেহাৎই খেলাচ্ছলে করা। এরোপ্লেন বানিয়ে বন্ধুদের খুব ভড়কে দেওয়া যাবে। কাগজে আঠা লাগিয়ে সেটাকে কিছুটা এরোপ্লেনের মতোই দেখতে বানিয়ে ফেলল সে। ঝিলের পাড়ে একটা গামাই গাছ আছে। যে গাছটার মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু কান্ড থেকে কয়েকটা ডাল ঝিলের উপর ডানা মেলেছে। রঘু সবচাইতে উঁচু ডালটার মধ্যে তার এরোপ্লেনটাকে বেঁধে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। দড়ির শেষ অংশ এরোপ্লেন, ডাল হয়ে মাটিতে অন্য একটা গাছের গোড়াতে বেঁধে নিল। প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ, রঘু অনায়াসে ঐ এরোপ্লেনে বসতে পারে। এই খেলনাটাতে বসে রঘু আপন মনে দোলনার মতো দোল খেত সারাদিন। বড় হয়ে সে সত্যিকারের এরোপ্লেন বানাবে সেটাও ভাবনায় ছিল। এই এরোপ্লেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না, আকাশেও পাড়ি দেওয়া যাবে না। তবু এর মধ্যে বসলে রঘুর নিজেকে অন্যরকম মনে হয়। একদিন চারিদিকে সাড়া ফেলে দেবে তার বড় বড় আবিষ্কার, সেটা ভেবে রঘু আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

রঘুর এই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় কুসুমের সন্দেহ হল। রঘু মোটেই চুপচাপ

বসে থাকার পাত্র নয়। সে খেলার মাঠে অনেকদিন ধরে যায় না, বাড়িতেও থাকে না। তাহলে সে কোথায় যায়? পরদিন রঘু তাদের নতুন রেডিও, টর্চ, কিছু তার, দা এসব নিয়ে এরোপ্লেনের কাছে এলো। তখন কুসুমও তাকে চুপিচুপি অনুসরণ করে ওখানে পৌছে গেল। কুসুম এরোপ্লেনটা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কিরে রঘুদা?'

রঘু কাজে এতই মগ্ন ছিল কুসুমকে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল। বেশ বিরক্ত হয়ে রঘু বলল, 'তুই এখানে এলি কেন? ভূতুনি কোথাকার।'

'তুই কি করছিস এটা দেখতে?'

'দেখেছিস তো? এখন দয়া করে বাড়ি চলে যা।'

'যাব। তবে এটা কি বল না?'

'এটা এরোপ্লেন। দেখতে পাচ্ছিস না?'

'এরোপ্লেন! হ্যাঁ তাইতো মনে হচ্ছে। এরোপ্লেন দিয়ে তুই কি করবি রে রঘুদা?'

'খেলব।'

'খেলবি! ইস্ কি মজা তাহলে আমিও খেলব। আমাকে নিবি?'

'এই তুই কি করে খেলবি? এই এরোপ্লেনে দুজন বসার সুবিধে নেই। একজন বসার জন্যই এটা বানিয়েছি।'

'ঠিক আছে তাহলে আমিই বসব। কি সুন্দর বানিয়েছিস রঘুদা। আমি বিকেল পর্যন্ত এখানে বসে দোল খাব।'

একি অন্যায় আবদার কুসুমের, জানাজানি হওয়ার ভয়ে রঘু তেমন কিছুই বলতে পারল না। কিন্তু তার ইচ্ছে হচ্ছিল কষিয়ে কয়েকটা থাপ্পর লাগিয়ে দেয় কুসুমের গালে। 'এই হবে না। আমি বানিয়েছি আমিই খেলব।'

কুসুম গাল ফুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে আমি এক্ষুনি পিসিমাকে বলছি তুই বাড়ির রেডিও, টর্চ নিয়ে খেলছিস।' রঘু বাধা দিয়ে বলল, 'এই কুসুম, এই কাজটা করিস না মা কালীর দিব্যি। মা শুনলে আর উপায় থাকবে না।'

'তাইলে আমাকে আগে খেলতে দিবি বল?'

অগত্যা রঘুর রাজি না হয়ে উপায় রইল না। সে নিমরাজি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে যা তবে তাড়াতাড়ি নেমে আসবি, কেমন?'

কুসুম খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক আছে।'

কিন্তু মনে মনে সে ভাবল, ঠিক আছে তো বলেছি, কিন্তু যদি ভালো লেগে যায় তাহলে আর নামবই না। রঘুদাকে একটা আচ্ছা করে গোল দেব। তারপর খুশিতে ডগমগ হয়ে কুসুম রঘুর সাথে গাছে চড়ল। কুসুম এরোপ্লেনের ভেতর চড়ে বসল খুশি খুশি মুখ করে। আকাশের দিকে তাকালেই কেমন যেন রোমাঞ্চ জাগে। ইস্ সত্যি যদি আকাশে উড়তে পারতো এটা। রঘু কুসুমকে সঠিক জায়গায় বসিয়ে আবার নিচে নেমে এল। রঘু দেশলাই বাক্সে তার লাগিয়ে কুসুমের

সাথে তখন কথা বলছে।

'কুসুম আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাল্লো -হ্যাল্লো -।' কথাগুলি এমনিতেই ওরা শুনছিল, তবু দেশলাই বাক্সে তার লাগিয়ে শব্দের অনুরণন শুনে টেকনোলজির প্রয়োগ ওরা করছিল।

'হ্যাঁ রঘুদা শুনছি, হ্যাল্লো -।'

'এরোপ্লেনটা স্টার্ট দে।'

'হ্যাঁ দিয়েছি।'

'কিরে ভয় পাচ্ছিস?'

'না না আমার খুব মজা লাগছে রঘুদা।'

'ঠিক আছে চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাব তুই আকাশে উড়ছিস।'

কুসুম তাই করল। রঘু 'রেডি ইস্টার্ট' বলেই দোল খাওয়ার দড়িটা ছেড়ে দিল। কুসুম এখন দোল খাবে মজা করে, রঘু সেদিকেই তাকিয়ে রইল। কিন্তু কোথায় কি এরোপ্লেন ঝুপ্ করে ঝিলের কচুরিপানার মধ্যে পড়ে ডুবে গেল। কুসুমের আর্ত চিৎকার আর ছলাৎ করে জলের ছিটা শরীরে এসে পড়ায় রঘুর সম্বিৎ ফিরল। সে বুঝতে পারল এরোপ্লেন সহ কুসুম জলে ডুবে গেছে। রঘু মস্ত বড় একখানা ভুল করে ফেলল, যে দড়িটা ছাড়লে দোল খাওয়া যায় সেটা না ছেড়ে এরোপ্লেন ঝোলানোর মূল দড়িটাই সে ছেড়ে দিল।

কপাল ভাল পাশেই দুজন জেলে মাছ ধরছিল, চিৎকার শুনে তারা ছুটে এল। রঘু সহ সবাই জলে নেমে ছেঁড়া ফাটা কাগজের এরোপ্লেনের ভেতর থেকে কুসুমকে বের করে নিয়ে এল। কুসুম জল ছেড়ে উপরে উঠতেই কাতলা মাছের মতো হাঁ করে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল। প্রথমে জল খেয়ে কাশলেও অবশেষে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বিস্ফারিত চোখে রঘুর দিকে তাকাল। তারপর এক মুহূর্ত দেরি না করে 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলল কুসুম। ওর কান্না কিছুতেই থামছে না দেখে রঘু এবার ভয় পেয়ে গেল।

কুসুমকে ঝিলের পাড়ে উঠিয়ে নিয়ে জেলেদের অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদেয় করল সে। কিন্তু কুসুম কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। বেচারা এতোটাই ঘাবড়ে গেছে নিজেকে আর সামলাতে পারছে না। রঘু অনেক আদর অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর কিছুটা কাজ হল। এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কুসুম। দুজনে পাট খেতের ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে লাগল। বিশাল বড় পাট খেতের সামান্য গভীরে যেতেই ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। পাটের খেত যেন দুইটি চঞ্চল কিশোর কিশোরীকে গিলে ফেলল। রঘু ও কুসুম দুজনের শরীরে ভেজা কাপড় লেপটে আছে। কুসুমের একটু অস্বস্তিও হচ্ছিল। সাধারণত কুসুম এখন চান করে উঠার সময় বুকে একটা কাপড় জামার উপর জড়িয়ে নেয়। কিন্তু তবু বাড়ি ফেরার উপায় নেই, ভেজা কাপড়ে ফিরলেই রঘুর মা ঘটনাটা আঁচ করে ফেলবেন। তখন জানাজানি হলে রঘুর কপালে দুঃখ আছে। রঘুর কোন বিপদ হোক মোটেই চায়

না কুসুম। তাই পাট খেতের ভেতর আত্মগোপন করে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

রঘু হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'কুসুম ব্যথা পেয়েছিস? কিরে কথা বল এখনও রাগ করে আছিস?'

'তুই আমার সাথে কথা বলিস না।' ঝাঁঝালো উত্তর দিল কুসুম।

রঘু হেসে বলল, 'আমি তো ইচ্ছে করে তোকে ফেলে দিইনি কুসুম। আমি তো তোকে নিষেধ করেছিলাম এখানে চড়তে। তুই-ইতো এমন জেদ ধরলি, ভয় দেখালি মাকে বলে দিবি বলে, তখন আমি কি করব বল?'

'তুই জানতিস না ওটা জলে পড়ে যাবে?'

'হ্যাঁ আমি জানতাম, তবে বিশ্বাস কর আমি ইচ্ছে করে করিনি। আসলে ভুল দড়িটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কোথায় মজা করব হঠাৎ দেখি জলে ঝুপ করে শব্দ হল।'

'তুই আমাকে চুবিয়ে মারতে চেয়েছিলি রঘুদা।' বলেই কুসুম অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে আবার কাঁদতে লাগল। রঘু কুসুমকে সবরকমের সান্ত্বনা দিতে লাগল।

'কি বলছিস তুই কুসুম আমি তোকে মেরে ফেলব। আমি তোকে খুব ভালবাসি।'

এবার কুসুমকে জড়িয়ে ধরল রঘু। এভাবে জড়িয়ে ধরা কুসুমের কাছে নতুন নয়। তবু নির্জন পাট খেতের ভেতর একা ওরা দুজন তার উপর ভেজা শরীর কুসুমের অস্বস্তি লাগছিল। কুসুম ছিটকে সরে এসে বলল, 'আমি জানি তুই আমাকে হিংসা করিস রঘুদা, পিসিমা আমাকে বেশি ভালোবাসে বলে।'

'আমিও তোকে ভালোবাসি কুসুম মোটেই হিংসা করি না। মাকে বলবি না কুসুম মা কালীর দিব্যি বল।'

প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে গাল ফুলিয়ে কুসুম বলল, 'ঠিক আছে বলব না।'

'এই তো লক্ষী মেয়ে।'

রঘু আবারও জড়িয়ে ধরতে গেলে কুসুম বাধা দিল। আজ রঘুর শরীরের স্পর্শে শৈশবের অভ্যেস থাকলেও স্পষ্ট উপস্থিতি আছে রঘুর পৌরুষের। কুসুম অজানা পুলকে রোমাঞ্চিত হল। হঠাৎ কুসুম রঘুকে বলল, 'রঘুদা চোখ বন্ধ কর।'

রঘু বোকার মতো হাঁ করে চেয়ে রইল দেখে কুসুম আবার বলল, 'কর না তোকে একটা জিনিস দেব।'

রঘু চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে জিনিসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তখন তার ঠোঁটের উপর পাতলা আরও এক জোড়া ঠোঁট নীরবে নেমে এল। কুসুমের গরম নিঃশ্বাস রঘুর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল। আর তারপরই কুসুম ছুটে পাট খেতের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। রঘু বোকার মতো বিহ্বল চোখে কুসুমের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ সময়।

৮

রঘুর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই শান্তিবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদিন স্কুলে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। শিক্ষকরা ধরাধরি করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে টানা একমাস তার চিকিৎসা হল, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন না। একদিক প্যারালাইসিস্ হয়ে গেল তার। এই অবস্থাতেই তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন তরুবালা। যে লোকটা রাস্তায় হাঁটলে মানুষ সম্ভ্রমের সাথে রাস্তা অতিক্রম করতো, তাকেই আজ অথর্ব পঙ্গু হয়ে অন্যের দয়ায় বিছানায় পড়ে থাকতে হল। আরও এক কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়তে হল তরুবালাকে। সকাল বিকাল শুধু ঈশ্বরের পদতলে স্থান চাইলেন তরুবালা। তার চোখের জল যেন আর বাঁধ মানে না। অবিরাম বর্ষণ শুধু হয়েই চলেছে।

গ্রামের মানুষ শান্তিবাবুর প্রতিদিন খোঁজ নিতেন। স্কুলের ছাত্র, শিক্ষকরা ফলমূল নিয়ে প্রতিদিন আসতো। জ্যোতিবাবু ভাইয়ের দুর্দিনে পাশে এসে দাঁড়ালেন। যত টাকা প্রয়োজন তিনি খরচ করলেন। দাদাকে কলিকাতা নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাও করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শান্তিবাবু রাজি হলেন না। ফলে ভাল চিকিৎসার আর কোন চেষ্টাই করা গেল না।

সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেই রঘু পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার ফল যে তার ভাল হবে সে ব্যাপারে রঘু নিশ্চিত ছিল। হলও তাই। রঘু সত্তর শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে পাস করল। মহকুমার কোথাও এতো ভাল নম্বর পেয়ে তার আগে কেউ পাশ করেনি। ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্র ছাত্রী রঘুকে দেখতে এল। শিক্ষকরা রঘুর দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন।

রঘুর মা খুব একটা খুশি হতে পারলেন না। ছেলের হাত ধরে তরুবালা নিয়ে গেলেন স্বামীর কাছে। তার কানের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার রঘু প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। বুঝেছ?'

শান্তিবাবু মুখ বেঁকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন, মুখে লেগে যাওয়ায় কথাগুলি স্পষ্ট হল না। রঘু বাবার মাথার কাছে বসে বলল, 'বাবা আমি সত্তর শতাংশ নম্বর পেয়েছি। তুমি সুস্থ থাকলে আরও বেশি নম্বর পেতাম।'

শান্তিবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। তাঁর চোখের কোণা গড়িয়ে দুফোঁটা জল পড়ে গেল বিছানায়। তরুবালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রঘু বলল, 'তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো বাবা, আমি আরও ভাল রেজাল্ট করব। তুমি ছাড়া আমার যে

কিছুই হবে না।'

আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী সবার মধ্যে কান্নার রোল উঠল। তরুবালা কাঁদছেন, শান্তিবাবুর মা সুরবালা, মোহিনী, কুসুম, রেণু এমনকি জ্যোতিবাবুও চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।

তারপরও ধরে রাখা গেল না শান্তিবাবুকে। দু সপ্তাহ তিনি বিছানায় কাটিয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন। এই সমাজ, এই মাটি হারাল একজন ভাল মানুষকে। একজন পুরোধা শিক্ষককে যার পদচারনায় এই গ্রাম, পাহাড়, শহর সমৃদ্ধ হয়েছে। যে সর্বদাই দিশা দেখিয়েছেন বিভ্রান্ত মানুষকে। এসো হাতে হাত ধর, আমরাই স্বর্গ রচনা করতে পারি। আমরা স্বর্গ ছেড়ে যেদিন এসেছি ওই স্বর্গটা নরক হয়ে গেছে। আমরা এই শ্বাপদসংকুল পাথুরে বনভূমিতে এসেছি এখানেও স্বর্গ রচিত হবে। আমরা সেই অমৃতের পুত্র যারা এই পৃথিবীকে সর্বদাই দিশা দেখিয়েছি। এমন কিছু বিশ্বাস, এমন আত্মমর্যাদাবোধ তিনি মানুষের মনে পুঁতে দিয়ে গেছেন, যার কোন বিকল্প হয় না।

শান্তিবাবু চলে যাওয়ার পর জ্যোতিবাবু রঘুদের নতুন অভিভাবক রূপে আবির্ভূত হলেন। পাড়ার মান্যিগণ্যি ব্যক্তিরা যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তারা জ্যোতিবাবুর উপস্থিতিতে ধীরে ধীরে দুরে সরে গেলেন। প্রথম কিছুদিন রঘুর ঠাকুমা কাকিমারা রঘুদের বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর সবাই এক এক করে বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু জ্যোতিবাবু যথার্থ দেওরের মতো এই বাড়িতেই পড়ে রইলেন।

প্রথমদিকে তার উপস্থিতি ভালই লাগতো, কিন্তু ধীরে ধীরে তা দৃষ্টিকটু লাগতে শুরু করল। জ্যোতিবাবু প্রায় রাতেই বাড়ি ফেরেন না, এখানেই থেকে যান। মোহিনী তার চারিত্রিক দোষ নিয়ে অনেক কথা তরুবালাকে বলেছেন। এছাড়া জ্যোতিবাবু লোকটা কেমন সেটা সর্বজনবিদিত। কে কি ভাবছে এই ভাবনায় তরুবালা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

চৌধুরী বাড়ির লোকেরা আগে সারাক্ষণ ওদের বাড়িতে আসতেন, বিশেষ করে কুসুম। কিন্তু জ্যোতিবাবুরা এখানে ডেরা ফেলায় কুসুম এই বাড়ি ছেড়েই দিল। রঘু ও তার মা যেন শামুকের মতো আপাদমস্তক খোলসের ভিতর ঢুকে গেলেন। এই পৃথিবীর সমস্ত দেনা পাওনা যেন শান্তিবাবুর মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদেরও শেষ হয়ে গেল। জ্যোতিবাবুর উপর সর্বদাই ওদের নির্ভরতা বাড়তে লাগল। জ্যোতিবাবু মতলব ছাড়া কারো সাথে মেশেন না, এটা তরুবালা জানেন। কিন্তু এক্ষেত্রে জ্যোতিবাবুর মতলবটা কি সেটা তরুবালা বুঝতে পারলেন না। একদিন তরুবালা জ্যোতিবাবুকে বললেন, 'ঠাকুরপো, ভেবেছি রঘুকে কলেজে পাঠিয়ে দেব। তার মার্কসীট পেয়ে গেছি, ভাবছি সামনের সপ্তাহে আগরতলা চলে যাব ওকে কলেজে ভর্তি করতে।'

কথাটা শুনে আঁতকে উঠলেন জ্যোতিবাবু, 'বলছ কি বৌদি তুমি চলে

যাবে? রঘু যাবে যাক না আমি ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু তুমি যাবে কেন এই বাড়ি ঘর ছেড়ে?'

তরুবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কেন যাব না সেটা বল? রঘুও একা, আমিও একা। দুজনে একসাথে থাকলে অন্তত নিজেদের মুখ চেয়ে আমরা বাঁচতে পারব।'

'কিন্তু বৌদি দাদার নিজ হাতে তৈরি এই সব স্মৃতি তুমি ভুলে থাকতে পারবে? রাত পোহালেই তো কাঁদবে বাড়ির কথা, দাদার কথা ভেবে!'

'তা ঠিকই বলেছো ঠাকুরপো, কান্না এখন আমার জীবনের নিত্যসঙ্গী। উদ্বাস্তু হয়ে এই পাহাড়ে আসা, বসতি তৈরি করে এতদূর পর্যন্ত আসা, সবই তো চোখের সামনে ভাসবে। তবু রঘুর চাইতে বড় কিছু তো আমার জন্য উনি রেখে যাননি।'

'কিন্তু দুজনের যাওয়া আসা থাকা খাওয়ার খরচা তো অনেক। সেটা পাবে কোথায়?'

'কেন তুমি দেবে। অনেক টাকা পয়সাই তো করেছো দাদার পকেট হাতিয়ে, এই সামান্য পয়সাটুকু দিতে পারবে না?'

'আমার অবস্থা এখন ভাল নয় বৌদি। আমার ধানের গোলা জমি সব লুট হয়ে গেছে, আমিই এখন রাস্তার ফকির।'

'আমি তোমার কাছে এই রকম উত্তরই আশা করেছিলাম ঠাকুরপো। ভেবো না উপায় একটা ঠিক বের হয়ে যাবে।'

'কি করবে?'

'কেন এই বাড়ির জমিটা বিক্রি করে দেব। তাছাড়া পেনশানটা চালু হয়ে গেলে আমাদের মা ব্যাটার চলে যাবে।'

'ওসব কিছুই হবে না বৌদি, এই জায়গা বিক্রি করা যাবে না। এটা দাদার স্মৃতি। তোমাকে বিক্রি করতে আমি দেব না। তাছাড়া রঘুও এবছর কলেজে যাবে না। এই বছর ওর কাল অসুজ। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে তার অমঙ্গল হবে। আমি বলি কি রঘু আমার ব্যবসার কাজে এই বছরটা থাকুক। কিছু টাকা পয়সা আয় হবে, এদিকে দাদার পেনশানটাও চালু হয়ে যাবে। আমিও কিছু সাহায্য করব। তখন না হয় তোমরা দুজন আগরতলা চলে যেও।'

তরুবালা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমাদের ব্যাপারে অযথা ভেবে তোমার কষ্ট পেতে হবে না ভাই। তুমি বরং নিজেকে নিয়েই ভাব। আমাদের ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

হঠাৎ রেগে উঠলেন জ্যোতিবাবু, 'তোমার মতলবটা আমি বুঝতে পেরেছি বৌদি। আগরতলা গিয়ে বাড়ি জমি বিক্রি করে তুমি বৈধব্য ঝেড়ে ফেলে দেবে। তোমার মনে পাপ লুকিয়ে আছে। রঘুর পড়াশোনা তো একটা উপলক্ষ মাত্র। আমি বেঁচে থাকতে আমার ভাইপোর কোন অমঙ্গল হতে দেব না।'

তরুবালা দু কানে হাত চাপা দিলেন। যে কথা জীবনে কখনও কানে তুলবেন বলে আশা করেননি, সে সব কথা আজ যে যেমন করে পারে বলছে। 'ইতরের মতো কথা বলবে না ঠাকুরপো। দাদা চলে যেতেই তোমার আসল রূপ বেরিয়ে এল। আর কক্ষনো এ বাড়িতে আসবে না তুমি।'

'এই বাড়িতে আমি আসব! তোমার চরিত্র নিয়ে যা সব কথা হচ্ছে চারিদিকে শুনলে কান জ্বলে বৌদি। শুধু বড় ভাইয়ের পরিবার বলেই আসি।'

'যা কিছু রটছে তা তো তোমারই জন্যে। লজ্জা করে না তোমার - দিন নেই রাত নেই মদ গিলে এই বাড়িতে এসে পড়ে থাকো।'

'খুব সাবধানে কথা বলবে বৌদি। এ অঞ্চলে আমার একটা মান সম্মান আছে। তোমার মতো -'

মাঝখানে ঘরে ঢুকল রঘু, 'সাবধান কাকা। মা'র সম্বন্ধে আর একটাও বাজে কথা বলবে না। অসহায় পেয়ে যা মুখে আসে তাই বলে যাচ্ছো?'

বাকবিতন্ডা এতো চড়া মেজাজে চলল আশেপাশের লোকজন সব রঘুদের উঠোনে এসে ভিড় জমাল। চোখ দুটি কপালে তুলে জ্যোতিবাবু রঘুর দিকে তাকালেন। কিছু হয়তো তিনি বলতে যাচ্ছিলেন তখনি বাইরে থেকে চানমণি দেব ডাকলেন।

'বৌঠান, জ্যোতিবাবু, আপনারা বাইরে আসুন।' তরুবালা বাইরে এসে দেখেন পাড়ার অনেক মহিলা পুরুষ বাড়ির উঠোনে এসে ভিড় করেছেন। তরুবালা তাদের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে বললেন, 'আপনারা দয়া করে আর কয়েকটা দিন সময় দিন। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব।'

চানমণি দেব বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনাকে কোথাও যেতে হবে না বৌঠান। আপনি এখানেই থাকবেন। আমাদের ভুল ভেঙে গেছে।'

'না না দাদা, আমি আর এখানে থাকব না। রঘুর বাবা মারা যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে আমাকে আপনারা এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কি করেছি আমরা? একটা লম্পটের হাত থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কলে জল আনতে পারি না, রাস্তায় বেরুতে পারি না, নানা কথার বাণে আমাকে বিদ্ধ করছেন আপনারা।'

হাউ মাউ করে রঘুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন তরুবালা। পাড়ার মহিলারা নানা ভাবে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। চানমনি দেব, রাণু চৌধুরীরা জ্যোতিবাবুকে শাসালেন, 'আর কোনদিন যেন এদিকে আপনাকে না দেখি। ওদের ভাল মন্দ আমরাই বুঝে নেব।' জ্যোতিবাবু মুখে কিছু না বলে সোজা বাড়ির দিকে একা একা হেঁটে চলে গেলেন।

পরদিন থেকে রঘুদের বাড়িতে গ্রামের মানুষের আনাগোনা আবার শুরু হল। কুসুম অনেকদিন হল রঘুদের বাড়িতে আসে না। রঘু ও তার মা বাইরের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু কুসুমের মা সরোজিনী পরদিন এসে

বললেন, 'দিদি আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে একবার যাবেন।'

তরুবালা মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ যাব।'

সরোজিনী ছাড়ার পাত্রী নন, 'না দিদি এভাবে দায়সারা উত্তর দিলে চলবে না। কুসুমের বাবা বলেছেন আপনি ছাড়া এই বিয়ের পাকা কথা হবে না।'

তরুবালা অবাক হয়ে সরোজিনীর দিকে তাকালেন। কুসুমের তাহলে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, অথচ তিনি জানতেই পারেননি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সরোজিনী বললেন, 'হ্যাঁ দিদি কথা হয়ে গেছে, আজ পাকা কথা হবে। ছেলে ভাল পানিসাগরে বাড়ি। মাস্টারি করে। তবে বয়েসটা একটু বেশি এই যা। বয়স বেশি বলে কুসুমের এই বিয়েতে একদম ইচ্ছে নেই। ওর বাবা বললেন আপনিই তো ওর আসল মা, আপনি বললেই ওর বিয়ের পাকা কথা হবে। কুসুমও রাজি হবে।'

তরুবালা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তার কান্না দেখে সরোজিনীও কেঁদে ফেললেন। 'কাঁদবেন না দিদি, আপনার চোখের জলে কুসুমের অমঙ্গল হবে।'

কুসুমের বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেল। এই সামনের মাঘেই বিয়ে। কুসুম দু তিনদিন রঘুকে লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, কিন্তু রঘু যায়নি। একদিন রেণু এসে ওকে অনেক চেষ্টা করেছে কুসুমের কাছে নিয়ে যেতে। কিন্তু রঘু কুসুমদের বাড়ি যায়নি।

তারমধ্যেই এক রাতে রঘুদের আরও বড় বিপদটা ঘটে গেল। যা রঘুরা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। শেষ রাতে রঘুদের ছন বাঁশের ঘরগুলি আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রঘু ও তার মা জাগার আগেই পুরো বাড়িটা আগুনে গ্রাস করে ফেলল। মাথার উপরে আগুন দেখে রঘু লাফিয়ে উঠে মাকে ডাকল। তরুবালা ঘুমের মধ্যে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন। রঘু মাকে নিয়ে কোনওরকমে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। পাড়ার লোকজন ছুটে এসে বালতি, কলসি দিয়ে জল ছুঁড়েও কিছুই করতে পারল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো বাড়িটা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শুধু জমির দলিল, কিছু সোনাদানা ও রঘুর সার্টিফিকেটগুলি যে টিনের বাক্সে ছিল সেটা রঘু বাঁচাতে পারল।

এবার সত্যি তরুবালা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। টাকাপয়সা, গরু, ছাগল দাউ দাউ করে চোখের সামনে জ্বলে গেল। ঘরের মধ্যে যা ধান চাল ছিল সব আগুনের পেটে মুহূর্তেই ছাই হয়ে গেল। তরুবালা বোবা চোখে ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেন এমন হল? কার শত্রুতার জেরে আজ তার সবকিছু জ্বলে পুড়ে গেল বুঝতে অসুবিধা হল না তার। ভোর হয়ে গেছে, কালো ছাইগুলির মধ্য থেকে স্থানে স্থানে ধোঁয়া উঠছে। শান্তিবাবু ও তার সাধের সৌধ চোখের সামনে ছাই হয়ে গেল। চানমণি দেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন তরুবালা।

নতুন তিন চাকার রিক্সা চালু হয়েছে এই এলাকার সদরে ও গ্রামে। সুরবালা ও মোহিনী পরদিন সকালে এসে উপস্থিত হলেন রিক্সা চড়ে। সুরবালা উঠোনে পা

দিয়েই ডাকলেন, 'তরু - তরু - তরু -।' তরুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই শাশুড়ি মা বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

'তোরা কেন ভাবছিস তোদের কেউ নেই? আমি থাকতে তোদের কোন কষ্ট হবে না - চল বাড়ি চল।'

তরুবালার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। যখন তখন জমে থাকা বরফ গলে জল আর বের হয় না। ভাবলেশহীন চোখে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় যেতে বলছেন আমাকে মা?'

'কেন বাড়িতে?'

'আপনার ছোট ছেলের বাড়িতে যেতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। আর কোথায় যাবি তুই?'

'না মা এই পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। আপনার ছেলের বাড়িতে আমি যাব না।'

'তাহলে কোথায় থাকবি? রাস্তায়?'

'রাস্তায় থাকব কেন গো, কোন মন্দিরে চলে যাব। অথবা কোন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ নেব! দুবেলা আমাদের চলে যাবে।'

'এসব তুই কি বলছিস তরু? জমিদার বাড়ির বউ মানুষের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করবে?'

মৃদু হাসলেন তরুবালা, 'কেন মিছে আমাদের নিয়ে ভাবছেন মা। এটা আমাদের সাময়িক বিপর্যয়, এখান থেকেই আমরা ঘুরে দাঁড়াব। কারো করুণার প্রয়োজন নেই আমাদের।'

মোহিনী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিলেন এবার কথা বললেন তিনি। 'তুমি এসব কি বলছ দিদি? তোমাকে করুণা করব কেন? আমাদের যা কিছু আছে তা তো তোমাদের জন্যেই। আজ আমাদের ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। শোন দিদি, তুমি আমাদের বাড়িতে থেকো না। আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে একটা বাগান বাড়ি আছে ধলাইর পাড়ে, তুমি সেখানেই থাকবে। আপাতত কিছুদিন মাও তোমার সাথে থাকবেন। এদিকে তোমাদের বাড়িটা আবার তৈরি হয়ে গেলে ফিরে আসবে।'

'এই বাড়িতে আমি আর ফিরব না ছোট। এই গ্রামের সব স্মৃতি আমি ভুলে যেতে চাই।'

'তাহলে তুমি কি চাও বল দিদি? খুলে বল আমাকে।'

'রঘুর পড়াটা আমি শেষ করাতে চাই, আর কিছুই আমার দরকার নেই।'

'সব হবে দিদি। রঘুর পড়ার সব ব্যবস্থা আমি করব। তুমি ভেবো না। তবে এই বছরটা তুমি একদম চুপচাপ থাকো। সামনের চার পাঁচটা বছর যে লড়াই করতে হবে তার দম নিয়ে নাও।'

সুরবালা তরুবালার চিবুকে হাত রেখে বললেন, 'মোহিনী ঠিকই বলেছে

তবু, তাড়াহুড়ার ফল ভালো হয় না। আমরা কি তোর পাশে নেই? তুই নিজেকে একা ভাবছিস কেন?'

সুরবালা আরও বললেন, 'ঘটনা শুনে আজ সকালে জ্যোতির সাথে আমাদের বোঝাপড়া হয়েছে। জ্যোতি আমাদের সব কথাই মেনে নিয়েছে। তবে তার একটাই দাবি, রঘু যেন এবার কলেজে ভর্তি না হয়। সে স্বপ্নে দেখেছে কলেজে গেলে রঘুর বিপদ হবে।'

'তুমি চল দিদি, আমি আর মা সব ব্যবস্থা করে এসেছি। তুমি ওখানে গেলে তোমার ভালো লাগবে। সুন্দর জায়গা নতুন করে সংসার পাতবে। আর আমার রঘু সে নিশ্চয় ব্যারিষ্টার হবে, এতো ভাল ছাত্র তাকে মানুষ করব না আমি? চল দিদি চল।'

তরুবালা আর বাধা দিতে পারলেন না। যাই হোক নিজের শাশুড়ি ও জা'র থেকে আর কে বেশি আপন। রিক্সায় তিনজন গাদাগাদি করে বসে পড়লেন। রঘু টিনের বাক্সটা নিয়ে রিক্সার পেছন দিকে যে গাছের ডাল বাঁধা থাকে, সেটায় উঠে বসল।

তারা চলে যাচ্ছেন গ্রাম ছেড়ে দেখে আশেপাশের বাড়িগুলি থেকে লোকজন বেরিয়ে এলেন। তরুবালা তাদের সাথে গলা জড়িয়ে কাঁদলেন। আবার ফিরে আসবেন বলে কথা দিলেন। নিজের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটু সময়ের জন্য তিনি আনমনা হয়ে গেলেন। সহস্র বাহু মেলে বাড়িটা যেন তাকে ডাকছে। ঐ বাড়ির সব আম, কাঁঠাল, সুপুরি, নারকেলের গাছগুলি তাকে ডাকছে। আধপোড়া ডালিম, পেয়ারার গাছগুলিও তাকে ডাকছে। কত স্মৃতি এই গাছপালা ও মাটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে তার ও তার স্বামীর। এই বাড়ি ছেড়ে দুরে চলে যাওয়া যায়? তিনি আর পারলেন না। ঠোঁট ভেঙে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে রিক্সায় বসে রইলেন তরুবালা।

রঘুর বন্ধুরাও অনেকেই এসেছিল। আবার অনেকে হয়তো খবর পায়নি। বন্ধুরা আর আগের মতো ছোট নয়। সবাই বড় হয়ে গেছে। তবু রঘু মানেই তাদের প্রেরণা, তাদের পথের দিশারী। সে আজ চলে যাচ্ছে বলে সবাই বিমর্ষ। তবে সান্ত্বনাও একটা আছে, কারণ রঘুরা যে গ্রামে যাচ্ছে সেই নবগ্রাম কলাবাগানের পাশের গ্রাম। তাদের সাথে কথা বলে সে রিক্সার পেছনে বসে পড়ল। কিন্তু তখনও সে যেন কাউকে খুঁজছিল। না সে আসেনি। বারবার এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে একবার যেন শেষ দেখা দেখতে চাইছিল রঘু। কিন্তু হোল না, সে আসেনি। রিক্সাটা ধীরে ধীরে চলতে লাগল। তার ধ্বংস হওয়া বাড়ি, দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিবেশীরা ক্রমশ ছোট হতে লাগল। রঘুও কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মা কাকিমারা কি সব বলাবলি করছেন রঘু যেন আর শুনতেই পাচ্ছে না।

প্রতিটা দিন তার নিয়ম মেনেই চলে যায়। আবার নতুন সূর্য উঠে - পুরোনো হয় - অস্ত যায়। এই নিয়মের কোনদিন অন্যথা হয়নি। প্রতিটি দিনের

শেষে মানুষ পুরোনো হয়। কেউ যেমন প্রস্ফুটিত হয় কেউ বা ঢলে পড়ে। মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা সব পুরোনো হয়। দেশ ভাগের যন্ত্রণা নিয়ে তরুবালা এসেছিলেন এ দেশে, সাজিয়ে ছিলেন নতুন সংসার। আজ এই অল্প কটা দিনেই সব অতীত হয়ে গেল। পাকিস্তানের বাড়িটা যেমন অতীত, এ দেশের বাড়িটাও অতীত। তরুবালা বসে বসে ভাবতে লাগলেন। সেই ছোটবেলা বিয়ে হয়েছিল তার, তখন থেকে যা কিছু আপন ভেবে জড়িয়ে ধরেছেন সব তাকে ছেড়ে আজ বহু দূরে চলে গেছে। স্বামী চলে গেলেন, কথাকলি চলে গেল, বাঘা হারিয়ে গেল, শাশুড়িও এপাড়ে এসেই পর হয়ে গেলেন, গান্ডু একদিন হাটে গিয়ে আর বাড়ি ফিরল না। কুসুমও চলে যাচ্ছে। শুধু রঘু ছাড়া আর আপন বলে কেউ তো রইল না।

রঘু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ মা?'

তরুবালা 'অ্যাঁ' বলে সম্বিৎ ফিরে পেলেন, 'না কিছু না, কতো কিছু হাবিজাবি মনে পড়ে যায়।'

'ওসব নিয়ে আর ভেবো না মা। আমি সব ভুলে গেছি।'

'আমাকে ছেড়ে তুইও কোনদিন চলে যাবি না তো রঘু?'

রঘু চমকে উঠল, 'এসব কি ভাবছ তুমি মা! আমি এখন বড় হয়েছি, পড়াশোনা ছেড়ে দিলেও পরিবার আমি টেনে নিয়ে যেতে পারব। আমি অলস নই মা। শুধু বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে হলে মাকে কষ্ট দিতে হবে, সেটা আমি করব না।'

'তার মানে তুই পড়াশোনা ছেড়ে দিবি?'

'হ্যাঁ অন্তত যতদিন আমরা আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারব।'

'কি কাজ করবি তুই রঘু?'

'কাকার সাথে কথা হয়েছে, আপাতত ময়ালে যাব, কাকার ব্যবসা দেখব। আরও দুয়েকজনের সাথেও কথা হয়েছে। যখন যা ভাল সুযোগ আসে তাই করব।'

'তোর আর পড়া হবে না রঘু?'

'কেন ফালতু গো ধরছ মা। যে শিক্ষা পেটে ভাত দেবে না তার পেছনে এখন সময় নষ্ট করব কেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তরুবালা। ছেলেকে বাধা দেবেন এই শক্তি তার আজ নেই। রঘু দুদিন পরে ভোলার সাথে ময়ালে যাবে কথা হয়েছে। ময়াল কি? সেখানে গিয়ে কি হয় সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। রঘুরও আছে কিনা কে জানে।

ধলাই নদীর পাড়েই রঘুদের নতুন ঘর। জায়গাটা একদম ফাঁকা। কাছাকাছি বলতে হরিবল দাসের স্ত্রী সুনখাদের বাড়ি। হরিবল দাস আর বেঁচে নেই। তবে সুনখার পাঁচ পাঁচটি ছেলে, তাদের বৌ, নাতিপুতি নিয়ে ভরা সংসার। সত্তরের কাছাকাছি মহিলার বয়স। তবে শরীরটা সুঠাম পুরুষদের মতো। এলাকার পুরুষ

মানুষ পর্যন্ত এই মহিলাকে ভয় পায়। তার গাছের জাম চুরি করতে আসা বাচ্চারা তার গর্জন শুনলে গাছ থেকে পড়ি কি মরি করে লাফিয়ে পড়ে ভাগে। মহিলাকে রঘু ঠানাদি বলে ডাকে। মহিলার একটি বৈশিষ্ট্য বেশ নজরকারা। তার স্তন দুটি বুক থেকে নেমে প্রায় কোমর পর্যন্ত ঝুলে থাকে। কাজের ব্যস্ততার সময় তিনি কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে পিঠের দুই দিকে দুটো ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন। জীবনে কখনও ব্লাউজ পরেছেন বলে কেউ দেখেনি। সেই ঠানদি রঘুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোর ঠাম্মা চলে গেলেও তুই ভাবিস না। আমি তোর মার সাথে থাকব। রাতে একসাথে ঘুমোব আমরা। তোর মা ভয় পাবে না, তুই নিশ্চিন্তে কাজে যা রঘু।'

একদিন সকালে হঠাৎ দমকা হাওয়া তুলে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি শুরু হল। তরুবালা ঠাকুরের সামনে বসে রইলেন ঘুম থেকে উঠে স্নান করেই। বৃষ্টি যে এসেছিল তিনি বুঝতেই পারেননি। পুজো থেকে উঠে রঘুর কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিলেন। চন্দনের শীতল ঘন তরলের ফোঁটা কপালে পড়তেই ঘরের চারিদিকে একটা পবিত্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। রঘু কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করল, 'মা এতো সকাল সকাল পুজো করতে বসে গেলে? আজ কি কোন বিশেষ দিন মা?'

তরুবালা হেসে বললেন, 'তুই জানিস না, আজ পাগলিটাকে দেখতে ওর বর আসবে। তাই ঠাকুরকে পুজো দিলাম।'

প্রসাদের থালা নিয়ে চিনি আর কলা ভেঙে রঘুকে দিলেন তরুবালা। প্রসাদ হাতে নিয়ে প্রণাম করে রঘু খেয়ে নিল।

'কি রে রঘু, একবার তুই যাবি না কুসুমকে দেখতে?'

'না মা।'

'কুসুম বারবার তোকে দেখতে চাইছে।'

'বিয়ের পর আর চাইবে না। আমাদের সবাইকে ভুলে যাবে। আমাদের সাথে ওর কোনদিন পরিচয় ছিল সেটা বলতেও লজ্জা পাবে।'

'নারে। কুসুমকে এই শিক্ষা আমি দিইনি। সে একটু অন্যরকম।'

কথা বলতে বলতেই রঘু পোশাক পরে তৈরি হয়ে গেল। তরুবালা জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সাত সকালে কোথায় চললি বাবা?'

'ভুলু দাসের এক জোড়া হালের বলদ বিক্রি হবে মা। যে দাম চাইছে মন্দ নয়। যদি আজকে হালহালি বাজারে তুলতে পারি তাহলে ভাল লাভ হবে।'

'তুই টাকা কোথায় পেলি রঘু?'

'এই কদিন কাজ করে জমেছে, তাছাড়া তুমি যে টাকাটা দিয়েছ সেটাও আছে।'

তরুবালা হাসলেন। রঘু সত্যি একটু সাবালক হয়েছে এই কদিনে। তিনি ছেলের উৎসাহে বাধা দিলেন না। কিন্তু স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'না খেয়ে বেরিয়ে যাবি নাকি?'

রঘু এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'মা কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, তারপর আমার পড়াশোনা, পুড়ে যাওয়া বাড়িতে আবার ঘর তৈরি করা, সব হয়ে যাবে। আমি কিন্তু আবার বাবার পছন্দ মতো পুরানো ঘরটার আদলেই ঘর করব।'

কথাকটি বলেই রঘু বেরিয়ে গেল। রঘুর এই আত্মবিশ্বাস তার বাবার মতো, হেরে যেতে যেতেও হার না মানার জেদ। ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য স্পৃহা, লড়াইয়ের তীব্র ইচ্ছেটা তার জন্মসূত্রে পাওয়া। রঘুও বেশিদিন সময় নেবে না ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে। এই আগাম দৃশ্য দেখতে পেয়ে তরুবালা তৃপ্তি পেলেন। তরুবালার হঠাৎ শান্তিবাবুর কথা মনে পড়ল। কিছুদিন যাবৎ স্বামীর কথা যেন সারাক্ষণ মনে পড়ছে তার। শান্তিবাবু যেন পাশেই আছেন, ভরসা দিচ্ছেন। বিশেষ করে হঠাৎ রঘুর এই বদলে যাওয়া অবাক হওয়ার মতো। তরুবালার যেন মনে হচ্ছে শান্তি বাবুই এসে ভর করেছেন রঘুর উপর। সব বিপদ কেটে যাবে তিনিই পথ দেখাবেন রঘুকে।

বাজার থেকে ফিরতে একটু দেরি হল রঘুর। বাড়ি ফিরেই রঘু অবাক হয়ে গেল। কুসুম, রেণু, কুসুমের মা ঘরে বসে তরুবালার সাথে গল্প করছেন। রঘু ফিরতেই তরুবালা উঠে গামছা এগিয়ে দিলেন। তারপর ডাকলেন, 'রঘু, তুই খেতে আয়।'

'না মা আমি খাব না, আমার খিদে নেই।'

তারপর কুসুমের কাছে এগিয়ে এল রঘু। কুসুমকে আজ খুব সুন্দরী দেখাচ্ছিল, শাড়ি পরে এসেছে সে। এই প্রথম শাড়িতে কুসুমকে বেশ বউ বউ লাগছিল। তবু কুসুম কি একটু শুকিয়ে গেছে? ওর এই সুন্দর চোখের নিচে সামান্য কালো দাগ পড়েছে। কুসুমের চেহারাটা যেন বেশ শুকনো লাগছে। রঘু কুসুমের খোলা চুলে টান দিয়ে বলল, 'কিরে মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন? বিয়ের আগে এমন মুখ করে রাখলে তোর মুখটা যে প্যাঁচা হয়ে যাবে। তোর বর তোকে ভূত ভেবে আঁতকে উঠবে।'

কুসুম কোন উত্তর দিল না। মুখে একটা হাসি হাসি ভাব করে থমথমে মুখেই বসে রইল। সরোজিনী অভিযোগের সুরে বললেন, 'তোকে বারবার খবর দেওয়া হয়েছে, তুই একবারও যাসনি কেন রে রঘু?'

'আমার কি যাওয়ার মতো অবস্থা আছে মামি? আমরা তো ধলাইর জলে ভাসছি এখন। একটা কিছু ঠাঁই না হলে কি করে যাই বল?' রেণু সায় দিয়ে বলল, 'রঘুর অবস্থায় পড়লে আমি হয়তো পাগল হয়ে যেতাম। এতো ভাল ছাত্র অথচ কলেজেই ভর্তি হতে পারল না।'

রঘু মাকে ডেকে বলল, 'মা আমি সুন্দরীকে দিয়ে আসি। তোমরা বসো মামি, আমি আসছি।'

সুন্দরী নামে ছাগলটার খুঁটি সরিয়ে দেওয়ার আছিলায় রঘু ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল। বিয়ের আগে কুসুমকে একবার দেখার ইচ্ছে ছিল রঘুর তা পূরণ হয়ে গেল। প্রাণ ভরে দেখে নিল সে কুসুমকে, কুসুম যে এতো অপরূপা সুন্দরী সে এতোদিন খেয়াল করেনি। প্রথম দিন থেকে ওকে শুধু অবজ্ঞা আর উপেক্ষাই করেছে। আজ রঘু উপলব্ধি করল সত্যি খুব ভালোবাসে সে কুসুমকে। কুসুম সত্যিই সুন্দরী। খেলার সাথীকে জীবনে কখনো আলাদা করে সে মূল্যায়ন করেনি। আজ কুসুম যেন অন্য একটি মেয়ে। আগে কোনওদিন কুসুমের সাথে কথা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে না তার। সাহস করে চুল টেনে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে এটা করা তার আদৌ ঠিক হয়নি। কি ভাবল কুসুম কে জানে?

ধলাই পাড় ভেঙে ভেঙে প্রতি বছর এগোয়। এমনি এক ভাঙা জায়গায় একটা গাছের ফোঁকলা শেকড়ে বসলো রঘু। নিজেকে লুকিয়ে ফেলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল সে। তার ইচ্ছে হল যদি কুসুমের নাগালের বাইরে চিরদিনের মতো চলে যাওয়া যেত তাহলেই বোধ হয় শান্তি আসতো। এই অসহায়তা, নগ্নতা নিয়ে বারবার কুসুমের সামনে ফিরে আসার জ্বালা আর সইতে হত না। রঘু আর সইতে পারছে না। কোথায় ছিল রঘুদের সামাজিক অবস্থান - আর এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে? কুসুমের সামনে রঘুর যে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল, সমাজে তার পরিবারের যে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল, আজ আর তা নেই। রঘু ও কুসুমের মধ্যে আজ আসমান জমিন ফারাক। রঘু যেন পালাতে পারলেই বাঁচে।

ধলাইর জল বয়ে চলেছে। রঘু সেদিকেই তাকিয়ে রইল হাঁ করে। অজানা অচেনা পাখিরা চিৎকার করছে 'হাট্টি -টি-টি, হাট্টি-টি-টি'। পাখিগুলি নদীর ভাঙা পাড়ে মাটি খুঁড়ে বসবাস করে। রঘুর আশে পাশেই ওদের ঘর। রঘুর উপস্থিতিতে ওরা ভয় পাচ্ছে। নিশ্চয় ওদের ডিমের ভেতর যে সুপ্ত ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে তা নিয়ে ওরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। দিনে দুয়েকটা ডিঙি নৌকা ভেসে যায় ধলাইর উপর দিয়ে। পাট, চাল, তুলা নিয়ে ওরা কোন সুদূরে চলে যাচ্ছে কে জানে। কোন এক মাঝি ভাটিয়ালি গানে টান দিয়ে চলে গেল পড়ন্ত বিকেলে। হঠাৎ রঘুর উপরে চলন্ত একটা ছায়া এসে থেমে গেল। রঘু বুঝতে পারল হয়তো কুসুমই এসেছে। রঘুর গা ঘেঁষে এসে বসল কুসুম। আর পালাবার পথ নেই, এবার সে হয়তো ধরা পড়ে যাবে।

'কেমন আছিস রঘুদা?'

'ভালই তো আছি। তুই কেমন আছিস রে?'

'কেন নিজেকে লুকোচ্ছিস রঘুদা? এভাবে পালিয়ে কোথায় লুকোতে চাইছিস তুই?'

চমকে উঠল রঘু। কুসুম কি তার চেহারার পেছনে লেখা প্রতিটি কথা স্পষ্ট পড়তে পারছে? নিজেকে সামলে রঘু বলল, 'কি বকছিস তুই কুসুম? আমি তোর কাছে কি লুকোব?' হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল কুসুম। রঘু ভয়ানক অসহায় ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

'কি হয়েছে কুসুম, কেন কাঁদছিস? দুদিন পর তোর বিয়ে – আমরা সবাই মিলে কতো আনন্দ করব ভেবেছি। কতো খুশির খবর, কতো ভাল ছেলে পেয়েছিস তুই। আর তুই কাঁদছিস?'

'এই বিয়েতে আমি খুশি হব তুই কি করে ভাবলি? আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে যার জন্যে, সে আমার থেকে কেন দুরে চলে যেতে চায়? বল – বল কেন?'

রঘু চুপ করে রইল কোন উত্তরই যেন তার কাছে যুতসই লাগছে না। তবু হেসে বলল, 'তোর হবু স্বামী তো বিরাট অবস্থাপন্ন। এমন ছেলে আজকাল পাওয়া যায়?'

'আমি তো এসব চাইনি রঘুদা। আমি শুধু তোকেই চেয়েছিলাম। তোকে ছাড়া আমি জীবনে সুখী হব না।'

'কেন? কেন সুখী হবি না তুই?'

'ঐ লোকটা আমার মনটা যে পাবে না কোনদিন। কেন জেনেশুনে ওকে ঠকাব আমি?'

'তোর কি হয়েছে কুসুম, কেন এমন পাগলামি করছিস?'

'আমি তোকে ভালবাসি রঘুদা। তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

কয়েক মুহূর্ত কিছু বলার ভাষাই যেন হারিয়ে ফেলল রঘু। এই কান্নার মধ্যে কোন ছলনা নেই। তবু কুসুমকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে, 'বোকামি করিস না কুসুম, তোর ভবিষ্যৎটা পাগলামি করে নষ্ট করিস না। প্রথম প্রথম এমন মনে হয়, কিন্তু কদিন পরে তুইও বুঝতে শিখবি, স্বামীর চাইতে আপন আর কেউ হয় না।'

'তুই কথা দে রঘুদা তুই আমাকে বিয়ে করবি। এই বিয়ে আমি ভেঙে দেব। তুই কথা দে।'

রঘু ধমকে উঠল কুসুমকে, 'এসব কি হচ্ছে কুসুম? আজ এই প্রশ্ন অবান্তর, তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

'এটা কোন সমস্যা নয় রঘুদা। দুটো জীবনের বাঁচা মরার প্রশ্ন। আমি মাকে সব বলেছি।'

'তুই এসব কথা মামিকে বলেছিস? তিনি কি বলেছেন?'

'মা বাবা তোর মত জানতে চেয়েছেন।'

'আমি তোর যোগ্য নই কুসুম।'

'কে আমার যোগ্য আমি ভাল বুঝি, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিস না।'

'কেন তুই বুঝছিস না কুসুম। আমি আজ পথের ভিখারি। নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতাটুকু আমার নেই অন্যের দয়া ছাড়া।'

'তুই কতো বড় বংশের ছেলে সামান্য সুযোগ পেলে তা ঘুচে যাবে। এই সময় আমাকে ও আমার পরিবারকে তোর কাছে পাওয়া দরকার।'

'আজ আর তা হয় না কুসুম! তুই বিয়ে করে সুখী হ আমার কথা ভাবিস

না।

'তুই আমাকে ভালবাসিস রঘুদা আমি জানি। মনে আছে তুই তোর ভাইদের বলেছিলি, পিসিমারও ইচ্ছে আমি তোর বউ হই। তুই আমাকে অন্ধের মতো ভালবাসিস আমি জানি। তুই আমাকেও কষ্ট দিবি, নিজেও কষ্ট পাবি। কেন এই ফালতু জেদ রঘুদা? কেন? পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর থেকে এই চার পাঁচটা মাস অনেক কষ্ট পেয়েছি আমি। নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ করে অবশেষে বুঝতে পেরেছি তোকে ছাড়া আমার এই জীবনের কোন মূল্য নেই। আমি পৃথিবীতে এসেছি শুধু তোর জন্যে। তুই কথা দে - আমি সব ঠিক করে নেব। কোথাও কোন সমস্যা হবে না।'

রঘু চুপ করে বসে রইল। ঘাস তুলতে আসা লোকগুলি নদীর পাড়ে ঘাস তুলে বাঁকা চোখে ওদের দেখছিল। মাঝিরা এমন সব আদিরসাত্মক গান গেয়ে যাচ্ছিল যা শুনে লজ্জায় কান লাল হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওদের যেন কোন দিকেই খেয়াল নেই। রঘু কুসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কুসুম, তোকে যে আমি ভালবাসি সেটা তুই বুঝিস?'

কুসুম মুখ তুলে তাকাল। রেণুও নদীর পাড়ে এসে কুসুমের পাশে বসল। 'যদি তোকে সত্যি ভালোবেসে থাকি তবে তোর ভাল চাইব না আমি? তোর জীবনটা শেষ হয়ে যাক সেটা দেখতে আমার ভালো লাগবে, বল? সামনে সুন্দর জীবন তোর। কেন নোংরা মাখতে চাইছিস গায়ে?'

কুসুম অবাক হয়ে তাকাল রঘুর দিকে। এই কদিনে রঘু অনেক পরিণত হয়ে গেছে। আবেগ ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে পা দিয়েছে সে। কিন্তু কুসুমের মন মানে না। 'তাহলে তুই --?'

'না কুসুম তা আর হয় না। কেন বুঝছিস না আমি তোর যোগ্য নই। যোগ্যতা অর্জন করতে যে সময় লাগবে ততদিন তুই আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবি না।'

'আগামিকাল সকালের মধ্যে তুই রাজি হোস বা না হোস এই বিয়ে আমি ভেঙে দেব।'

রঘু আলতো করে কুসুমের হাতটা ধরল। 'লক্ষীটি এমন করবি না। আর যদি করিস তাহলে সেই পাট খেতের পরে ঝিলের পাড়ে যে গামাই গাছটা আছে সেখানে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে থাকব। আমাকে কখনোই পাবি না তুই।'

কুসুম আর একটিও কথা বাড়ায়নি। আচমকা ভয়ঙ্কর ঝড়টা যেন থেমে গেল। ঝড়টা যে আদৌ এসেছিল তাই বোঝা যাচ্ছে না। কুসুম নিজের চোখ মুছে ছুটে রঘুদের ঘরের উঠোনে গেল। সরোজিনী এতক্ষণ উৎকণ্ঠায় ছিলেন কি হয়- কি হয়? যে কারণে রেণুকে মাঝখানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে আসা কুসুমের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন একদম স্বাভাবিক। রেণু তাড়া দিল, 'চল মাসিমা বাড়ি যাই।'

তরুবালা এসে কুসুমকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলেন। ওকে আদরে ভরিয়ে দিলেন। কুসুম কাঁদতে শুরু করল। তরুবালা ওর দুঃখের জায়গাটা যেন ছুঁতে পারছেন। 'কাঁদিস না কুসুম, কাঁদিস না। আমি তোর মার কাছ থেকে সব শুনেছি। কেন গোয়ার্তুমি করছিস তুই। বড় ভালো ছেলে নির্বাচন করেছেন তোর মা বাবা। দেখিস বিয়ের পর সবকিছুই তোর নিজের মনে হবে। ভালো লাগবে। এ জীবনে তোকে আমার নিজের করতে পারিনি তাতে কি, পরের জন্মে তুই আমার মেয়ে হয়েই জন্মাবি।'

'পিসিমা' বলে আরও জোরে কেঁদে উঠল কুসুম। সরোজিনী কুসুমের হাত ধরে টেনে বললেন, 'আসি দিদি - ওকে একটু আশীর্বাদ করবেন।'

'কুসুম তো আমারও মেয়ে, আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ তার সাথে থাকবে।'

ওরা ধান খেতের মধ্যে দিয়ে জমির আল ধরে এগিয়ে চলল। তরুবালা বিষণ্ন নয়নে তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ আর দৃষ্টি ফেরাননি তিনি। কে জানে আবার কখনো দেখা হবে কিনা।

রঘু তখনও ধলাইর পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। তাল, সুপারি, নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে দুরে যে পাহাড় দেখা যায় তার পেছনে আবীর ছড়িয়ে ঝুলে পড়েছে সূর্য। জীবনের এই যে চঞ্চলতা সুর্যোদয়ের সাথে শুরু হয়, তা থেমে যাবে আর কিছুক্ষণ পর। নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসল রঘু। যে জল তার পা ছুঁয়ে আছে তা কোথায় যাবে? সাগরে? মহাসাগরে? তারপর একদিন সেই জল ফিরেও আসতে পারে আবার এমনি কোন নদীতে যেখানে চান করতে নেমে কুসুম বুঝতে পারবে এই জল রঘুর শরীর ছুঁয়ে বয়ে এসেছে তার কাছে।

দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল রঘুর। বুকের ভেতরটা সে যেন নিজের দুহাতেই খালি করে দিল। অভাব, দুঃখের মাঝেও যেটুকু সুখ, যেটুকু ঐশ্বর্য্য রঘুর জীবনে অবশিষ্ট ছিল - তা এই কুসুম। মনের কোণে একটু অহঙ্কার যে ছিল না তাও তো নয়। আজ নিজের হাতেই সব ধলাইর জলে বিসর্জন দিল। কি ছিল পাওয়ার কি ছিল দেওয়ার, আজ থেকে সামনের দিনগুলিতে তার আর কোন মানে থাকবে না। ছবির মতো রঘুর চোখের সামনে সব ভেসে উঠতে লাগল। কান্নার ঢেউটা দুয়েকবার দলা পাকিয়ে সারাটা শরীর নাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু রঘু নিজেকে দমন করল, শাসন করল। ভেঙে পড়ার সময় এটা নয়। তাছাড়া একটু স্বস্তিও কি রঘু পেল না? এতদিনের বুকে চেপে বসে থাকা একটা সুপ্ত বাঁধন আজ ছিন্ন হয়ে গেল। রঘু আজ মুক্ত স্বাধীন, কারো জন্যেই কোন উৎকণ্ঠা তার আর হবে না। মা ছাড়া আর কোন বাঁধন তার রইল না। বুক ভরে একবার শ্বাস টেনে নিল সে।

পরদিন রঘুর আর যাওয়া হল না। ভোলা এসে খবর দিয়ে গেল যে, পাহাড়ে গন্ডগোল চলছে এখন যাওয়া ঠিক হবে না। রঘু মনে মনে ভাবল তার জন্য এটা ভালই হল। কুসুমের বিয়ে অব্দি যদি থেকে যাওয়া যায় আর বিয়েটাও নিশ্চিন্তে

হয়ে যায়, তাহলে সে খোলা মনে গ্লানিমুক্ত হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু ভোলার কাছে সব শুনে তরুবালা তেড়েফুঁড়ে উঠলেন। জ্যোতিবাবু আগে ময়ালে নিজেই যেতেন, কিছুদিন হল পাহাড়ে গন্ডগোলের কথা শুনে তিনি ভয়ে গর্তে ঢুকে গেলেন। আর তার জায়গায় এবার কিনা সদ্য কৈশোর পেরনো অনভিজ্ঞ রঘুকে ঠেলে দিচ্ছেন বিপদের মুখে? রঘুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জ্যোতিবাবুর বাড়িতে গেলেন। জ্যোতিবাবু সব শুনে হেসে ফেললেন।

'তোর মা'র কি মাথা খারাপ হয়েছে রঘু? অযথা আমাকে সন্দেহ করছে? আমার ভাইপোকে আমি বিপদের মুখে ঠেলে দেব? পার্থ পরমার্থের সাথে তোর কোন পার্থক্য আছে বল? আমি চাইছি তুই জীবনটাকে দেখ, এই দেশ এই মাটি সম্বন্ধে জান। ব্যবসা কি করে করতে হয় শিখে নে। তোর মাকে বল তোর জন্য না ভাবতে, তোর ভাবনা আমার। তোকে আমি মানুষ করব।'

'পার্থ পরমার্থ কে সঙ্গে দিলেও তো ভাল হোত? ওরা রঘুর চাইতে বয়েসে বড়। রঘু একা কি করে কি করবে? সে তো ময়ালের মহাজনি ব্যবসার কিছুই বুঝে না?'

'কি বলছে এসব তোর মা রঘু! তুই একা কোথায়, ভোলা যাচ্ছে তোর সাথে। তাছাড়া পার্থ পরমার্থও প্রতিদিন ময়ালে যাচ্ছে। রিফুজিদের মধ্যে ওরা টাকা সুদে খাটায় সেটা তুলতে হয় ওদের।'

তরুবালার কথাগুলি মনঃপুত হল না। তিনি একটু ক্ষোভের সাথেই বললেন, 'রঘু তোর কাকাকে বলে দে আমার মন না চাইলে আমি তোকে পাঠাব না।'

'সে তোদের ইচ্ছে বাপ। তোকে পাঠানো না পাঠানোর মধ্যে আমার কোন লাভ ক্ষতি নেই। তুই গেলে ভোলাকে একটু নজরে রাখতে পারবি এই যা।'

রঘু মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি যাব কাকা। কিন্তু আমার একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে।'

'কি কথা বল?'

'আগামী বছর আমাকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে।'

জ্যোতিবাবু ক্ষুর দিয়ে শেভ্ করছিলেন, রঘুর কথা শুনে এমনভাবে মুখ কুঁচকালেন তার গালটা বোধয় কেটে গেল। 'এই পড়া পড়া করে আমার মাথাটা গরম করিস না তো রঘু। পড়াশোনা করে কোন শালা মানুষ হয়েছে? তোর বাপটা তো বিদেশ থেকে অনেক লেখাপড়া করে এলো, কি করেছে শুনি? এখন সগ্গে গিয়ে দিব্যি হাওয়া খাচ্ছে আমার কাঁধে সব ফেলে রেখে।'

সাবান মাখতে মাখতে জ্যোতিবাবু আবার বললেন, 'শোন্ বাপ, কথাগুলি শুনতে খারাপ কিন্তু কাজের কথা। তোরা জানিস তোর বাপকে আমি ঠকিয়েছি কিন্তু আসলে তা না। কারণ তোর বাপ আর আমার বাপ দুজনে মিলে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি। তবু যদি তর্কের

খাতিরে ধরেই নিই যে আমি তোদের ঠকিয়েছি, সে ভুলও আমি শুধরে নিয়েছি তোর বাপের চরণে সব সমর্পণ করে। কিন্তু ঐ ব্যাটা ভগবান হয়ে অবতীর্ণ হল, নিজে কিছুই না রেখে সব কিছুই আমাকে আবার ফেরত দিয়ে দিল। ঐ যে ভগবান হল তাতে কিছু লাভ হল? এতো ভাল ভাল কাজ করেও ভাগ্য তো তোদের সহায় হোল না। আসলে সত্যি কথাটা কি জানিস, ভাগ্য নিজ হাতে গড়তে হয়। আমি তোকে এটাই শিখাব। আরে ভাতিজা আমি বেইমান না। তোর মা বাপ যতই আমাকে ঘেন্না করুক আমি নিজের কর্তব্য ঠিকঠাক পালন করব। তোর জন্য জায়গা জমি সব আমি রেডি করে রেখেছি। একটু বড় হয়ে যা কাগজপত্তর সব তুলে দেব তোর হাতে। আর পড়াশোনা সেটাও হবে, তোর কাল অসুজটা চলে যাক তাহলেই তোকে কলেজে ভর্তি করে দেব।'

ঘটির জলের মধ্যে ক্ষুর নেড়ে নেড়ে বললেন, 'কিরে এবার হাস, এবার হাস মা পুত মিলে। কাকা তো খারাপ জোচ্চুর, লম্পট, মাতাল তোর মা বলে। দিনরাত অভিসম্পাত করে আমি যেন ধ্বংস হয়ে যাই। আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি। কিন্তু তোর মাকে বলিস তোর কাকার ভেতরেও একটা ভালো মানুষ শুয়ে আছে। কেউ বিপদে পড়লে আর স্থির থাকতে পারে না।'

তরুবালা জ্যোতিবাবুর একনাগাড়ে বকবক করা ধৈর্য্যের সাথে শুনে গেলেন। কিন্তু অনেক কথা বলার থাকলেও কোন শব্দ করলেন না। রঘু লক্ষ্য করল তার মা প্রথম থেকেই অস্বস্তি বোধ করছেন। জ্যোতিবাবুর কথার উত্তর দিচ্ছেন ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে। রঘু ঘর থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে মা, তুমি যেন খুশি হওনি?'

তরুবালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এসব আমাকে খুশি করতে বলছে তোর কাকা। আসলে আমাদের ভাল সে চায় না রঘু। আমাদের প্রতি কিছু একটা ঈর্ষা তার রয়ে গেছে এখনো।'

রঘু মার কথার অর্থ বুঝতে পারল না। কাকা যদি তাদের ঈর্ষাই করে তাহলে মাকে খুশি করতে চাইছে কেন?

শিমুলতলা বাজারে ভোলার সাথে দেখা হল। দুজনে মিলে যে দিন ঠিক করল তারা ময়ালে যাবে সেদিন কুসুমের বিয়ে। ভোলার কাছে ময়ালের গল্প শুনে ভাল লাগল রঘুর। পাহাড়িদের আচার, ব্যবহার, সরলতা সব নিয়ে রঘুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিল ভোলা। ভোলারও রঘুকে ভাল লাগল শুধু রঘু মিষ্টি ছেলে বলেই নয়, জ্যোতিবাবুর কড়া নজরে থাকতে হবে না তাকে। সেদিক দিয়ে সদ্য কৈশোর পেরনো ছেলেটা তার কাছে নিতান্তই বালক। ভোলা বেশ মালিক মালিক ভাব ধরে এবার কথা বলবে সবার সাথে। টাকা পয়সাও নিজের মতো খরচ করতে পারবে। তাকে পাহারা দেওয়ার আর কেউ রইল না।

কুসুমের বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। বিয়ের আগের দিন রঘু বাজার থেকে

বাড়ি না ফিরে সোজা চলে গেল তার পুরানো বাড়িতে। পুরানো বাড়িটায় আগাছা জন্মে অন্ধকার হয়ে আছে। সামান্য দূরে কুসুমদের বাড়ি। বাড়ির ভেতর অনেক মানুষের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে। রঘুর ইচ্ছে হল একটিবার যদি দেখা করা যেত কুসুমের সাথে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের অবাধ্য মনকে শাসন করল সে। কুসুমদের বাড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আনমনে। একটা দীর্ঘশ্বাস তার নিজের বুকের উপর আছড়ে পড়ল। পাড়ার মহিলারা মেয়েরা দ্রুত ছুটে যাচ্ছে চৌধুরী বাড়ির দিকে, তারা কেউ রঘুকে খেয়াল করেনি। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে অনেকেই রঘুর বন্ধু, তার শৈশবের খেলার সাথী অথচ তারা কেউ রঘুকে চিনতেই পারেনি। নিজেকে আজ বড় উপেক্ষিত অবাঞ্ছিত মনে হল তার। একটু পরেই ধামাইল শুরু হবে। তাদের আনন্দ যেন রঘুর ব্যথার জায়গাটায় খুঁচিয়ে যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিল।

নিজেকে সংবরণ করে সমরদের বাড়ির দিকে রওনা দিল সে। সমরদের বাড়িতে সমরের মা একা মাঝ উঠোনে ধান সেদ্ধ করছেন। রঘুকে দেখেই সমরের মা ডাকলেন, 'আরে রঘু, কখন এলি বাবা?'

'এই তো এক্ষুনি মাসি। সমর বাড়ি নেই?'

'সে তো চৌধুরী বাড়ি, বিয়ের কুঞ্জ বানানোর কাজ করছে।'

'অ।'

'জলচৌকিটা টেনে বোস বাবা। তবে টাকা খরচ করছেন রাণুবাবু। জলের মতো পয়সা ঢালছেন তিনি।'

রঘু বসল। সমরের মা টিনে ধান সেদ্ধ করছেন। ধানের খড় একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে তিনি আবার বললেন, 'সবাই চলে গেছে চৌধুরী বাড়িতে, আমিই একা বসে আছি। একদম ভাল লাগছে না। তুই এসেছিস ভালই হল।'

'তুমি যাবে না মাসি বিয়ে বাড়িতে?'

'এই তো হয়ে গেছে বাবা। একটু পরেই ধানটা নামিয়ে নেব। তারপর যাব।'

সমরের মা জ্বলন্ত খড়ের তাজা আগুন ঠেলে কি একটা বের করলেন। রঘুর বুঝতে অসুবিধে হল না এটা সেদ্ধ পিঠে। কচি কলাপাতার পুড়ে যাওয়া উপরের অংশটা ছাড়িয়ে নিলেই বের হয়ে আসবে সুস্বাদু পিঠে। সমরের মা রঘুকে জিজ্ঞেস করলেন 'কিরে রঘু, চৌধুরী বাড়িতে গিয়েছিলি?'

রঘু ইতস্তত করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে সমরকে তুই খুঁজে পেলি না! সে তো ওখানেই আছে। বন্ধুর বিয়ে বলে কথা তাই খুব খাটছে দুদিন ধরে।'

একটা সেদ্ধ পিঠে রঘুর হাতে দিয়ে সমরের মা বললেন, 'নে রঘু একটা খা।'

রঘু খায়। খুব স্বাদ এই পিঠে। আগে প্রায়ই খেত রঘু এই বাড়িতে। মাসিমা

আবার বললেন, 'কুসুমের জন্যই তাড়াহুড়ো করে এই রাতেরবেলা করতে হল। আমাকে দুপুরে বলে, মাসি তোমার হাতে সেদ্ধ পিঠে খাওয়ার খুব ইচ্ছে হচ্ছে গো। দেবে? দেখ দেখি কান্ড সারাটা জীবন তোরা কাড়াকাড়ি করে খেলি আর বিয়ের আগের দিন খেতে চাইল দেব না? তাই তাড়াহুড়ো করে করলাম। কেমন হয়েছে রঘু?'

'খুব স্বাদ হয়েছে মাসি। তোমার হাতের জাদু আজও আছে।'

'যাক বাবা নিশ্চিন্ত হলাম, মেয়েটা কতো সাধ করে বলেছে।'

রঘু কায়দা করে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো মাসি বিয়েতে কোন ঝামেলা হয়নি তো? মাছ মাংস সব পাওয়া গেছে ঠিক মতো?'

'না না ওসব ঝামেলা টামেলা কিছু নেই। তবে ঝামেলা একটা গেছে বাপু সাংঘাতিক।'

'কি ঝামেলা মাসি?'

একটু সময় ইতস্তত করে তিনি বললেন, 'দেখিস কাউকে বলিস না বাপু। ঐ কুসুমের নাকি কার সঙ্গে পিরিত ছিল সেই ছোটবেলা থেকে। তাই কুসুম এই বিয়েতে রাজি ছিল না।'

চমকে উঠল রঘু। 'বল কি গো মাসি? আমরা তো একসাথেই বড় হলাম কোনদিন তো কিছু বুঝিনি।'

'হ্যাঁরে, তবে আর বলি কি। অমন ভাল মেয়ে তলে তলে এতো বড় একটা জঘন্য কাজ করল। পিরিত আবার কি রে পুড়ামুখী? এসব তো বাপের জন্মেও আমরা শুনিনি।'

'তারপর কি হল মাসি?'

'দেখ রঘু এসব কথা যেন পাঁচ কান না হয়। মেয়েদের জীবন - ছেলেবাড়ির কানে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

'না - না তা হবে না মাসি। তুমি বল - তারপর?'

'তারপর আবার কি! টানা তিন দিন রাণুবাবু মেয়েকে গরুর মতো মেরেছেন। সোমত্ত মেয়ের গায়ে একদম কালশিটে পড়ে গেছিল। কিন্তু মেয়ে তো জাঁদরেল, কিছুতেই দমে না। কুসুম বলেছে আমি যাকে চাইছি তাকেই আমি বিয়ে করব, না হয় গলায় দড়ি দেব।'

'তারপর?'

'তারপর রাণুবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে নাকি বলেছেন, যদি তোর পিরিতি তোকে বিয়ে করে তবে যা আমি তোকে দান করলাম, তুই ওকে বিয়ে করগে যা।'

'বল কি গো?'

'হ্যাঁরে - তবে সবই শোনা কথা বাপু সত্যি মিথ্যে জানি না।'

'তারপর কি হল?'

'তারপর শুনেছি কুসুম আর ঐ ছেলের কাছে যায়নি। এতো কান্ডের শেষে

বাপের কথাই মেনে নিয়েছে।'

'আজকে কেমন দেখলে কুসুমকে?'

'না এখন সব ঠিক আছে। আজ তো কুসুমের গায়ে হলুদ হল। খুব আনন্দ হয়েছে রঘু।'

হঠাৎ চৌধুরী বাড়িতে ধামাইলের ঢোলক বেজে উঠল সাথে কাঁসার ঘন্টা। সমরের মা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'রঘু তুইও চল, চৌধুরী বাড়িতে যাবি। কুসুম তোকে দেখে খুব খুশি হবে।'

রঘু বলল, 'না মাসি, আগামিকাল বিয়েতে আসব। মা বাড়িতে একা, অনেকটা দুর যেতে হবে।'

রঘু উঠে দাঁড়াল। সমরের মা যেতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলেন। রঘুর দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'কি রে তুই রঘু না? আমি তোর কাছে এসব কথা কেন বললাম? লোকে তো তোর নাম নিয়েই যা তা বলছে? তোর সাথেই নাকি -?'

রঘু বাধা দিয়ে বলল, 'ওসব সত্যি কথা নয় মাসি। মানুষ মজা করে যা খুশি তাই বলছে।'

সমরের মা তখনও হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন রঘুর চলে যাওয়ার দিকে। হয়তো ভাবছিলেন এটা তিনি কি করলেন। রঘু ও কুসুমের সম্বন্ধে যা রটেছে তাহলে তা ঠিকই আছে। না হয় এতো দুর থেকে রঘু আসবে কেন কুসুমের খোঁজ নিতে? সমরের মা নিজের উপর বিরক্ত হলেন। কেন কুসুম সম্বন্ধে এসব বলতে গেলেন তিনি রঘুর সামনে।

সমরের বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল রঘু। রাস্তাঘাট নীরব হয়ে গেছে। শুধু কুসুমদের বাড়ি থেকে ধামাইলের সুর শোনা যাচ্ছে।

'বন্ধু আইলায় নারে হায়
সুখের যামিনী নিশি প্রভাত অইয়া যায়
প্রভাত অইয়া যায়রে বন্ধু
প্রভাত অইয়া যায়।
চাতক রইল মেঘের আশেরে বন্ধু মেঘ না ছিল তায়
ধানটা দিলে খৈটা ফোটে
তার লীলা বোঝা বড় দায়।'

রঘু যত এগুচ্ছে এই সুরের মাদকতা তার গায়ে যেন পাতলা কুয়াশার মতো আরও জড়িয়ে যাচ্ছে। ঢোলকের শব্দ আর তার হৃৎপিন্ডের শব্দ যেন একই তালে বাজছে। একটু নিশ্চিন্ত হল রঘু। পাগলিটার জন্য বড় দুর্ভাবনা হয়, বড় জেদি মেয়ে। রঘুর কথা ছাড়া কারও কথাই কোনদিন শুনতো না। সবশেষেও রঘুর কথাটাই সে মানল। বিয়েতে যখন রাজি হয়ে গেছে তাহলে আর চিন্তা নেই। বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

রঘুর ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিহাস! একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে রঘুদের দলটা একজন গণককে হাত দেখিয়েছিল। রঘুর হাত দেখে লোকটা প্রবল উৎসাহে বললেন, 'তুমি ব্যাটা অনেক বড় হবে জীবনে, তোমার নক্ষত্র অত্যন্ত প্রখর। তারপর কুসুমের হাতটা দেখে আবার রঘুর হাতটা টেনে নিয়ে চমকে উঠলো গণক, 'একি তোমাদের বিয়ে তো হবে একই দিনে!' সেদিন থেকে রঘু ও কুসুমের বন্ধুরা ধরেই নিয়েছিল রঘুর সাথেই কুসুমের বিয়ে হবে। রঘু মনে মনে ভাবল গণকটা একটা আস্ত বাটপার।

সারাটা রাত ঘুমোতে পারল না রঘু। কেন যে তার ঘুম পাচ্ছে না বুঝতেই পারল না। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে মাটির কলসী থেকে গড়িয়ে একটু জল খেল সে। এই পৌষের রাতেও ভীষণ গরম লাগছিল তার। ফেরার সময় আকাশে হাল্কা মেঘ ছিল - হয়তো অসময়ের বৃষ্টি আসবে। বাঁশের জানালাটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে। না মেঘ এখন নেই, কুয়াশঘেরা আকাশ। বাইরের কুয়াশা জানালা দিয়ে এসে ঠান্ডা হাতে ছুঁল রঘুকে। দুরে আবছায়া দেখা যাচ্ছে প্রিয় নদীটিকেও। কুয়াশার জল জমে টপ টপ করে পড়ছে। তার শব্দ বসে বসে শুনছে রঘু। চারিদিক নিস্তব্ধ। দুয়েকটা বন্যপ্রাণী আর পাখি ছাড়া আর তেমন কোন শব্দ নেই।

এই নৈঃশব্দে নিজেকে খুব কাছে পাওয়া যায়। নিজেকে খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। রঘু ভাবছে, কুসুমের জন্য এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সঠিক হয়েছে। অন্যথায় তার সাথে কুসুমের জীবনটা অসময়ে জড়িয়ে যেত। কুসুমও প্রাথমিক মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠে নিজেকে অসহায় মনে করতো। যেখানে নিজের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই সেখানে অন্যকে অনিশ্চিত অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ঠিক নয়। কুসুমকে রঘু আশৈশব ভালবেসেছে, দুজনের জীবনের পথ আলাদা হয়ে গেলেও এই ভালবাসা অটুটই থাকবে। রঘু এই বিয়েতে খুশিই হয়েছে। কুসুমের জীবনটা আনন্দে সুখে ভরে যাবে।

কিন্তু এটা প্রকৃতই সত্য কথা কি? কি বলছে রঘুর হৃদয় মন? কুসুমকে হারিয়ে তার এই হৃদয় কি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে না? নিজের সাথে কি নিষ্ঠুর ছলনা করে যাচ্ছে না সে প্রতিটা ক্ষণ? জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যার ছিল উপস্থিতি, তাকে ভুলতে পারবে রঘু? যে এতো প্রিয় ছিল রঘুর তাকেও ভুলে থাকা যায়? অন্তত এই বিপন্ন সময়ে? যখন কুসুমের উপস্থিতি, প্রেরণা তাকে সজীব রাখতো. উদ্যমী করতে পারতো। আর পারল না রঘু। সেই কান্নাটা দলা পাকিয়ে ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ততক্ষণ নিঃশব্দে প্রাণ ভরে কাঁদল সে যতক্ষণ তরুবালার হাত তার মাথায় না পড়েছে। রঘু বুঝতে পারল তার মারও চোখে ঘুম নেই, তিনিও জেগেই আছেন। কুসুমের বিদায় শুধু নিছক একটা ভালোবাসার পরিসমাপ্তি নয়, তারা দুজনে মিলে বিসর্জন দেবেন তাদের সবচাইতে সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত উদ্বাস্তু জীবনের মধুর দিনগুলি।

আস্তে করে তরুবালা ডাকলেন, 'রঘু।'

রঘু কোন উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। মা তার পাশে বসলেন, তার চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে সযত্নে আদর করতে লাগলেন।

'কাঁদ বাবা, প্রাণ ভরে কেঁদে নে। যেভাবে আমি কেঁদে কেঁদে তোর বাবার স্মৃতি চোখের জলে অকূল দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছি, তুইও তাই কর। ভাল করে কেঁদে নিজেকে হাল্কা করে নে।'

'আমি আর পারছি না মা।'

'আমিও তো পারছি না রে। বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে আমার। আমি কি তোর চাইতে কম ভালবেসেছি ওকে? কুসুমটা একটা পরী হয়ে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। ভাগ্যে নেই তাই ওকে ধরে রাখতে পারলাম না। কাঁদ বাবা, দেখিস মনটা হাল্কা হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে যারা কাঁদতেই থাকে তাদের কাছে দুঃখটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল তরুবালার।

'আমার জীবনের সর্বকিছু এলোমেলো হয়ে গেল মা। কোন আশাই আমার পূরণ হবে না। যা চাইছি তাই যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'তুই মনোবল হারাস নে বাবা। ঈশ্বর তোকে মেধা দিয়েছে। পূর্বপুরুষের তেজ, বীরত্ব, উদারতা দিয়েছে। তুই সুপুরুষ হয়ে জন্মেছিস। একদিন তুই অনেক উঁচুতে উঠবি, এতো উঁচুতে যেখানে অনেকেই তোর নাগাল পাবে না। আর সেই সিঁড়ি বাইতে গেলে যে পরীক্ষা দিতে হয় সেই কঠিন পরীক্ষাই তোর কাছ থেকে নিচ্ছেন ঈশ্বর।'

মা ছেলে কতক্ষণ এভাবে কথা বলছিলেন খেয়াল নেই। কষ্টের রাতটা দুজনে দুজনকেই সাহারা দিয়ে কাটালেন। হঠাৎ বাইরে ভোলার গলা শোনা গেল। 'ভাতিজা ভোর হয়ে গেছে। ওঠ।'

৯

রাতের অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়ে সারারাত ধরে ওরা হেঁটেছে। তাই ভোর হওয়ার আগেই বাড়ির কাছে ওরা পৌঁছে গেল। কিন্তু শরীর যেন আর চলছে না, শীতের তীব্র কামড়ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। একঘেয়ে হাঁটতে হাঁটতে রঘুর পাগুলি ফুলে গেছে। তবু বাড়ির কাছাকাছি এসে রঘুর ভাল লাগল। ভরত চৌধুরী পাড়া থেকে বাড়িতে ফেরা সেও এক দুরন্ত অভিজ্ঞতা। ভোলা হাই তুলে রঘুকে বলল, 'কি ভাতিজা, এবার বাড়ি যেতে পারবে তো?'

রঘু চারিদিকে একবার তাকাল। আকাশ ফর্সা হচ্ছে বটে, তবে তখনও কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে গাছপালা বাড়ি ঘর সব। রঘু বলল, 'ঠিক আছে তুমি যাও ভোলাকা, আমি চলে যেতে পারব।'

ভোলা তার আকাশি রঙের পাঞ্জাবি শার্টের পকেট থেকে একটা টাকার মালা বের করে রঘুর হাতে দিল।

'এটা রাখ ভাতিজা, ছয়টা কাঁচা রুপোর টাকা। এই টাকাগুলোর অনেক দাম।'

'কিন্তু কাকা জেনে -।'

'আহাঃ কাকা জানবে কেন? তুমি আর আমি না বললে কি করে জানবে তোমার কাকা? তবে তুমি কিন্তু টাকার মালা আর হাতির দাঁত নিয়ে তোমার কাকাকে কিছু বলবে না। শালা জীবন বাজি রাখলাম তুমি আর আমি, আর টাকা শুধু তোমার কাকার সেটি হবে না। কি ঠিক আছে?'

রঘু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ভোলা উৎসাহী হয়ে বলল, 'শোন ভাতিজা, আমি তো সব জানি। এই যে জায়গা সম্পত্তি সব তোমার বাবার। তোমার কাকার কিছুই ছিল না। রতন সাউয়ের গোদামে কাজ করতো তোমার কাকা। আমার সামনেই আলোচনা করে বলতো তোমাদের পরিবারের নানা কথা। তার ধারণা ছিল তোমার বাবা প্রচুর সম্পত্তি লুকিয়ে রেখেছেন দেশের বাড়িতে অথবা তোমার মামার বাড়িতে বা অন্য কোথাও। পরে যখন তোমরা খাদে পড়ে গেলে তখন তিনি বুঝতে পারলেন তার ধারণাটা ভুল। কিন্তু ততদিনে লোভের জিহ্বা অনেক লম্বা হয়ে গেছে, তাই কিছুই আর ফেরত দিতে মন চাইল না। অথচ দেখ তোমাদের ঠকিয়ে আজ কতো বড় মাহাজন তোমার কাকা। আর তোমরা পথের ভিখিরি। তাই ঠগকে ঠকালে পূণ্য হয় মনে রেখো।'

হঠাৎ কি মনে করে ভোলা আরও দুইটি কাঁচা টাকা রঘুর হাতে দিয়ে বলল, 'ভাতিজা আরও দুইটা মাস তুমি আমার সাথে ময়ালে চল দেখবে আর দুঃখ থাকবে না। একদম বড়লোক হয়ে যাবে। জ্যোতিবাবুকে এমনভাবে পাহাড়ের গোলমালের খবরটা দেবে যেন এই জন্মে আর ময়ালে না যায়।'

শীতের কামড় তীব্র হয়ে উঠল। ওরা আর দেরি না করে সোজা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বাড়িতে এসে রঘু অবাক হল দেখে, যে মা এবং সুনখা ঠান্দি দুজনেই জেগে রয়েছেন। 'মা' বলে ডাকতেই তরুবালা ও সুনখা দরজায় বেরিয়ে এলেন।

'কি ব্যাপার মা, তোমরা সারা রাত ঘুমোওনি?'

'কি করে ঘুমোবে তোর মা? একদিন পরে আসবি বলে আজ সাতদিন পর এলি। কোন্ মায়ের ঘুম আসবে শুনি?'

সুনখা ঝাঁঝালো প্রশ্ন করেই নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। তরুবালা অনেক ডেকেও তাকে আটকাতে পারলেন না। এই শীতের ভোরে তরুবালা রঘুর জন্য ভাত বেড়ে দিলেন। খাবে না খাবে না বলেও এড়াতে পারেনি রঘু। তার পেটেও খিদে রয়ে গেছে। ভাত খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল সে। তরুবালাও লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে রইলেন।

পরদিন থেকেই রঘু তরুবালার মধ্যে কিছু অসংলগ্নতা দেখতে পেল। তার মধ্যে যে কিছু একটু ঝড় বয়ে গেছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না রঘুর। কিন্তু বরাবর চাপা স্বাভাবের তরুবালা কিছুই বললেন না। রঘু কয়েকদিন মাকে নজরে রাখলো, কিন্তু তাকে হাজার প্রশ্ন করেও কোন উত্তর না পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেল। ময়ালে যাওয়া কি সে বন্ধ করে দেবে? কিন্তু তাহলে খাবে কি? কাকার কাছ থেকে ভাল পারিশ্রমিক পেয়েছে সে। প্রথমবার বলেই কি না বোঝা গেল না তবে রঘুকে ভাল টাকা পয়সা দিলেন জ্যোতিবাবু। যে উপার্জনে রঘুর এখন সংসার চলে সেই ময়ালে যাওয়া বন্ধ করে দিলে কি করে চলবে তাদের? রঘু ভেবে কূলকিনারা পেল না।

এদিকে তরুবালার অবস্থা ধীরে ধীরে আরও খারাপ হতে লাগল। ইদানীং রঘুর সাথেও তেমন কথা বলেন না তিনি। ঠাকুর ঘরে বিড়বিড় করে পাঁচালি পড়া ছাড়া সারাদিন চুপ মেরে বসে থাকেন। একদিন রাতে রঘুকে ডাকলেন তরুবালা। রঘু ঘরে ঢুকে দেখে তরুবালা বিছানায় ট্রাংক খুলে তার নিজের কয়েকটা অলঙ্কার দেখছেন। তরুবালা হেসে বললেন, 'কতো গয়না ছিল আমার তোর মনে আছে রঘু? এখন আর কিছুই নেই। সব বিক্রি করে ফেললাম, তোর বউয়ের জন্য কিছুই রইল না। জানিস রঘু এখান থেকে একটা পান্না বসানো হার তোকে না জানিয়ে আমি কুসুমকে দিয়ে দিয়েছি।'

রঘু বলল, 'তাতে কি হয়েছে মা। কুসুমকে দিয়ে তুমি ভালই করেছ।'

'হ্যাঁরে, আমিও তাই ভাবছি। কুসুমকে গয়নাগুলি দেব বলেই তো বুকে

আগলে রেখেছিলাম। কিন্তু কপাল যখন চাইল না তখন ভাবলাম অন্তত একটা হার ওকে দিয়ে ইচ্ছে পূরণ করি। দেওয়ার মতো আর তো কিছুই ঘরে ছিল না।'

'তুমি কুসুমের বিয়েতে গিয়েছিলে আমাকে আগে বলোনি তো?'

'ইচ্ছে করেই বলিনি।'

রঘু খুব তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'আমাকে কেন ডেকেছো বললে না তো মা?'

'এই দুয়েকটা যখন বেঁচে গেছে তুই রেখে দে রঘু। এগুলি তোর বউ ঘরে এলে দিস। এই বালা জোড়া তোর বউকে বলবি সারাক্ষণ পরে থাকতে।'

'আমি দেব কেন? তুমি তোমার ছেলের বউ ঘরে এলে নিজের হাতেই দিও।'

'ততদিন কি আমি বেঁচে থাকব? ধর আমি যদি মরে যাই তাহলে?'

রঘু হঠাৎ 'মা!' বলে এমনভাবে চমকে উঠল থেমে গেলেন তরুবালা। 'তুমি কেন মরে যেতে চাইছ মা? বাবা চলে গেলেন, তুমিও মরে যেতে চাইছ, তাহলে আমি কি করে বাঁচব? আমি যে তোমাদের ছাড়া বাঁচতে পারব না। তাহলে এস একটা কাজ করি, চল সবাই মিলে বাবার কাছেই চলে যাই। আমিও আর বাঁচতে চাই না মা।'

রঘুর মুখ হাত দিয়ে চাপা দিলেন তরুবালা। 'এ কথা কোনদিন মুখে উচ্চারণ করবি না। আমি ও তোর বাবা মিলে অনেক কষ্ট সয়েছি কিন্তু কোনদিন মৃত্যুর কথা ভাবিনি। মরতে আমিও চাই না রঘু। আমরা লড়াই করেছি বাঁচার জন্য। হেরেছি, তারপর বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি। কেন মরব আমরা? আমাদের অস্তিত্ব নীরবে বিলীন হয়ে যেতে পারে না।'

'আমি তো একথা বলতে চাইনি মা। তুমিই তো প্রথম বললে।'

'আমি তো কথার কথা বলেছি, মরতে চাইলে আরও আগেই মরতে পারতাম। এতো কষ্ট করে ছেলেটাকে বড় করেছি, যখন সে লড়াই করতে তৈরি হচ্ছে তখন তাকে একা ফেলে চলে যাব?'

দুজনেই চুপচাপ একটু সময় বসে রইলেন। অভিমানের সুরে রঘু বলল, 'কদিন ধরে তোমাকে একটু অন্যরকম লাগছে মা। তোমাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। কি যেন ভেবেই চলেছো তুমি। তোমার কি হয়েছে মা আমাকে বল?'

তরুবালা হেসে বললেন, 'ধুর বোকা ছেলে, কই আমার কিছু হয়নি তো। মনটা ভাল নেই রে আমার। কিছুদিন আগে এক সাধু এসেছিলেন। তিনি বললেন যারা পুণ্যাত্মা তারা মরে গেলেও নাকি কাশীতে ওদের দেখা পাওয়া যায়। তারপর থেকে তোর বাবা আমাকে এসে প্রতিদিন ডাকেন তার সাথে কাশী যাওয়ার জন্য।'

রঘু ঘাবড়ে গিয়ে মার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। তরুবালা তখনও বলে যাচ্ছেন, 'তুই যখন ময়ালে চলে গেলি রঘু – তোর বাবা এসেছিলেন। প্রায় প্রতিদিন তোর বাবা আসেন আমার কাছে, আমি কি করে তাকে এড়িয়ে চলি

বল?'

রঘু তরুবালার অমন সরল বিশ্বাসের কথা শুনে আর কিছুই বলতে সাহস পেল না। বাবা ও মায়ের সম্পর্ক যে কত গভীর ছিল সেটা আন্দাজ করতে পারল রঘু। বাবার অনুপস্থিতি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না তার মা। একটা মৃত্যু যেন পুরো পরিবারের সাহস, মনোবল, বাঁচার স্পৃহা সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল।

জ্যোতিবাবু কদিন ধরে রঘুকে তাড়া দিচ্ছেন ডেম্‌ডুম ও মেন্দি হাওরে ময়ালে যাওয়ার জন্য। মার এই অবস্থা দেখে পা পা করে পিছিয়ে আসছিল রঘু। এর মধ্যে ভোলাও এসে তাড়া দিল রঘুকে আর পিছিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। পাহাড়িরা সব খরচা করে ফেললে গিয়ে কিছুই আর পাওয়া যাবে না।

সেদিন আমতলি বাজার থেকে ফেরার পথে হঠাৎ বাচ্চু চৌধুরীর সাথে দেখা হয়ে গেল। একটা চায়ের দোকানে বসে এতো জোরে 'রঘুবীর - রঘুবীর' বলে ডাকতে শুরু করলেন রঘু লজ্জা পেয়ে গেল। রঘু দোকানে যেতেই ছোট্ট একটা কেবিনে রঘুকে ঢুকিয়ে পাশে বসলেন বাচ্চুবাবু।

'কিরে শালা, মেয়েটাকে বিয়ে করে ভুলে গেলি?'

'আপনি আইচুকের কথা বলছেন কাকু?'

'তাহলে আর কোন মাগীর কথা বলব রে হারামজাদা? আমার তো কোন শালী নেই যে তোর বিছানায় গছিয়ে দেব।'

বাচ্চু চৌধুরীর কথা বলার ধরন শুনে রঘু লজ্জা পেয়ে গেল। সে ইতস্তত করে বলল, 'কাকু আপনি কেন আমার উপর রাগ করছেন আমি বুঝতে পারছি না?'

'রাগ করেছি? তোর উপর? কে বলল? এই রঘুবীর রাগটাগ কোন ব্যাপার নয়। তুই বাচ্চা ছেলে এখনও বিয়ে করার বয়স তোর হয়নি। তবু মেয়েটাকে দেখে ভীষণ কষ্ট হয় জানিস। তুই চলে আসার পর মেয়েটা যেন ভেঙে পড়েছে। ওর চেহারা, শরীর সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে। ও যে দিনরাত তোর পথ চেয়ে বসে আছে ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

আইচুকতির কথা মনে পড়তেই রঘু চঞ্চল হয়ে উঠল। ভরত চৌধুরী পাড়া থেকে সে ফিরে এসেছে অনেকদিন হয়ে গেল। কি ভাবছে আইচুকতি কে জানে? রঘু কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কাকু আপনি আবার কবে যাচ্ছেন ভরত চৌধুরী?'

'আমি পেনশানের টাকা নিতে এসেছি। টাকা নিয়ে মা'র সাথে দেখা করে দুয়েকদিন পর আবার চলে যাব।'

রঘু অনেক ভেবেচিন্তে বলল, 'কাকু আমি একটা চিঠি লিখে দেব আপনি আইচুককে দয়া করে দেবেন?'

বাচ্চু চৌধুরী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'চিঠি দিবি? কেন ব্যাটাছেলের মতো

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারিস না? এই ধর তোর চিঠি আইচুক দিয়েছে।'

একটা ময়লা কাগজ টেবিলে রাখলেন বাচ্চু চৌধুরী। ফাঁকে মিঠাই এল। মিঠাই খেয়ে রঘু বিদায় নিয়ে সোজা চলে এল। আইচুকতির কথা মনে হতেই রঘুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। মুখে যাই বলুক, আইচুকতি তাহলে সত্যিই রঘুকে চাইছে, রঘুর অভাবটা সে অনুভব করছে। সরল মেয়ে তাকে কষ্ট দেওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না। ফাঁকা মাঠে এসে রঘু নিজেকে একটু আড়াল করে চিঠিটা খুলল। ফুলস্কেপ কাগজের এক কোনায় ছোট্ট করে লেখা, 'তোমার কথা আমার সবসময় মনে পড়ে ছোট মাজন। আমি কি করব জানি না। আমার একদম ভালো লাগছে না। তোমাকে ও আমাকে জড়িয়ে অনেক কথা হচ্ছে আমাদের গ্রামে। জানি না কি বিপদ কখন চলে আসে। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমার ভয় করে। ইতি আইচুকতি।'

মাঠের এদিক ওদিক শিমুল তুলা উড়ছে বাতাসে। কয়েকটা তুলার পশম গাছের ডালে, পাতায়, ঝোপঝাড়েও লেগে রয়েছে। জুমের আগুন হয়তো জ্বলছে পাহাড়ে। পুড়ে যাওয়া বাঁশের পাতার ছাইয়ের টুকরোগুলি বাতাসে উড়তে উড়তে এসে পড়ছে সমতলে। সেই ছোটবেলা চড়কে বা বারোণী মেলায় বালতি ভরা জলের নিচে কৌটাতে পয়সা ফেলত রঘু। পয়সাটা বালতির জলে দুলে দুলে কৌটা থেকে দুরে পড়ে যেত। কদাচিৎ পয়সা পড়ত কৌটায়। জুমের পোড়া বাঁশের পাতাগুলি যেন সেই পয়সার মতো হেলে দুলে নিচে পড়ে যেতে লাগল। সে যেন সন্দেশ নিয়ে এসেছে রঘুর কাছে, তার যাওয়ার সময় হয়েছে। আইচুকতি তাকে খুঁজছে। রঘু ঠিক করল দুয়েকদিনের মধ্যে মেন্দি হাওরে যাবে। তারপর কাজ সেরে সোজা চলে যাবে আইচুকতির কাছে। চিঠির শব্দগুলির অনুরণন কানে বাজছে রঘুর। 'তোমার কথা আমার সবসময় মনে পড়ে ছোট মাজন। আমি কি করব জানি না। ---।' ধরা পড়ে গেছে আইচুকতি আর পালাতে পারবে না সে।

রঘু স্থির করল এই বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত আই এ পড়তে কলেজে ভর্তি হবে না সে। কিন্তু আগামি বছর সেশান শুরু হলে আর একদিনও দেরি করবে না, মাকে নিয়ে সোজা আগরতলায় চলে যাবে। টাকা পয়সার তেমন অভাব হবে না। কারণ মা'র পেনশানটা কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো নিয়মিত পাওয়া যাবে। তার ফাঁকে কিছুদিন ময়ালে ময়ালে ঘুরে কিছু রোজগারও হয়ে যাবে। তাছাড়া প্রতি রবিবারে হালহালি বাজারে গরু, ছাগলের দালালি করেও বেশ কিছু পয়সা হাতে আসে। রঘু ভেবে দেখল একটু বুদ্ধি করে চললে মা ছেলের চলতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এই নবগ্রামে থাকলে মাকে বাবার স্মৃতি সবসময় পীড়া দেবে। তাই সে মনে মনে ভেবে একদিন কথাটা বলল তরুবালাকে। তরুবালা খুশি হলেন না দুঃখ পেলেন, বোঝা গেল না। তিনি রঘুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। রঘু বলল, 'তুমি ফালতু কাঁদছ কেন মা? এই তো ডেমডুম, মেন্দি হাওর হয়ে সাত আট দিনের মধ্যেই আমি বাড়ি ফিরে আসব। তারপর সদরে যাব পেনশানটা হয়ে গেছে কিনা

জানতে। যদি হয়ে যায় তাহলে আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। আমরা সোজা আগরতলা চলে যাব, কাকার বাধা তখন আমি আর শুনবই না।'

তরুবালা কিছু বললেন না ছেলেকে আদর করতে থাকলেন একনাগাড়ে। সেই ছোট্ট ছেলেটা ছিল রঘু। এখন কত বড় হয়ে গেছে। মাথার উপর থেকে তার বাবার ছায়াটা সরে যাওয়ায় সে যেন আরও দ্রুত বড় হয়ে উঠছে। সারাদিন ধান্দায় ঘুরে ঘুরে তার গায়ের রঙ অনেক ময়লা হয়ে গেছে, চোখগুলি বসে গেছে কোটরে। তাকে ভাল খাবার দাবারও দিতে পারেন না তরুবালা। কি করে ছেলেটা সেই ছোট্ট রঘু থেকে এতোটা পরিণত হয়ে গেল ভাবতে অবাক লাগে। সময় মানুষকে কি করে এতো দ্রুত বদলে দেয়? রঘু আর ছোটদের মতো বায়না ধরে না। বিশেষ করে পাল্টে গেছে রঘুর শিশুসুলভ মনটা।

তরুবালার মনে হল রঘু পারবে, সে নিশ্চিত উঠে দাঁড়াবে। প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত তার ছেলের মধ্যে আছে। রঘুর ভেতর পূর্বপুরুষের যে ঘুমন্ত সিংহ শুয়ে আছে সে এখন হাত পা নাড়তে শুরু করেছে। যেদিন উঠে দাঁড়াবে সেদিন ওকে সবাই সেলাম করবে। রঘুর আদব কায়দা, চলাফেরা দেখে রঘুর ভবিষ্যৎটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন তরুবালা। এই ছেলেকে কোন প্রতিকূলতা আটকে রাখতে পারবে না। সবকিছু অনায়াসে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে সে।

রঘুও তার মার দিকেই মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইল। মার মনে যে শান্তি নেই সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। বাবা মারা যাওয়ার পর ঘরবাড়ি প্রতিবেশী সব কিছু হারিয়ে মা এখন নিঃস্ব হয়ে গেছেন। রঘুর উপস্থিতিও যেন তাকে আর কোন আনন্দ দিতে পারছে না। রঘুর মনে হল ইস্ আইচুকতিকে যদি এনে মাকে একবার দেখাতে পারতো, যদি আইচুকতির সাথে কয়েকটা দিন মা থাকতেন, নিশ্চিত কুসুমের অভাবটা ধীরে ধীরে তিনি ভুলে যেতেন। কুসুমের মতো আইচুকতিরও একটা মোহময়ী রূপ আছে যা তার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, মন ও শরীরের সাথে দারুণ খাপ খেয়ে যায়। আইচুকতি এসে সামনে দাঁড়ালেই তার চারিপাশে একটা পরিবেশ তৈরি হয়।

রঘুর মাও দুরন্ত সুন্দরী। চল্লিশের উপর বয়স তারপরও আইচুকতি, কুসুমের চাইতেও রঘুর মা অনেক সুন্দরী এখনও। রঘুর মা'র চাইতে সুন্দরী মা এই পৃথিবীতে আর একজনও নেই। কতো বড় ঘরের বউ, কতো বড়লোকের মেয়ে রঘুর মা। অথচ আজ ভাগ্য তাকে কোন্ জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। দেশ ভাগের পর মার মধ্যে যে অফুরন্ত দম ছিল বাঁচার জন্য তা যেন আজ আর নেই। অস্তগামী সূর্যের আভা মার চেহারায়। কি দিয়েছে সে মাকে একবুক হতাশা ছাড়া? ছেলে হয়ে কোন প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেনি এখনও। রঘু মাকে বলল, 'মা আমার উপর ভরসা নেই তোমার?'

'একি কথা তোর মুখে রঘু? কার মুখ চেয়ে তাহলে বেঁচে আছি আমি?'

'বাবা অসময়ে চলে গেলেন। আর দু তিনটে বছর সময় পেলে আজকের এই দিন তোমাকে দেখতে হোত না মা।'

'আমি জানি রঘু। তবুও আজ আমি ভীষণ খুশি। কেন জানিস? আমি তো আমার ছেলের রোজগারের অন্ন মুখে দিচ্ছি। এই ভাগ্য সবার হয় না। আমার যে কি তৃপ্তি হয় খেতে তোকে বোঝাতে পারব না। সত্যিই আমরা কারো দয়ায় বেঁচে নেই।'

'আমাকে আর কটা দিন সময় দাও মা। ছেলেকে নিয়ে গর্ব করার সুযোগটা তোমাকে করে দেব। এই বিপর্যয় আমার পড়াশোনা করার খিদেটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সময় পেলেই আমি এখনও পড়াশোনা করি। আমি অনেক ভাল রেজাল্ট করে সবাইকে চমকে দেব দেখবে।'

অবশেষে একদিন ডেমডুমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল রঘু। পিক্‌রাই বাজার থেকে একখানা গাড়ি পাওয়া গেল রিয়াং বস্তি পর্যন্ত যাবে। সেখান থেকে জঙ্গলে পায়ে হাঁটা পথ প্রায় দশ বার মাইল, তারপর ডেমডুম। গাড়ির লেজের উপর বিভিন্ন মালের বস্তা, ছাগল, মোরগ, হাঁসের সাথে বসার সুযোগ পাওয়া গেল। ভোলা ও রঘু দুজনেই উঠে বসল লেজের মধ্যে। জিপ গাড়ির ছাদেও মানুষ। বসার সামান্য জায়গাটুকুও নেই।

কিন্তু কিছুদুর যাওয়ার পরই আবার সমস্যা দেখা দিল। সাত আট মাইল পথ এগিয়ে যেতেই গাড়িটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার চাপাস্বরে বলল, 'কেউ নড়বেন না। যে যার জায়গায় বসে থাকুন কিচ্ছু হবে না।'

রঘু তখনও বুঝতে পারেনি আসলে হয়েছে কি। সে মাথা তুলতেই ধপাস করে বসে গেল। গাড়ির সামান্য দুরে বিশাল বড় এক হাতি এবং তার পেছনে বিশাল হাতির ফৌজ। ভোলা এমনিতেই ভীতু মানুষ, রঘুর ভয় পাওয়া দেখে সে আর মাথাই তুলেনি। সামনের হাতিটা সরে গেলে জনা ত্রিশেক প্যাসেঞ্জার চুপি চুপি নেমে পিছিয়ে এসে টিলার উপরে এক রিয়াং বাড়িতে সবাই আশ্রয় নিল। বাড়ির মালিকের কাছ থেকে হাতির এমন জমায়েতের আসল কারণটা জানা গেল। একটা হাতির বাচ্চা হয়তো কোথাও গর্তে পড়ে গেছে। তাই আজ দুদিন ধরে হাতির পাল অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চাটাকে তুলতে পারছে না।

রঘু বলল, 'ভোলাকা কপালে আজ দুঃখ আছে।'

কিন্তু ভোলা সেটা মানল না। সে বলল, 'ধুর ব্যাটা আজ কপাল খুব ভাল, দেখো না হাতি দিয়েই তো যাত্রা শুরু আবার। আমদানি এই যাত্রায়ও খুব ভাল হবে।'

ওরা সবাই মিলে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত যখন রাস্তা হাতির দখলমুক্ত হল না তখন ড্রাইভার বলল সে ফিরে যাবে। যাত্রীরা প্রতিবাদ করলেও সে একগুঁয়ের মতোই সবার সাথে তর্ক জুড়ে দিল। পরদিন খুব

সকাল বেলায় সে ফিরে আসবে কথা দেওয়ায় যাত্রীরা তাকে ছেড়ে দিল। রঘু ভোলাকে বলল, 'ভোলাকা আমিও চলে যাব।'

'কোথায় যাবে?'

'বাড়ি যাব। সকালবেলা গাড়ির সাথে ফিরে আসব এখানে।'

ভোলা কি যেন ভাবল তারপর বলল, 'ঠিক আছে যাবে যাও। তবে সকালবেলা চলে এসো।'

গাড়ি ঘুরানোর জন্য স্টার্ট দিতেই দেখা গেল একটা হাতি রেগে তেড়ে আসছে গাড়ির দিকে। কিন্তু হেডলাইটের তীব্র আলো দেখে সে থমকে দাঁড়াল। ড্রাইভার দেরি না করে গাড়ি একটু পিছিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। কাঁচা মাটির রাস্তা পাথরে ভরা, গাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ড্রাইভার গাড়িতে টান দিয়ে রঘুকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে ভাই?'

রঘু পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে কাকু?'

'কুলাই বাজার।'

'আমি যাব নালিছড়া। কখন পৌছবে নালিছড়া গাড়ি?'

'যদি কপাল খুব ভাল হয় তবে আগামিকাল সকালের মধ্যে পৌছে যাব। কুলাই বাজারটা ধরতে হবে।'

'কিন্তু তুমি যে ওদের বললে আগামিকাল সকালে এখানে আসবে।'

'আসব ঠিক তবে সকালে না বিকালে। ঐ হাতির পাল কালকে বিকেল অব্দি এখান থেকে নড়বে বলে মনে হয় না।'

গাড়ি চলতে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে। গাড়িতে রঘু ছাড়া রঘুর বয়সী আরেকটা ছেলে আছে। সে এই গাড়ির হ্যান্ডিম্যান। একটু পরপর গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলে ঐ বাচ্চা ছেলেটা লাফিয়ে নেমে হেন্ডেল মারতে থাকে। এক দুবারে গাড়ি জাগে না , আট দশ বার হেন্ডেল মেরে হঠাৎ সারা শরীর কাঁপিয়ে গর্জে উঠে গাড়িটা। হেন্ডেল মেরে মেরে বেচারা হেন্ডিম্যানের অবস্থা কাহিল। তার উপর প্রতিটি ব্যর্থ চেষ্টাতে ড্রাইভারের ভাঁড়ার থেকে নিক্ষেপিত হয় বাছা বাছা শব্দবাণ। হেন্ডিম্যানের মা, বোন, বাপ কেউ রেহাই পায় না।

রঘুর চোখের সামনে আইচুকতির ছবিটা ভেসে উঠল। আইচুকতি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে এখন। সকালে ঘুম থেকে উঠে রঘুকে যদি দেখে আইচুকতির টং ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কি হবে? নিশ্চয় খুশি হবে। আইচুকতিকে এবার সব কথা খুলে বলবে রঘু। আর কটা দিন কষ্ট করে যদি রঘু বিএ পাশ করে ফেলতে পারে। তাহলে নিশ্চয় ভাল সরকারি চাকরি পেয়ে যাবে। বাবা ও মায়ের স্বপ্ন পুরণ হবে। তাছাড়া আইচুকতির পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলে নতুন করে গাঁটছড়া বাঁধার স্বপ্নও দেখতে পারবে। মাকে এখনও কিছুই দিতে পারেনি রঘু। ছেলের সফলতা ও আইচুকতিকে দেখে মা সব কষ্ট, এমনকি কুসুমের কথাও হয়তো ভুলে যাবেন।

গাড়ির দুলুনিতে রঘুর চোখে ঘুম ঘুম ভাব এসে গেল। আকাশে চাঁদ ও

তারাদের ভরা সংসার। পাহাড়ি পথ ধরে অন্ধকার চিরে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির আলো। কুসুমের কথা মনে হলেই রঘুর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। বারবার মনে মনে ভাবে কুসুমের কথা আর কোনওদিন ভাববে না সে। কুসুমকে নিষ্ঠুরভাবে ভুলে যাবে সে চিরদিনের মতো। কিন্তু বললেই কি ভুলে থাকা যায়? প্রতিদিন বারবার কুসুম সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সামনে চলে আসে। এমন এক অতল টানে কেন তলিয়ে যায় রঘু গভীর অতলান্তে সে নিজেও বোঝে না। কি করছে এখন কুসুম? নিশ্চই সুখে আছে। রঘুর এই অনিশ্চিত জীবনের স্রোতে তাকে ভেসে যেতে হয়নি। কিন্তু ফিরাযাত্রায় কুসুম তার বরকে নিয়ে বাপের বাড়ি এলো না কেন? কুসুমদের বাড়ি থেকে রঘুদের বাড়ির দুরত্ব তেমন কিছু নয়, পায়ে হাঁটা পথ। কুসুম বাপের বাড়ি ফিরলে রঘুদের বাড়িতে অন্তত একবার আসতো। কিন্তু কুসুমের কোন খবরই পেল না রঘু।

কুসুম ইচ্ছে করেই হারিয়ে যেতে চাইছে? রঘুও তাই চায়। তাহলে বারবার ফিরে আসে কেন কুসুম রঘুর স্মৃতিতে। এই পাহাড়, বন, চাঁদ, আকাশ, তারার বাগানে শুধু একটা মুখের ছবি কেন ভেসে থাকে? কেন সে হৃদয়ের গভীর থেকে বারবার টেনে ধরে বের করে নিয়ে আসে রঘুর ক্ষতগুলি। আইচুকতিকে এতো কাছে পেয়েও কেন কুসুমকে ভোলা যায় না? কেন কুসুম পাথরের মতো এখনো রঘুর বুকে চেপে বসে আছে?

হঠাৎ মাথায় জোরে একটা আঘাত পেতেই রঘুর তন্দ্রা কেটে গেল। গাড়িটা একটা বড় ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে পড়তে গিয়েও আটকে গেল রাস্তার পাশে। রঘুর মাথাটা এতো জোরে ঠুকে গেল গাড়ির সাথে রঘু প্রায় উল্টে পড়ে গেল। নিচে নেমে দেখা গেল গাড়ির একটা চাকা খুলে কোথায় চলে গেছে। জায়গাটা উঁচু থেকে ক্রমশ ঢালুর দিকে নেমে গেছে। চাকা গাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার আনন্দে কত দুর পালিয়েছে কে জানে।

ড্রাইভারের বিকট চিৎকারে হেন্ডিম্যান ছুটে এল। তারপর খোঁজাখুঁজি শুরু হল কোথায় গেল চাকা। রঘুও তাদের সাথে সামিল হয়ে খুঁজতে শুরু করল। প্রায় আধ ঘন্টা খুঁজে চাকা পাওয়া গেল একটা লুঙ্গায়। রাত তখন ঠিক কটা বাজে বলা মুশকিল। রঘুর মনে হল মাঝরাত হবে। ঘন অন্ধকার চারিদিকে। এই রাতের অন্ধকারেই টর্চের আলোতে হ্যান্ডিম্যানকে নামতে হল লুঙ্গায়। সবাই মিলে টেনে তুলে তারপর গাড়ির সাথে জুড়ে দেওয়া হল চাকা।

গাড়ির চাকা লাগানো এতো সহজ হল না। কিছু একটা পার্টস হয়তো ভেঙে গেছে। তাই আপাতত জোড়াতালি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। চাকা লাগানোর সময় একদল লোক বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে একটু দুর থেকে এদের অতিক্রম করে যাচ্ছিল। ড্রাইভার বিড়ি ধরানোর জন্য আগুন চাইলে দশ বারো জন ভিন্ন বয়েসী লোক দাঁড়িয়ে গেল। একজন জিজ্ঞেস করল, 'কি ড্রাইভারদা, গাড়ি খারাপ হয়েছে?'

ড্রাইভার হেসে বলল, 'আর বলবেন না দাদা, কপালটাই খারাপ।

আপনারা এতো রাতে কীর্তনে গিয়েছিলেন নাকি?'

'না ভাই, দাহ করে এলাম।'

'কে মরল দাদা?'

'নীতিশের বউটা। প্রায় প্রতিদিন একটা দুটো করে যাচ্ছে ভাই।'

'কেন কি হয়েছে? কলেরা নাকি?'

'তার চাইতেও খারাপ দাদা, কালাজ্বর।'

'সেটা আবার কি জ্বর? শুনিনি তো কখনো।'

'মহামারী দাদা, সোজা কথায় মহামারী। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে, মাথাটা ভয়ঙ্কর কামড়ে ধরবে। ব্যস্ তিন থেকে সাতদিনের মধ্যে কারবার ফতে। রুগী মরে ডাট্টা হয়ে যায়।'

অন্য একজন বলল, 'এ এক আজব দেশে আইলাম দাদা। এখানে মানুষের খাবার কিছু নাই। কিন্তু মানুষকে খাওয়ার হাজার উপাদান আছে। বাঘে খায়, ভাল্লুকে খায়, এখন দেখছি কালাজ্বরে আরও বেশি খায়।'

অন্য একজন জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাইভারদা, এই জ্বরের অষুধ কোথায় পাওয়া যায় আপনি জানেন? চোখের সামনে গ্রামটা উজাড় হয়ে যাচ্ছে। কিছুই করতে পারছি না আমরা।'

ড্রাইভার অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল। রঘু এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা আগরতলায় লোক পাঠান। কুইনাইন খেতে হবে। এই রোগটার নাম ম্যালেরিয়া, মশা থেকে ছড়ায়।'

'আগরতলা! এই জায়গা আবার কোন দিকে যায়? নাম তো শুনি নাই। এটা কি বাল্লার ইষ্টিশানে?'

'আরেকজন বলল, কোন হালায় যে যুক্তি দিল আর তোমরাও সবাই মিলে সালেমা এসে বাসা বাঁধলা। রূপসপুরের দিকে থাকলে অন্তত শ্রীমঙ্গালের সাথে যোগাযোগটা থাকতো।'

কথা বলতে বলতেই ওদের লুক্কার আগুন দুরের অচেনা রাস্তার অন্ধকারে ডুবে গেল। রঘু অবাক হয়ে শুনল ওদের কথা। কি নিদারুণ দুঃসহ যন্ত্রণাময় জীবন কাটাচ্ছে উদ্বাস্তুরা। ড্রাইভার আবার গাড়ি স্টার্ট দিতেই গাড়ি ছুটতে লাগল। রঘু বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তরুবালা কিছু চিঁড়া ও গুড় বেঁধে দিয়েছিলেন। রঘুর খিদে পেতেই গামছা খুলে চিঁড়া গুড় চিবোতে লাগল। গাড়ির সামনে মাঝে মাঝে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বন্য ছোট জন্তু জানোয়ার দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। গাড়ির 'ভঁা' করে হর্নের আওয়াজ পেয়ে ওরা আবার পালিয়ে যেতে লাগল।

পরদিন ভোরবেলা দুইটি ছড়ার সঙ্গামস্থলে এসে পৌঁছে গেল রঘু। নালিছড়ার পাশে এই দুটি ছড়ার কাছে দাঁড়ালে সামনে ভরত চৌধুরীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। গাড়ি থেকে নেমে রঘু কয়েক মুহূর্ত ঐ নীলাভ সবুজ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। আর ঘন্টাখানেকের হাঁটা পথ পেরুলেই ভরত চৌধুরী পাড়া

সামনে এসে দাঁড়াবে। অনেকটা পথ হেঁটেও ভরত চৌধুরীর দুর্গম রাস্তা যেন আর শেষ হতে চাইছে না। দ্রুত, আরও দ্রুত, কিসের অজানা টানে রঘু ছুটতে লাগল। পথে দুয়েকজনের সাথে দেখা হল, কুশল বিনিময়ও হল বটে। কিন্তু ভরত চৌধুরী এসে রঘু লক্ষ্য করল পুরো পাহাড়ি বসতিটা একদম ফাঁকা, লোকজন নেই। আইচুকতিদের বাড়িতেও কেউ নেই। শুধু কলাগাছের পাতাগুলি মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে। এদিক ওদিক খুঁজে কাউকে না পেয়ে রঘু হতাশ হয়ে পড়ল।

একজন বয়স্ক লোককে পেয়ে রঘু আইচুকতিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। লোকটা মুখে কিছু না বলে, উত্তর পশ্চিমদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'হুই।' রঘু বুঝতে পারল ওরা উত্তর পশ্চিমদিকেই আছে। কিন্তু উত্তর পশ্চিমদিকে কতদূরে ওরা আছে সেটা ঐ বুড়ো লোকটার ব্যক্ত সংকেত থেকে ধরা পড়ে না। রঘু কাছেই হবে ভেবে এগোতে লাগল। কিন্তু অনেকটা পথ এগিয়েও আইচুকতিদের খোঁজ পেল না রঘু। এবার আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কারণ যতই উত্তর পশ্চিমদিকে যাচ্ছে ততই আরও ঘন অরণ্যে ঢুকে যাচ্ছে সে। রঘুর হঠাৎ বটের দাড়ি দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলার ঘটনাটা মনে পড়ল।

এবার দুজন মাঝবয়সী মহিলার সাথে দেখা হয়ে গেল। তারা তাদের জুমের খেতে কাজ করছিলেন। রঘু ওদেরও আইচুকতিদের কথা জিজ্ঞেস করতেই ওদের একজনও বললেন 'হুই।' রঘু ককবরক বুঝে না, তাই কথার বিনিময় খুব একটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে সে বুঝতে পারল এই 'হুই' তে প্রথম 'হুই' এর মতো জোর নেই। তার মানে ওরা কাছাকাছিই আছে। রঘু মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করল যেভাবেই হোক আইচুকতিকে তার খুঁজে পেতেই হবে। এতো কাছে এসে ওকে সে হারাতে পারে না।

এক ধরনের জংলি পোকা অবিরাম ডেকে চলে পাহাড়ে। রঘুরা ওদের খরার পোকা বলে। এছাড়া অরণ্যে আলাদা ভারি একটা শব্দের অনুরণন সর্বক্ষণ শোনা যায়। রঘু সেই রহস্যময় শব্দ শুনে এগোতে লাগল। গা ছমৃছম্ করা এই শব্দের সাথে একটা মাদল যেন মিশে হঠাৎ বেজে উঠল। রঘু সত্যিই মাদলের শব্দ পেয়েছে নাকি মনের ভুল বোঝার জন্য আবার কান পেতে রইল। না শব্দটা আসছে ঠিকই, খুব ধীর লয়ে হাওয়ায় ভেসে ভেসে। রঘু খুশি হয়ে গেল।

রঘু যত এগিয়ে যেতে লাগল মাদলের শব্দটা ধীরে ধীরে ততই স্পষ্ট হতে লাগল। সাথে পুরুষ মহিলা কণ্ঠের লোকগানও কানে ভেসে এল। রঘু বুঝতে পারল আর দূরে নয়। আইচুকতিদের কাছাকাছি চলে এসেছে সে। শব্দটা যে টিলা থেকে এসেছে সেখানে এসে দাঁড়াল রঘু। অরণ্যের মাঝখানে ছোট বড় গাছপালা কেটে জঙ্গলসহ সবকিছু পুড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে চাষযোগ্য একফালি টিলা জমি যেন সুদৃশ্য একটা প্রাকৃতিক মঞ্চ। ঐ মঞ্চে নেচে গেয়ে অভিনয় করে যাচ্ছে একদল মানুষ। ওরা পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে টাক্কাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে তার মধ্যে পুঁতে দিচ্ছে বীজ। দলনেতা মাদল বাজিয়ে গান গেয়ে তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

সবাই গানের তালে তালে কাজটা করে যাচ্ছে। রঘু মুগ্ধ হয়ে গেল এই দৃশ্য দেখে। এখানে কোন এক পরিবারের লোক নেই। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের লোকেরা একে অন্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছে প্রতিদিন। গান বাজনা ও নৃত্যের তালে তালে পুরুষ মহিলা, যুবক যুবতীরা একসাথে কাজ করায় পরিশ্রমটা এখানে গৌণ হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক মেলামেশা, আনন্দ খুশি প্রাধান্য পাচ্ছে।

মুগ্ধতার চমক ভাঙলে রঘু দেখল ঐ দলে ও তার চারপাশে আইচুকতি বা চেনা পরিচিত কেউ নেই। একজন লোক রঘুর কাছে এগিয়ে এসে জানতে চাইল রঘু কেন এসেছে এখানে। কারণ জানতে পেরে রঘুকে তিনি পাশেই আইচুকতিদের টিলাটা দেখিয়ে দিলেন। খুশির তরঙ্গ তুফানের মতো আছড়ে পড়ল রঘুর মনে। সামনেই নীলাভ সবুজ বিশাল পাহাড়। তার পেছনের টিলাতেই ঢাকা পড়ে আছে আইচুকতিদের টং ঘরটা। জুমের খেতও ঐ পাহাড়ের ঢালে নিশ্চয় আছে।

রঘু ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়াল টং ঘরের সামনে। টং ঘরটা টিলার বুকের কাছাকাছি বানানো হয়েছে। নিচে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে জুমের খেত। খেত জুড়ে বিভিন্ন ফসলের গাছ সবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ঐ গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে চার পাঁচটে মাথায় বাঁধা কাপড় শুধু চোখে পড়ল। রঘু জুমের খেতে পা রাখতেই বিনন্দকে চোখে পড়ল। সবাই কাজ করলেও সে তখন গাছের নিচে বাঁশের মাচানে শুয়ে আছে। যদিও তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেও খুব পরিশ্রান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। রঘু গিয়ে ডাকতেই বিনন্দ উঠে বসল।

'আরে ছোট মাজন, তুমি!'

রঘু ইতস্তত করে বলল, 'না মানে জ্যোতিকাকা পাঠালেন তাই আসতে হল। ভাবলাম এখানে যখন এসেই গেছি তখন আপনাদের সাথে দেখা করে যাই।'

বিনন্দর রঘুর কথা শোনার অবকাশ নেই। সে রঘুকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে ডাকল আইচুকতিকে, 'আইচুকতি ফাইগাদি। ছোট মাজন এসেছে।'

বিনন্দ তাকে দেখে খুশি হওয়ায় প্রাথমিক ভয়টা কেটে গেল রঘুর। সে ভেবেছিল আইচুকতির বাবা হয়তো রঘুকে দেখে বিরক্ত হবেন। আবার ফিরে এল কেন সে ব্যাপারে জানতে চাইবেন। ভাগ্যলক্ষ্মীও বিনন্দের ডাক শুনে উঠে দাঁড়ালেন। জুমের খেত থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন 'আইচুক, আইচুক-।' ভাগ্যলক্ষ্মীর ডাকে সব কজন নারী পুরুষ জুমের কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

রঘু কাউকেই দেখতে পায়নি। যাকে দেখার জন্য এতদুর ছুটে এসেছে সে তাকে দেখে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। আইচুকতি ঘরেই ছিল। মায়ের ডাকে বেরিয়ে টং ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। পাছড়া পরা, গামছা বাঁধা চুল, উর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত। আইচুকতির শরীরে তখন আগুন জ্বলছে। তার পেছনে টং ঘর, তারও পেছনে উঁচু বিশাল নীল সবুজ পাহাড়। শিল্পীর তুলি দিয়ে পাহাড়ের মাঝে মাঝে কালো রঙ ছড়ানো। পাহাড় থেকে এদিক ওদিকে টানা হয়েছে যেন লুঙ্গাগুলি। তার সামনেই উদ্ধত গ্রীবা তুলে উদ্ভাসিত শরীরের যাবতীয় নিখুঁত জীবন্ত কারুকার্য্য

নিয়ে সামনে দাঁড়াল আইচুকতি। এক অহংকারী অরণ্য দুহিতার একি অসাধারণ রূপ লাবণ্য! যেন সৃষ্টিকেও তাক লাগিয়ে দিতে পারে। এই রূপ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দেবে যে কোন পুরুষের শরীর ও মন। যে দৃশ্য দেখার জন্য একজন পুরুষ হাজারবার জন্ম নিতে পারে। যে রূপ দেখে একজন পুরুষ নিজেকে হাসি মুখে ধ্বংস করে দিতে পারে। সেই সুন্দরতম রূপ প্রকৃতির সাথে মাখামাখি করে সামনে চলে এল।

আইচুকতি রঘুকে দেখতে পেয়ে মুচকি হাসল। রঘুর এই আবিষ্ট চেহারা দেখে নিজেকে সামলে মাথার গামছা খুলে বুকের উপর জড়িয়ে নিল সে। পিরিখা আইচুকতির সামান্য ছোট। সে ঘরের কাজ করে যাচ্ছে একমনে। যে দৃশ্য রঘুকে আপাদমস্তক নাড়িয়ে দিয়ে গেল, চোখ পুড়িয়ে দিয়ে গেল, তাতে উপস্থিত কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু রঘুর চোখ জুড়িয়ে জ্বলে পুড়ে গেল ভয়ানকভাবে। কুসুমের সুন্দর শরীর রঘুকে বারবার আকৃষ্ট করেছে, কৌতূহলী করেছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতা ছিল যথেষ্ট। আইচুকতির এই অনিন্দ্য সুন্দর রূপ উদ্দাম ঝড়ের কবলে পড়া পাল তোলা নৌকার মতো ঝলক দিয়ে পাগল করে হারিয়ে গেল।

বিনন্দ ভাগ্যলক্ষ্মী রঘু আসায় খুশি হল। ওকে বসতে বলে ওরা কাজে নেমে গেল। আইচুকতি ছুটে এল রঘুর কাছে। রঘুকে টেনে নিয়ে গেল টংয়ের ভিতরে। মাচানের উপর রঘুকে বসিয়ে সামনে দাঁড়াল আইচুকতি। গামছায় ঢাকা ওর দুটি স্তনের সীমানা এখনও রঘু চোখ দিয়ে স্পষ্ট আঁকতে পারছে। রঘু চোখ যেন নাড়াতেই পারছে না। আইচুকতি মুচকি হেসে বলল, 'তুমি এবার কদিন থাকবে ছোট মাজন?'

'তুমি খুব সুন্দরী আইচুক।'

'ধুর যা।'

'সত্যি বলছি।'

'একদম ফাজলামি করবে না। এবার কদিন থাকবে বল তো?'

'আমি আগামিকালকেই চলে যাব। মার শরীর খুব খারাপ।'

'কি হয়েছে মা'র?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝেই বিড়বিড় করে কথা বলছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এসব নানা ঝামেলা শুরু হয়েছে।'

আইচুকতির মুখটায় কালো মেঘ নেমে এল। রঘুর মার জন্য সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। রঘু পরিবেশ হালকা করার জন্য বলল, 'কি হল? তুমি মন খারাপ করছ কেন?

'মার জন্য চিন্তা হচ্ছে ছোট মাজন। তাহলে তুমি কদিন পরে এলেই পারতে।'

'বাচ্চু কাকুর কথা শুনে আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তোমার জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাই চলে এলাম। তুমি খুশি হয়েছো তো আইচুক?'

'জানি না।' মুচকি হেসে আইচুকতি আবার বলল, 'একটা মজার ঘটনা হয়েছে ছোট মাজন।'

'কি?'

'পাড়ার কয়েকজন মুরুব্বি আমার নামে আমাদের পরিবারের নামে দুর্নাম করে লামের কাছে বিচার দিয়েছিল।'

'লাম কে?'

'ভরত চধ্‌রী, আমাদের দলপতি।'

'কিসের বিচার?'

'আমি যে তোমার সাথে কয়েকদিন মেলামেশা, ঘোরাফেরা করেছি, তাই ওরা নালিশ করেছে।'

'বল কি! তারপর?'

'লাম বাবাকে ডেকে বলেছেন, বিনন্দ মেয়ে বড় হয়েছে। মেয়েকে সামলাও। না হয় বিপদ ঘটবে।' তা শুনে বাবা বললেন, এইটা মাজনের পুলা আমি কি করে আটকাব? আমি বাধা দিলে না খেয়ে মরব।'

রঘুর কৌতূহল বেড়ে গেল, 'তারপর কি হল আইচুক?'

'লাম জানতে চাইলেন আমাদের ইচ্ছা কি সেটা আগে বলতে।'

'বাবা বললেন -।' কথাটা বলেই আইচুকতি লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। রঘু অধৈর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'থামলে কেন আগে বল।'

'আমার খুব লজ্জা করছে।'

'ধুর বোকা লজ্জা কিসের? বল।'

'বাবা বলেছেন, আমার মেয়ের ইচ্ছা আছে, আমাদেরও। দা-বুড়া বলেছেন, বিনন্দর কপাল ভাল বড় বংশের মেধাবী ছেলে রঘু। দেশে ওদের জমিদারি ছিল, ওর বাবা শিক্ষক ছিলেন। ছেলে চাইলে আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই।'

'তারপর লাম রাজি হলেন?'

'অনেক দরবার করে তবে লাম রাজি হয়েছেন বটে, তবে একটা শর্ত জুড়ে দিলেন।'

'কি শর্ত?'

'তোমাকে আমাদের সামাজিক প্রথা মেনে জামাই খাটতে হবে।'

রঘু হেসে বলল, 'ওসব কিছুই করতে হবে না আইচুক। আমি এমনিতেই তোমাকে নিয়ে একদিন পালিয়ে যাব।'

কথাটা শেষ করেই অপ্রস্তুত আইচুকতিকে টেনে মাচানে শুইয়ে দিল রঘু। চমকে উঠল আইচুকতি, 'এই কি করছ ছোট মাজন?' রঘুর মজবুত বাহু ও বিশাল বুকের ছাতির নিচে হারিয়ে গেল আইচুকতি। ওর বুকের চঞ্চল ধুক্‌পুক্ শব্দ অনুভব করছে রঘু। কিন্তু মুহূর্তের চঞ্চল মনটাকে সংযত করল সে। 'আমি তোমার জন্য

পাগল হয়ে গেছি আইচুক।'

'আমাকে নিয়ে যাবে তো ছোট মাজন?'

আইচুকতির সরল সাদাসিধে প্রশ্নগুলি এতো কোমল রঘুকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। রঘু এবার উঠে বসল। আইচুকতির মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পড়া এলোমেলো চুলগুলি সযত্নে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আইচুক।'

'কখন নিয়ে যাবে আমাকে? আমি তোমার বাড়িতে গেলেই দেখবে মা সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'এই তো অল্প কটা দিন - ধর, বড় জোর বছর দুয়েক অপেক্ষা করবে।'

মুহূর্তে দপ্ করে বাতি নিভে যাওয়ার মতো সমস্ত উৎসাহ আইচুকতির চোখ মুখ থেকে উধাও হয়ে গেল। রঘু বুঝতে পেরে বলল, 'কি হল আইচুক তুমি রাগ করলে?'

'উঁ?' ছোট্ট উত্তর দিল সে।

'দেখো আমি সামনেই কলেজের ভর্তি হব। কলেজে পড়া শেষ করার আগেই আমি তোমাকে বিয়ে করব। কারণ আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আইচুক।'

আইচুকতি উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে সে চিন্তিত। রঘু হেসে বলল, 'এই - কি ভাবছ আইচুক?'

'দুবছর তো অনেক দেরি ছোট মাজন।'

'আমি জানি আইচুক। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এইটুকুন অপেক্ষা তো করতেই হবে। আমি তোমাকে খুশি দেখতে চাই। আমাদের ভবিষ্যত যেন নষ্ট না হয় সেটাও তুমি ভাববে নিশ্চয়ই।'

আইচুকতি কি বলবে? সে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। যে ছোট্ট দীপ সে বুকের কোণে জ্বালিয়ে রেখেছিল রঘুর অপেক্ষায়, তা যেন রঘু নিভিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে। আর কোন বিষয়ে কথা বলতে তার ইচ্ছা হল না। টং ঘরের খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। কয়েকটা সাদা বক দল বেঁধে নীলাকাশে সাদা মেঘের বুকে মিশে গেল। আইচুকতি ভাবতে লাগল ওরা কোথায় চলে যায় প্রতিদিন। বারবার প্রতিবার আবার ফিরে আসে কেন নিজের ঘরেই?

রঘু ডাকল, 'আইচুক।'

কোন উত্তর দিল না আইচুকতি। রঘু বলল, 'বেশ তাহলে চল আগামিকালই আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

তীব্র আপত্তি করল আইচুকতি, 'না। তা আর হবে না ছোট মাজন।'

'কেন?'

'আমি তোমাকে ভালবেসেছি। তোমার ক্ষতি হোক এমন কিছুই আমি চাইব না। তুমি ঠিকই বলেছো তুমি কলেজ শেষ করে এসো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। আসবে তো?'

'নিশ্চয়ই আসব।'

'আর বিয়ে?'

'আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে আইচুক। তুমি আমার বউ। এবার আমরা শুধু ঘর বাঁধব।'

'তুমি সত্যিই ফিরে আসবে তো ছোট মাজন?' হঠাৎ আইচুকতির দুচোখ জলে ভরে গেল।

রঘু আইচুকতিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এই পাগলি কি হল? ভরসা নেই আমার উপর?'

'তুমি যদি দুবছরের মধ্যে না ফিরে আস তাহলে আমি নির্ঘাৎ মরে যাব। আমাকে আর পাবে না তুমি।'

ভালবাসার এই যে টান, তার তো কোন সীমা নেই। হৃদয়ের গভীর থেকে জেগে উঠে অন্তরতমর নিষ্পাপ মুখ। আইচুকতি যেন রঘুর দিকে তাকাতেই পারছে না। রঘু চলে যাওয়ার পর থেকে সে কয়েদির মতো গুনতে থাকবে প্রতিটি দিন। দুটি বছর মনে হবে তার কাছে অনতিক্রম্য সাগরের মতো। যার কোন কূল কিনারা নেই। সে রঘুর দিকে না তাকিয়ে কাঁদতেই থাকল।

পরদিন রঘুও সবার সাথে জুমের খেতে নেমে গেল। তাছাড়া করবেই বা কি সে একা টং ঘরে বসে বসে। অচেনা পাহাড়ি যুবকের মতো সুমুল বাজিয়ে একা একা বিরহী কাকে আহ্বান করবে? যার জন্য সমস্ত হৃদয় মন চাতকের মতো প্রতীক্ষায় ছিল সে তো এখন রঘুর পাশেই আছে। রঘুর চোখে মুখে তৃপ্তির ছাপ। এই পাহাড় বড় মায়াবী। পরির মতো তার বিশাল ডানা মেলে সবাইকে যেন আপন করে নেয়। এই পাহাড় এবং তার মানুষজনের হৃদয়ের কোথাও কোন সংকীর্ণতা নেই, তাদের হৃদয়ের কোথাও কোন মলিনতা নেই। বরং তাদের বিশাল হৃদয় তারা উজাড় করে দিতেই যেন আনন্দ পায়। একমাত্র দারিদ্র ও রোগ ছাড়া তাদের আমুদে স্বভাব কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

আইচুকতি এতো কাঁদল কেন রঘু প্রথমে বুঝতে পারেনি। তাহলে আইচুকতি কি এখনও তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না? যার টান রঘু রক্তে অনুভব করে সে কি চোখ বন্ধ করে রঘুর অস্তিত্ব টের পায় না? রঘু আইচুকতিকে চেপে ধরল, কেন সে এতো দুশ্চিন্তা করছে। আইচুকতি প্রথমে কিছুই বলতে চায়নি। বারবার চাপাচাপি করায় সে বলল, 'খেলেঙ বুবারের কাহিনি জানো ছোট মাজন?'

রঘু অবাক হয়ে তাকাল, 'কে খেলেঙ বুবার?'

'খেলেঙ মানে ফুল। এই ফুলের একটা কাহিনি আছে।'

'কি বল?'

'এই ফুল প্রেমিকাকে উপহার দিতে গিয়ে প্রেমিকটা হারিয়ে গিয়েছিল।'

'কেন?'

'ঐ গাছের প্রথম ফুলের গন্ধ শুঁকতে নেই। অভিশাপ আছে বাবা গড়িয়ার।

যদি কেউ প্রথম ফুলটা মাটিতে না ফেলে গন্ধ নেয় তাহলেই বিপদ। বাবা গড়িয়া গাছের পুরুষটিকে তার কাছে নিয়ে যান। আর কোথাও তাকে পাওয়া যায় না।'

'তাই নাকি?'

'সেই প্রেমিকটাও প্রেমিকার কাছ থেকে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। বেঁচে থাকতে তাদের আর দেখা হয়নি। লোকে বলে প্রতিবছর শুধু একবার দেখা হয় ডুম্বুরে গড়িয়া পুজার সাত দিন আগে। '

'আরে তুমি কাঁদছ কেন? এটাতো একটা লোককথা মাত্র।'

'তুমিও সেই অজানা ফুলের খোঁজেই যাচ্ছ ছোট মাজন।'

রঘু অবাক হয়ে তাকাল আইচুকতির দিকে। 'এসব কি ভাবছ তুমি? কেন মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ?'

'কেন জানি না ভরসা পাচ্ছি না।'

'যাকে ভালোবাসবে তাকে কখনো সন্দেহ করতে নেই।'

পিরিখা পাশেই বসে কাজ করছিল সে রঘুর কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তোমারা বাঙালী জাতটা খুব শয়তান। মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নষ্ট করে পালিয়ে যাও।'

আইচুকতি বাধা দিলে আরও খেপে উঠল পিরিখা। 'তোকে আমি কি শিখিয়ে দিয়েছিলাম বাই? তোকে বলেছিলাম না ছোট মাজনকে ভাল করে বাজিয়ে দেখে তারপর মিশবি। তুই তো ছোট মাজনকে দেখেই নরম হয়ে গেলি। আমি টংয়ের পাশে লুকিয়ে সব দেখেছি, আর একটু এগোলেই বাধা দিতাম।'

লজ্জায় আইচুকতির ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেল। রঘু পিরিখার চটরপটর স্পষ্ট কথা শুনে হেসে উঠল। 'পিরিখা বাঙালিদের কেন তোমার শয়তান মনে হল?'

'শয়তান বলে শয়তান - বাঙলিরা হাড় শয়তান। আমার ইস্কুলের মাষ্টার সুনন্দ ঘোষ ইস্কুলের এক ছাত্রীকে বিয়ে করল। এটা নিয়ে অনেক জলঘোলা হলেও পরে দলপতি বিয়েটা মেনে নিলেন। অথচ লোকটা প্রথম বাচ্চাটা জন্মানোর পর কোথায় পালিয়ে গেল। তারপরও মাঝে মাঝে ফিরে আসতো। কিন্তু দ্বিতীয়টার জন্মের পর ঐ সুনন্দ ঘোষকে আর পাওয়া যায়নি। এখন ঐ ছেলে দুটি অনেক বড় হয়েছে। ওরা ওদের বাবাকে খুঁজেও পেয়েছে। লোকটা নতুন করে বিয়ে থা করে বড় সংসার পেতেছে সদরে। অথচ দেখো আমাদের সমাজ যদি মেয়েটাকে আশ্রয় না দিত মেয়েটার কি হোত ভাবতে পার?'

আইচুকতিও বলতে লাগল, 'আমার বন্ধু মঙ্গালা, তাকে বিয়ে করেছে আমাদের পার্টির একজন আন্ডারগ্রাউন্ড কমরেড্। বিয়ে তো করেছে ঠিকই কিন্তু লোকটার এখন আর কোন খোঁজ নেই। আগে চলে গেলেও মাঝে মাঝে সে ফিরে আসতো পার্টির কাজে। কিন্তু দুবছর হল সে আর আসছে না। লোকটা মরে গেছে না আবার ফিরে আসবে কিছুই বুঝতে পারছে না মঙ্গালা। সে যে আবার কোন

পুরুষের সাথে ঘর বাঁধবে সেটাও পারছে না। কারণ ঐ লোকটা যদি আবার ফিরে আসে?'

পিরিখা ধমকে উঠল, 'তুই চুপ কর বাই। সে আবার ফিরে আসবে। বেচারা মজা লুটে নিয়েছে এখন মঙ্গলা ছিবড়ে হয়ে গেছে। ঐ ছিবড়ে চিবিয়ে লাভ আছে? তুই এক কাজ কর বাই, ছোট মাজন যদি ফিরে আসে ভাল, না হয় দুবছর পর অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলবি।'

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে পিরিখা।'

পরদিন সকালে আবার সবার সাথে জুমের খেতের সামনে এসে দাঁড়াল রঘু। জুমের খেতগুলি অপূর্ব সুন্দর। পছন্দ করা জমিটার সব গাছপালা, জঙ্গল পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। সাধারণত পাহাড়ের কোন ঢালেই জুমের খেত করা হয়। বৃষ্টির জল যেন কোথাও আটকে না থাকে তাই সেই জমিটা হয় একদম খাড়াই। সেই জমিতে একই জায়গায় টাক্কাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি খুঁড়ে একসাথে ধান, তিল, কুমড়ো, পাট নানান বীজ পুঁতে দেওয়া হয়। যার যার সময় মতো এক একটা ফসল বেড়ে উঠে পেকে যায় বাকিরা বড় হতে থাকে। ঐ ফসল পরিচর্যা করতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হয়। না হলে ফসল ভাল হয় না। কচি ধানের গাছগুলি বেশ লম্বা হয়েছে। কালচে সবুজ গাছগুলির গোড়ায় অন্য বীজগুলিও অঙ্কুরিত হচ্ছে। রঘু আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। হঠাৎ দুই বোন খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল। পিরিখা মজা করে বলল, 'ছোট মাজন, তুমি কি শ্বশুরবাড়িতে জামাই খাটছ?'

রঘু মজাটা বুঝতে পেরে বলল, 'আরে তাইতো, শোন আইচুক তোমাদের লাম আর বলতে পারবে না আমি জামাই খাটিনি। পিরিখা বলল, 'জামাই খাটা তো সবে শুরু হয়েছে আরও অনেক ফাই ফরমাশ খাটতে হবে। না হয় ভাতে ছাই পড়ে যাবে বুটি ভিজবে না।'

'বল আর কি করতে হবে?'

'আমার শরীরটা ম্যাজ্ম্যাজ্ করছে একটু টিপে দিও তো দুপুরে ছোট মাজন।' আইচুকতি চোখ পাকিয়ে তাকাল।

'থাক ছোট মাজন তুমি বরং বাইর শরীরটাই ভাল করে টিপে দিও। না হয় অনেকের গা জ্বলবে।'

তিনজনেই হেসে ফেলল এক সাথে। কিন্তু পিরিখার খুনসুটি বন্ধ হল না। আইচুকতি রঘুকে ফাঁকায় পেয়ে পাশে এসে বসে একসাথে কাজ করতে লাগল। রঘু আইচুকতিকে দেখে কিছুটা খুশি হল। গতরাতের কালিমা ওর চেহারা থেকে মুছে গেছে। সে এখন অনেক স্বাভাবিক। রঘু হেসে বলল, 'যাক তুমি হাসতেও জান তাহলে আইচুক?'

'আরও কটা দিন থেকে যাও ছোট মাজন। তোমাকে ছাড়তে আমার আর

ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'দেখি।'

রঘু মনে মনে ভাবল কয়েকটা দিন থেকেই যাবে সে পাহাড়ে। যত বেশি দিন তাদের পাশে থাকবে ততই আইচুকতি ও তার পরিবার ভরসা পাবে। রঘুকে বিশ্বাস করতে পারবে। আইচুকতি আবার বলল, 'তুমি আমায় সত্যি ভুলে যাবে না তো ছোট মাজন?'

'তোমাকে কি ভুলে থাকা যায়?'

'যদি তুমি আর ফিরে না আস আমি মরে যাব। মরে এই যে দেখছ, এই রকম দুংসৌক লতা হয়ে জন্মাব। তুমি যে কোন জুমের খেতে গিয়ে এই লতার গায়ে হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করতে পারবে।'

'তুমি কি সব ভাবছ আইচুক। তোমাকে ভুলে যাব কেন? তবু বিপদে পড়ে যদি কোথাও আটকে যাই তুমি আমাকে ভুল বোঝো না। আমার জন্য অপেক্ষা করবে যতদিন আমি ফিরে না আসি।

আইচুকতি কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ কাজ করে যেতে লাগল। রঘু আবার মিনতি করে বলল, 'কি আইচুক অপেক্ষা করবে তো?'

'হিন্দু মেয়েদের দুবার বিয়ে হয় না ছোট মাজন। যদি তুমি ফিরে না আস আমি মরব, তবু আর বিয়ে করব না।'

বাচ্চু চৌধুরী গাছের গুড়িটাকে কুড়োল দিয়ে চেলি করার চেষ্টা করছেন। বর্ষা আসছে। জুমের খেতে ফসলের গাছগুলি বর্ষার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তার আগে লাকড়ি সংগ্রহ করে রাখা দরকার। বাচ্চুবাবুর শত্রু নেই। পাহাড়িরা তাকে ভাবে পাহাড়ি আর বাঙালিরা ভাবে বাঙালি। যদিও তিনি নিজেকে পাহাড়ি ভাবতেই ভালবাসেন। পাহাড়িদের সহজ সরল জীবন যাত্রা, পরোপকারী মন, জীবন সম্পর্কে সহজ ভাবনা, বাচ্চুবাবুকে খুব টানে। রিটায়ার করার পর কবে কখন পাহাড়ের টানে চলে এসেছেন এখানে কেউ জানে না। বিয়ে করেছেন পাহাড়ি মেয়ে অল্পদিন আগে। সব মিলিয়ে আজ অনেক বছর ধরে পাহাড়েই আছেন। শুধু মাসে একবার পেনশান তুলে মাকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আবার চলে আসেন এখানে। খাবারের কোন অভাব নেই তার। শিকার করে মাংস পান, আর পাহাড়িরা দেয় দুধ। পাহাড়িরা দুধকে গরুর পুঁজ বলে ঘেন্না করে খায় না। অনেক বুঝিয়েও তাদের দুধ খাওয়া শেখাতে পারেননি তিনি। তাই নিজেই খান।

একটা আর্মি প্যান্ট ও হাতকাটা গেঞ্জি পরে তিনি দরদর করে ঘামছিলেন। তার স্ত্রী ঘরে নেই। হয়তো কোথাও গেছেন বাঁশ করুল খুঁজতে অথবা অন্য কোন কাজে। রঘু আর আইচুকতি তার কাছে পৌঁছতেই কুড়োলটা রেখে দিলেন বাচ্চুবাবু। বিশাল গোঁফ জোড়া দুই হাতে মোচড় দিয়ে বললেন, 'রঘুবীর, তাহলে তুই এসেছিস?'

'হ্যাঁ কাকু।'

'কিরে আইচুক এবার খুশি হয়েছিস তো? খুব তো সেদিন দুবোন মিলে বাঙালির বদনাম করে গেলি। এখন দেখলি তো। আসলে কি জানিস, সব বাঙালি যেমন খারাপ নয় তেমনি সব ভালও নয়। ভাল খারাপ সব জাতেই আছে। তবে রঘুবীর ভাল ছেলে এটা আমি তোকে বলতে পারি। নে বোস ঘরে গিয়ে, আসছি আমি।'

দুজনে ঘরের সাথেই কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসল। বাচ্চুবাবু হাত ধুয়ে এসে তাদের সামনে বসলেন।

'কি ব্যাপার? তোদের বিয়ের কথা তোর মার সাথে আলোচনা করতে হবে আমাকে রঘুবীর? তবে তোদের লামকে রাজি করানো মুশকিল হবে। তাছাড়া ..।' বাচ্চুবাবু কি মনে করে হঠাৎ থেমে গেলেন। দুজনেই ইতস্তত করছে দেখে বাচ্চুবাবু হেসে বললেন, 'কিরে আইচুক আর কোন সমস্যা আছে?'

আইচুকতি বলল, 'না কাকু বিয়েটা তো এখন হচ্ছে না।'

'কেন?'

'ছোট মাজন বলছে দুবছর পরে হবে। এখন কলেজে পড়তে যাবে।'

'কিন্তু তারপর যদি তোকে বিয়ে না করে? অন্য মেয়েকে মন দিয়ে বসে?'

রঘু আপত্তি করে বলল, 'এসব কি বলছেন কাকু আইচুককে ছাড়া আমার।'

'ওসব ছেঁদো কথায় চিড়ে ভিজবে না ভাতিজা। লাইন লাগিয়ে বেলাইনে সট্‌কে যাবে সেটি হবে না। তোমার মতো বহু লোক আমি দেখেছি যারা এসব ভাল ভাল কথা বলে পালিয়েছে। আমি এক্ষুণি লোক ডাকছি আজই তোদের বিয়ে দিয়ে তারপর ছাড়ব।'

কথাটি বলেই বাচ্চুবাবু বন্দুকটা হাতে নিয়ে বেরুতে চাইলেন। আইচুকতি লাফিয়ে উঠে সামনে দাঁড়াল, 'তুমি কি করছ কাকু? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? লোক জানাজানি হলে আর উপায় থাকবে আমাদের? বিয়ে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে আর বিয়ের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া দুই বছর সময় তেমন কিছু না, দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।'

বাচ্চুবাবু হেসে বললেন, 'বাঃ আমাদের আইচুক তো অনেক বড় হয়েছে, অনেক কিছু বুঝতেও শিখেছে। কিন্তু রঘুবীর চলে যাওয়ার পর এই কথাগুলি এমনি করে বলবি তো?'

'এছাড়া উপায় কি কাকু? সে পড়াশোনা করে বড় হতে চাইছে আমি তাকে বাধা দিই কি করে। তাই ভাবলাম আমিও তো পড়াশোনা করছি, ছোট মাজনও পড়াশোনা করে আসুক। তারপর কপালে যদি সয় আমরা ঘর বাঁধব। কারো ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করাটা একদম ঠিক নয়।'

বাচ্চুবাবুর রাগের উপর জল ঢেলে দিল আইচুকতি। তিনি একটু ভেবে

বললেন, 'তাহলে তুই বলছিস ওকে সময় দেওয়া দরকার?'

'হ্যাঁ কাকু। তবে দুবছর পরও যদি ছোট মাজন ফিরে না আসে তখন কি হবে আমি ভাবতে পারছি না?'

'কেন তুই আমার কাছেই আসবি। আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন তাকে ঘাড় ধরে তোর কাছে নিয়ে আসব।'

'কথা দিচ্ছ তো কাকু?'

'যা কথা দিলাম তোকে আইচুক। যদি মরে না যাই বাটপারি করলে এই শালাকে আমি ছাড়ব না।'

রঘু ও আইচুকতি খুশি খুশি মুখ করে বেরিয়ে গেল। বাচ্চুবাবুও খুশি হলেন। ছেলে মেয়ে দুটোই যেন রাজকুমার ও রাজকন্যার মতো সুন্দর। জুটিটা ঈর্ষণীয়। ওদের ভবিষ্যতটা যদি সুখের হয় বাচ্চুবাবুও খুশি হবেন। ওদের বড় হওয়া, প্রেম, ভালবাসা, ঘর বাঁধা সবই তার নিজের হাতের উপর দিয়েই হবে। তাছাড়া এই যে ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্য সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তার একটা ভাল দিকও আছে। এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একদিন একটা নতুন জাতি তৈরি হবে যাদের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবধান প্রায় থাকবেই না। তিনি মনে মনে ওদের আশীর্বাদ করলেন। ততক্ষণে ওরা টিলা লুঙ্গা পেরিয়ে অনেক দুরে চলে গেছে ছবির মতো নীল পাহাড়ের বাঁকে।

প্রায় সাত দিন পর রঘু বাড়িতে ফিরে এল। আইচুকতিকে নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও বাড়ির পথে পা দিয়েই রঘুর সাংঘাতিক অনুশোচনা হল। অসুস্থ মাকে বাড়িতে একা ফেলে এতো দিন তার বাইরে থাকা মোটেই ঠিক হয়নি। রঘু মনে মনে ঠিক করল এবার মার কাছে আইচুকতির কথা সুযোগ বুঝে বলবে। বাবার মৃত্যু মাকে যতোটা কষ্ট দিয়েছে, অসহায় করেছে, তার চাইতেও বেশি নিঃস্ব করেছে কুসুমের বিয়ে। আইচুকতিকে দেখে মা হয়তো কুসুমের অভাবটা ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু সমস্যাও আছে। অবাঙালি বলে যদি মেনে না নেন? যদি উল্টে তিনি বেঁকে বসেন তাহলে কি হবে? কিন্তু রঘুর দৃঢ় বিশ্বাস যদি একবার তরুবালা আইচুকতির চোখের দিকে তাকান তাহলে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না। তখন আইচুকতিকে আপন করে নেওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবে না। কুসুমের থেকেও তীব্র একটা টান আছে আইচুকতির চোখে যা মানুষকে পতঙ্গের মতো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কাঙাল করে দেয়। রঘু ভাবলো আগরতলা যাওয়ার আগে যে সময়টুকু পাবে তার মধ্যে একদিন তরুবালাকে কিছু না বলে ভরত চৌধুরী নিয়ে যাবে। একবার, শুধু একবার, আইচুকতি মা'র সামনে দাঁড়াক। তারপর কি হয় সেটাই এখন দেখার।

ঘরের সামনে আসতেই পাশের বাড়ির ঠানদি সুনখা ছুটে এলেন। তার

ছেলেরা, ছেলেবৌরা, বাচ্চাগুলি একে একে সবাই চলে এল। কি হয়েছে বুঝতে না পেরে একটু ভয় পেয়ে গেল রঘু। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সবার মুখের দিকে তাকাল সে। 'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করেও কোন উত্তর না পেয়ে সোজা ঘরে ঢুকে গেল। 'মা - মা' ডেকে ঘর, নদীর ঘাট সব খুঁজেও তরুবালাকে না পেয়ে সে বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। সে সোজা সুনখার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ঠানদি মা কোথায়?'

সুনখার বড় ছেলে রঘুকে বলল, 'রঘু আমাদের বাড়িতে এসো। সব খুলে বলছি।'

কিন্তু রঘু চেঁচিয়ে উঠল, 'না এক্ষুনি বল আমার মা কোথায়? বল-বল- ।'

সুনখা রঘুর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'সব কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। তোর মা ভালই আছে। আয় ঘরে আয়।'

রঘু সুনখার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে তাদের ঘরে গিয়ে বসল, কিন্তু তার উৎকণ্ঠা কাটল না। সুনখা রঘুকে ঘরে বসিয়ে খেতে দিয়ে ঘটনা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু রঘুর মুখে খাবার উঠল না। সে অজানা আশঙ্কায় হাঁ করে তাকিয়ে রইল ঠানদির দিকে। ভরত চৌধুরী পাড়ায় থাকাকালীনই রঘুর মনটা মার জন্য আনচান করেছিল। সে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল।

সুনখা সবিস্তারে যা বললেন তা অনেকটা এইরকম। প্রথমবার রঘুকে যখন ময়ালে পাঠিয়েছিলেন জ্যোতিবাবু, সেদিন রাতেই তিনি তরুবালার কাছে এসেছিলেন। তার বদ মতলব টের পেয়ে তরুবালা দরজা আটকে ঠাকুরকে ডাকতে শুরু করেছিলেন। ঘরে যে সুনখা আছে সেটা জানতেন না জ্যোতিবাবু। তার মদোমাতাল চেহারা আর অশালীন কথাবার্তা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুনখা। সুনখাকে দেখেই সুর পাল্টে যায় তার। সুনখা চেঁচিয়ে তার ছেলেদের ডাকলে এই যাত্রা পালিয়ে যান জ্যোতিবাবু।

সেদিন থেকেই তরুবালার মনে কোন শান্তি নেই। একবার ভাবেন মরে যাবেন, একবার বলেন বাপের বাড়িতে চলে যাবেন। কিন্তু রঘুর কথা মনে হলেই দমে যান। সুনখা অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে নিরস্ত করলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই তরুবালার মাথাটায় গোলমাল দেখা দিল। তার মাথাটা যেন ঠিকঠাক কাজ করছিল না। মনের শান্তি হারিয়েছেন অনেকদিন, এবার মৃত্যু ছাড়া তার আর গত্যন্তর রইল না। রঘু ফিরে আসায় তরুবালা যেন নিজেকে আবার কিছুটা ফিরে পেলেন। তার মানসিক ভারসাম্য না হলে হারিয়ে যেতেও পারত। এতো উদ্বেগ, এতো যন্ত্রণা, নারীত্বের এতো অপমান, লাঞ্ছনা তিনি আর সইতে পারছিলেন না। রঘু ফিরে আসায় সবকিছু যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনিও রঘুকে কিছুই বুঝতে দেননি। কিন্তু আবার রঘু যখন ময়ালে যাবে বলল, তখনি তরুবালা কিছুটা অসহায় হয়ে গেলেন।

এবার আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন লম্পট জ্যোতি রায়। রাতের

আঁধারে সুবিধে করতে না পেরে একদিন দুপুরে তরুবালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। সুনখাও তখন এই বাড়িতে ছিলেন না। এলাকাটাও ফাঁকা এবং নির্জন, তাই তরুবালার চিৎকার কেউ শোনেনি। অথবা তিনি চিৎকার করার সুযোগ পাননি। কিন্তু সাহসী তরুবালা লম্পটের হাত থেকে ছুটে গিয়ে ঘরের বটি দা দিয়ে জ্যোতি রায়কে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকেন। এতোগুলি কোপ এতো আক্রোশে দিয়েছেন তিনি রায় বাঁচবে কিনা সন্দেহ আছে।

তরুবালা আর দেরি না করে নদীতে রক্তমাখা কাপড় ফেলে দিয়ে আবার কাপড় পরে কয়েকটা টাকা হাতে নিয়ে সোজা কোথায় চলে গেলেন। যাওয়ার আগে সুনখাকে বলে গেলেন 'মাসি, রঘু এলে তুমি ওকে পালাতে বলবে। না হয় মিথ্যে মামলায় ওকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। ওকে বলবে আমি প্রথম আমাদের দেশের বাড়িতে যাব। তারপর চলে যাব বাপের বাড়ি। সেও যেন দেশের বাড়িতেই চলে যায়। ওখানে সে গেলে আমরা ঠিক করব কোথায় যাব। তুমি ওকে বলবে তার মা কোন পাপ করেনি। নিরুপায় হয়ে এই কাজটা করেছে। সে যেন তাড়াতাড়ি পালিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে।'

কথাগুলি শেষ করে সুনখা রঘুর দিকে মমতা ভরা চোখে তাকালেন। রঘুর শরীরটা যেন ঝুলে পড়ল। সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিয়ে গেল তার শরীর থেকে। সুনখার বড় ছেলে বলল, 'জ্যোতি রায় হয়তো বাঁচবে না রঘু। তুমি এখানে এসেছ লোক জানাজানি হলে বিপদ হতে পারে। তুমি এক্ষুনি নবগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাও। যদি জ্যোতি রায় মরে যায় তাহলে অনর্থ হয়ে যাবে। তোমার মাকে না পেয়ে তোমাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে।'

রঘুর গলা দিয়ে ভাত আর নিচে নামল না। সে হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়াল। সে এখন কি করবে সেটাই ভাবছিল। তাদের বাড়িতে সন্ধ্যা অব্দি কাটিয়ে রঘু রাতের আঁধারে সুনখাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। রঘু কোথায় যাবে কেউ বলতে পারল না। শুধু একরাশ অনিশ্চয়তা বুকে চেপে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। নবগ্রাম ও কলাবাগান পাশাপাশি গ্রাম। সুখ দুঃখের অনেক স্মৃতি এই দুই গ্রামে ছড়িয়ে আছে। এই যে চলে যাচ্ছে রঘু আর কি কখনো ফিরে আসবে এখানে? কথাটা ভাবতেই রঘুর চোখ জলে ভরে গেল। সে ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক একবার তাকাল। মনে হচ্ছে ধলাই নদীটা যেন অবাক হয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছে রঘুর দিকে। আর দেরি না করে দ্রুত চলতে শুরু করল সে। তার সমস্ত স্মৃতিগুলিও চলতে চলতে সারিবদ্ধভাবে ভিড় করতে লাগল রঘুর চোখের সামনে।

আর কোন পিছুটান রইল না রঘুর। তরুবালা যদি নদিয়ায় চলে যান তাহলে একদিকে ভালই হবে। অন্তত তার আত্মীয় পরিজনদের পেয়ে এই অভিশপ্ত দিনগুলি তিনি তাড়াতাড়ি ভুলে যাবেন। কিন্তু রঘু এখন কি করবে? তাকে তো ফিরতেই হবে আইচুকতির কাছে। যদি আইচুকতিও জেনে যায় যে খুনির ছেলে

রঘু। তখন কি হবে? খারাপ খবর বাতাসের আগে চলে। রঘু মনে মনে ভাবল এবার সে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল। কারও ভাবনা তার আর ভাবতে হবে না। তাকে নিয়েও হয়তো আর কেউ ভাববে না। তবে তরুবালার জন্য সে গর্ব বোধ করল। জ্যোতি রায় যদি মরেও যায় তাতে সে খুশি হবে। সঠিক কাজটাই করেছেন তার মা। আবার কোথায় কখন মার সাথে দেখা হবে সে জানে না। যদি ঠিকই দেশের বাড়িতে চলে যান তাহলে দেখা হলেও হতে পারে। সামনের পথটা যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে। বিয়ের প্রথম কয়েকটা দিন বাদ দিলে মার জীবন যেন দুঃখের সাগরে ভাসমান। একবার দেশ ভাগ, বাবার মৃত্যু, আবার গৃহহারা, নিঃস্ব হওয়া তারপর এই -। একটা মানুষের আর কতো পরীক্ষা নেবেন ঈশ্বর? মার পালানো ছাড়া উপায় ছিল না। সমস্ত গ্রাম জুড়ে যে যার মতো কাহিনি বিস্তার করে চলেছে নিশ্চিত। দেবর বৌদির নোংরা সম্পর্ক নিয়ে কাহিনির জাল কতদূর ছড়িয়েছে কে জানে? পরিচিত সব মানুষেরা যতই ভালবাসুক তাদের একটা সন্দেহের দোলায় হয়তো দুলবে। তবু রঘু জানে পৃথিবীর একজন মহিলাও যদি পবিত্র থাকেন সে নিশ্চিত তার মা। হঠাৎ রঘুর বুক ফেটে কান্না এল। এতো কাঁদতে কেন ইচ্ছে করছে রঘু বুঝতে পারল না। এতো বাষ্পও বুকের ভেতর জমা হয়ে ছিল তার?

কোথায় যাবে ভাবতে ভাবতে রঘু কখন শ্রীমঙ্গল এসে বাস ধরেছে খেয়াল নেই। সারারাত কখনো বাসে কখনো হোটেলে কাটাল সে। রঘু বুঝতে পারল তার মা'ই তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে এসেছেন এখানে। ফলে সে বেগমপুরে তাদের দেশের বাড়ি যাওয়াই প্রথম স্থির করল। সেখানে গেলে মার একটা খোঁজ হয়তো সে পেয়ে যাবে। সেই ছোটবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল সে বাবার কাঁধে চড়ে। কিছুই মনে নেই এখন আর। তার জন্মভিটেও তাকে টানছে মার মতো, একবার ছুঁয়ে এসে দেখুক ভাগ্যটা সহায় হয় কিনা।

বেগমপুর যখন রঘু পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। অনেক খুঁজে জিজ্ঞেস করে, অবশেষে পিতৃপুরুষের বাড়িটা খুঁজে পেল। বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলেন। ওরা রঘুকে চিনতে পারবে তো? রঘু যে এই বাড়ির পূর্বপুরুষদের বংশধর সেটা ওরা চিনতে পারবে? রঘু গেট্ পেরিয়ে ভেতরে যেতেই লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'আইজ্ঞা, আপনে কেডা?'

রঘু সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমার মা এখানে এসেছিলেন চাচা?'

লোকটা রঘুকে আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'আপনি কি রায় বাহাদুরের ছাওয়াল রাঘবেন্দ্র রায়?'

রঘু মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল। লোকটা সাথে সাথে সালাম জানিয়ে রঘুকে ঘরে নিয়ে গেলেন। এই লোকটার নাম মসন্দর মিয়া - যার কথা মা বাবার কাছে শুনেছে রঘু। তারা আট পুরুষ ধরে রায়বাড়ি দেখাশোনা করছেন। শান্তিবাবু দেশ ছেড়ে পলায়নের সময় সব জমি জামা বিক্রি করে যেতে পারেননি এই মসন্দরের

অনুরোধেই। এখনও পুরানো হাভেলি ছাড়াও কিছু জমি, ব্যবসা এই এলাকায় রয়ে গেছে রায়বাহাদুরের নামেই। যেগুলি অনেকবার শত্রু সম্পত্তি বলে অন্যেরা দখল নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মসন্দর মিয়ার চেষ্টায় সেই জমি বাড়ি বেহাত হয়ে যায়নি এখনও। এখন সেই জমিতেই মসন্দর চাষবাস করেন লোক লাগিয়ে। ব্যবসাও করেন তার ছেলে ও নাতিদের নিয়ে। সেই জমি এবং ব্যবসা থেকে বেশ কিছু টাকা আয় হয় প্রতিবছর যা শান্তিবাবুর কাছে পাঠানোর কথা দিয়েছিলেন মসন্দর। বারবার এই মসন্দর ফসলের টাকা, ব্যবসার টাকা শান্তিবাবুর কাছে পাঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ রায়বাহাদুরের কোন খোঁজ ওরা পাননি। ফলে মসন্দর মিয়া যোগাযোগ করেছিলেন রায়বাহাদুরের শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু ওখানেও কোন খোঁজ না পেয়ে মসন্দর হতাশ হয়ে গেলেন। প্রতি বছরের জমানো টাকা বাড়ছিল কিন্তু ধর্মভীরু মসন্দর সেই টাকায় কোনদিন হাত দেননি।

দিন ছয়েক আগে তরুবালা এসেছিলেন এই বাড়িতে বিপদে পড়ে। কিন্তু এই পুরানো হাভেলিতেই যে তার ভবিষ্যতের দিশা এখনও লুকিয়ে থাকতে পারে তরুবালা তা ভাবতেই পারেননি। তিনি এখানে এসেছিলেন ফেরারি আসামি হয়ে, অথচ হাতে পেলেন অনেক টাকা ও ভবিষ্যতের গ্যারান্টি। এদিকে মসন্দর ও তার বাড়ির সব লোকজন মা ঠাকরুণের এই দুর্দশা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন রাতেই মসন্দর এতদিনকার জমানো টাকা মা ঠাকরুণের হাতে তুলে দিলেন। তারপর হাতজোড় করে বললেন, 'আপনাদের নেমক খেয়ে এতদুর এসেছি মা। আল্লাতাল্লাহ আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। কিন্তু রায়বাহাদুর ও আপনাদের খবর শুনে মনটা আর ঠিক রাখতে পারছি না। আপনি যদি এই অবশিষ্ট জমিগুলা বিক্রি না করেন আর আমাকেই পূর্বের মতো জমিগুলান দেখাশোনার দায়িত্ব দেন তবে এর দেখাশোনা আমিই করব এবং প্রতিমাসে আপনার বাপের বাড়িতে আমি টাকা পাঠাব।' তরুবালা এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে গেছেন। মসন্দর চাচার বড় ছেলে খুরশিদ তরুবালাকে নদিয়ায় বাপের বাড়িতে এগিয়ে দিতে গেছে।

রঘু সব শুনে নিশ্চিন্ত হল। তরুবালা নিরাপদে বাপের বাড়িতে পৌঁছতে পারবেন সে বিশ্বাস রঘুর হল। তাছাড়া তরুবালার হাতে রয়েছে এখন অনেক টাকা। যদি বাপের বাড়িতে তিনি যথেষ্ট আদর নাও পান, টাকা দিয়ে তিনি তার ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন। রঘুর মাথা থেকে একটা বিশাল বোঝা নেমে গেল। নিজেকে রঘুর অনেক হালকা লাগছিল। তবে তরুবালা মাত্র দুচারটা দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না রঘুর জন্য? পরদিনই তিনি চলে গেলেন কেন? তবে কি মসন্দর মিয়াদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি? না কি নিজের ছেলের ছায়া থেকে দূরে সরে যেতে চাইছেন তিনি?

১০

আখাউড়া ষ্টেশনে নেমে গাড়ি ধরে আগরতলা এসে পৌঁছল রঘু। কি করবে, কোথায় যাবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বটতলা, রাজবাড়ি, গোলবাজার, মোটরষ্ট্যান্ডের মধ্যে দুবার চক্কর কাটলো। রঘুর অবশ্য ততটা ভাবনার কিছু নেই। গত দুচার দিনে সে লক্ষ্য করেছে আগের মতো খিদে তার আর পায় না। খিদে পেতে পেতে একটা সময় খিদেটা পেটেই মরে যায় তখন আর খিদে পায় না। একদিন না খেয়ে থাকাটা তো ব্যাপারই না, প্রয়োজনে দুদিন আর একটু কষ্ট করে যৎসামান্য খাবার পেলে তিনদিনও থাকা যাবে।

রঘু ইচ্ছে করলে কিছুটা দারিদ্র ঘুচিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু সে তা চায়নি। মসন্দর তাকেও টাকা দিতে চেয়েছিলেন, টাকা নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু রঘু তা নেয়নি। সে যে নিঃস্ব হতেই পছন্দ করছে বেশি। কি হবে সামান্য কয়েকটা টাকা দিয়ে যাকে ভাগ্য পথে বসিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যের পরিবর্তন চাই না হয় কিছুই হবে না।

কুসুম জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, মা - যার ভরসায় বেঁচে থাকা তিনিও বহুদুরে চলে গেলেন। আর আইচুকতি, সেও নির্ঘাৎ দুরে চলে যাবে। কিসের ভরসায় সে রঘুকে চাইবে রঘু বুঝতে পারছে না। এই তিন নারী রঘুর জীবন থেকে ক্রমশ বিলীয়মান - যেন দুরের আবছায়া অতীত হারিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যের এই পরিহাস রঘুকে যেন বাস্তবিক বড়ই নিঃস্ব করে দিয়েছে।

একবার রঘুর মনে হয়েছিল পাকিস্তানেই থেকে যায়। যদি ধর্মীয় আক্রমণ খুব বেশি হয় তখন না হয় ইসলাম কবুল করে নিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করবে। এই যে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে বেঁচে থাকার লজ্জা তা থেকে সে মুক্তি পাবে। কিন্তু একটি কারণে সে পারল না সেই দেশে থেকে যেতে। আইচুকতির প্রবল টান তাকে আর ওখানে থাকতে দিল না। এই মেয়েটা তার বুকে যে আশার প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে তার জন্যই বাঁচতে ভাল লাগছে। যদি সে নিজে থেকে ভুলে যেতে চায় যাক, কিন্তু সে যদি রঘুর জন্য অপেক্ষায় বসে থাকে? শুধু তাকে খুশি করার জন্যই রঘুকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আরও দীর্ঘ পথ ছুটতে হতে পারে তাকে তাতেও কুছ পরোয়া নেই। আইচুকতি যেন ভবিষ্যতের রঘুকে পেয়ে অহংকারী হতে পারে সেই চেষ্টায় ব্রতী হওয়ার জন্য মনটা তার পাগল হয়ে গেল।

তাছাড়া আরও একটা নেশা চেপে বসেছিল রঘুর মাথায়। তা হল কলেজের

শিক্ষা সম্পূর্ণ করা। মা বাবা দুজনেরই এই শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করতে চায় সে। ভবিষ্যতে হয়তো সে মার কাছে চলে যাবে অথবা মাও তার কাছে ফিরে আসতে পারেন। তখন রঘুকে চিনতে যেন তার ভুল না হয়, যোগ্য রঘুকেই যেন তিনি ফিরে পান। তরুবালার জন্য এতদিন যে দুশ্চিন্তা রঘু করতো তা অবশ্য ঘুচে গেল। দেশের বাড়ি থেকে মাসোহারা বাবদ একটা টাকা অবশ্যই পাবেন তরুবালা। তাছাড়া রঘুর মামারাও অত্যন্ত বনেদি। অতএব মা নদিয়ায় চলে যাওয়ায় রঘু এক প্রকার নিশ্চিন্ত হল। সে মনে মনে ভাবল কলেজ পাস না করে সে কিছুতেই মার কাছে আর ফিরে যাবে না।

রঘু শহরের পথে ঘুরতে ঘুরতে গোলবাজার এসে ক্লান্ত হয়ে বসে রইল। পকেটে হাত দিয়ে দেখে আইচুকতির দেওয়া টাকা দুটি আর ভোলার দেওয়া রুপোর টাকাগুলি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে একদিকে ভালই হল, শূন্য থেকে শুরু করা যাবে। যা কিছু পাবে এই জীবনে সবই তার কাছে হবে সঞ্চয়।

সাইনবোর্ডহীন একটি হোটেলে লম্বা বেঞ্চি পেতে লোকজন দুপুরের খাবার খাচ্ছে। রঘুরও হঠাৎ খাবার ইচ্ছে হল। সাথে সাথেই ইচ্ছেটাকে দমন করল সে। না, যখন তখন খিদে পেতে নেই। একটা দিন মাত্র না খেয়ে আছে আর তাতেই পেট খিদের জ্বালায় কান্না জুড়ে দিলে চলবে? এই খিদে নিয়েই নিজেকে চাঙা রাখতে হবে। না হয় আগুনে পুড়িয়ে নিজেকে শুদ্ধ করা যাবে না। যে লক্ষ্যটা নিয়ে আগরতলা শহরে এসেছে তা নড়বড়ে হয়ে যাবে। সে হঠাৎ লক্ষ্য করল হোটেলে রঘুর বয়সী দুচারটা ছেলে কাজ করছে। রঘু ভাবল সেও তো কাজ করতে পারে এই হোটেলে। তাহলে খাওয়া ও থাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। ভাবনাটা মাথায় আসতেই রঘু হোটেল মালিকের সামনে চলে এল।

হোটেল মালিক গৌর সাহা প্রস্তাব পেয়ে রঘুকে দেখে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি রঘু হোটেলে কাজ করতে চাইছে। পরে ভাবলেন হতেও পারে! পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কতো লোক পথের ভিখারি হয়ে এদেশে আসছে প্রতিদিন। গৌর সাহা নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করে বললেন, 'ঠিক আছে, কাজে লেগে পড় আজ থেকে। তবে দুবেলা খাওয়া ছাড়া বেতন এখন পাবে না। আগে কিছুদিন কাজ কর, তারপর তোমার কাজ বুঝে বেতন দেব।'

রঘু হেসে বলল, 'আমাকে দুবেলা ভাত দিতে হবে না। আমি একবেলা ভাত খাব।'

বিস্মিত হয়ে তাকালেন গৌর সাহা, 'এটা কি বললে তুমি ছোকড়া? একবেলা ভাত খেয়ে কেউ বাঁচে নাকি?'

'বাঁচতে হবে। গরিবের দুবেলা ভাত খাওয়ার সৌখিনতা ছেড়ে দিতে হবে। এই তো আপনি আমাকে আশ্রয় দিলেন। ফলে আমার খাওয়ার সমস্যা রইল না। কিন্তু আপনি যদি আবার তাড়িয়ে দেন তাহলে আবার আমার না খেয়ে থাকতে হবে।'

গৌর সাহা আর কথা বাড়ালেন না। হোটেলে লোকের ভিড় আছে। তিনি খোকাকে ডেকে বললেন, 'এই খোকা, এদিকে একটা লটপটি নিয়ে আয়রে - লটপটি -। এই ব্যাটা, যাও কাজে লেগে পড়।'

রঘু কাজে লেগে গেল। মালিকের ফাই ফরমাস সারাদিন খেটে রাত নয়টার দিকে তার শরীরটা যেন ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ল। অন্য ছেলেরা যখন শরীরটা টেনে টেনে বিছানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন রঘু নিজেকে শাসন করল, না আমার ঘুমোলে তো চলবে না। সে খোকাকে ডাকল, 'এই খোকা, শোন।'

খোকা মালিক চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, টাকা গুনে মালিক চলে গেলেই ঘুমিয়ে পড়বে। রঘু ডাকতেই সে এগিয়ে এসে বলল, 'কি রে?'

রঘু বলল, 'এখন ঘুমিয়ে পড়বি?'

খোকা বলল, 'হ্যাঁ আর কি করব?'

'যারা সারাদিন শুধু ঘুমোয় তাদের ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকে। শোন তুই খেয়ে নে আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসব। তোর সাথে অনেক কথা আছে।'

খোকা একটা রহস্য গল্পের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি খাওয়ার পর্ব সেরে খোকা রঘুর সাথে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে লাগল সারা শহরে। একটু দেরিতে আকাশে আদ্ধেক চাঁদ উঠেছে। আগরতলার রাজপথে আছড়ে পড়েছে জোৎস্না। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের শরীর থেকে সাদা রূপের ছটা ঠিকরে বেরোচ্ছে। রঘুর মনে হল হাসিতে উচ্ছল কোন এক সুন্দরী শ্বেতপরি যেন রঘুর দিকে তাকিয়ে আছে। রঘুর চাইতে খোকার অবস্থা আরও খারাপ। তার মা মানুষের বাড়িতে কাজ করে নিজের পেট চালান। খোকাও এই হোটেলে কাজ করে নিজেরটা নিজেই চালিয়ে নেয়। তার শিক্ষা দীক্ষা বলতে কিছু নেই। খাবে বাঁচবে কোনমতে এই তার জীবন দর্শন। রঘু ওকে বোঝাল, এভাবে সারাটা জীবন যাবে না। এই যে আরামের খাওয়া দাওয়া চলাফেরা এগুলোই জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। হোটেলের কাজটা চলে গেলে এই আরামও চলে যাবে। এখন সময়টা তাদের জীবনকে গড়ার, আরাম করার জন্য নয়। যতটুকু খেলে চলে যায় তার বেশি খেতে নেই। আর ঘুম ঠিক যতটুকু দরকার, তিন চার ঘন্টার বেশি ঘুমও নয়। খোকা রঘুর কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝল না। কিন্তু রঘু একনাগাড়ে বোঝাতে লাগল, তাদের হোটেলের কাজটা দুপুর এগারটা থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত। ফলে তারা যদি নয়টার পর বেরিয়ে যায় এবং রাত একটা পর্যন্ত কাজ করে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে কেমন হয়। মাল টানা, রিক্সা চালানো যা পাওয়া যায় তাই ওরা করবে। খোকার পছন্দ রিক্সা চালানো, কারণ সে আগে চালিয়েছে। একজন মালিক তার চেনা পরিচিত, আগে কথা বলে নিলে ভাড়া পাওয়া যাবে। রাতে রোজগারও ভাল হয় কারণ রিক্সা কম থাকে। দূর থেকে আসা যাত্রী ও রুগীদের নিয়ে গেলে ভাল ভাড়া পাওয়া যায়। রঘু খোকাকে বোঝাতে লাগল, ভোর পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে উঠলে সকালটা কাজে লেগে যাবে। সকালে মানুষের বাড়ি ঘর, দোকানপাট যেখানেই

কাজ পাবে ওরা করবে। প্রতিদিন হোটেলের কাজ, রিক্সা চালানো, বাড়িঘরের কাজ করে যদি দৈনিক দুই টাকা রোজগার হয় তাহলে মাসে তাদের আয় কতো হয়? রঘুর বাবা প্রধান শিক্ষকের চাকরি করে মাসে মাইনে পেতেন নব্বই টাকা। তাদের কপাল যদি ভালো থাকে তাহলে তারা একশো টাকার বেশিও রোজগার করতে পারে।

রঘুর হিসেব শুনে খোকার চোখের ঘুম চলে গেল। কাজ, আরও কাজ করতে হবে তাদের, বিশ্রাম আরাম শব্দগুলি জীবনে মূল্যহীন। সেই রাত থেকেই আগরতলা শহরের আনাচে কানাচে রিক্সা নিয়ে ওরা ছুটতে লাগল। রঘু প্রতিদিন খোকাকে উৎসাহ দিতে শুরু করল। যখন হাতে দশটা টাকা জমে গেল তখন কে কার আগে ওকে বিশ টাকা করে ফেলতে পারে তার একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আর প্রতিদিন কাজের কোন বাছ বিচার নেই। কোন বাড়িতে ড্রেন পরিষ্কার করা, কোথাও জঙ্গল কাটা, কোথাও মাল টানা, যা হোক একটা কাজ পেলেই তাদের হল।

সত্যি কতো ধরনের কাজও যে আছে পৃথিবীতে। খোকা রোজগারের আনন্দ ভুলে মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। নোংরা কাজগুলি করতে চায় না। রঘু খোকাকে বোঝাল, 'কেন বিরক্ত হচ্ছিস খোকা? কাজ মানে কাজ - শুধু কাজ। এটার তুই রকমফের করছিস কেন? সত্যিকারের ভালো কর্মী কাজকে ঘৃণা করে না। কোন না কোন শ্রমিককে তো এই কাজটা করতেই হবে। তাহলে আমরাই বা পারব না কেন? তাছাড়া নোংরা কাজগুলিতে পরিশ্রম কম, পয়সা বেশি আসে।'

খোকার মেজাজটা বিগড়ে গেলে ওকে সোজা করা একটু মুশকিল হয়ে যায়। যা বুঝে তার বাইরে নতুন কিছু ওর মাথায় ঢুকতেই চায় না। সে রেগে বলল, 'ধুর ব্যাটা, তোর কথা মতো কাজ করে আমার শরীরটা শুকিয়ে গেছে। একদম বিশ্রাম পাচ্ছি না আমি। হঠাৎ একদিন দেখিস বিছানায় পড়ে যাব। আমার মতো তুইও অসুস্থ হয়ে পড়বি।'

রঘু বলল, 'ঠিক আছে তুই তাহলে কাজ করা বন্ধ করে দে। কিছুদিন বিশ্রাম নে ভাল লাগলে আবার আসিস। তবে কি জানিস খোকা বছর দুয়েক পর এমন দিনে আমার দোকানে তুই কর্মচারী হয়ে কাজ করতে পারবি।'

চমকে রঘুর দিকে তাকাল খোকা। রঘু থেমে আবার বলতে লাগল, 'ভেবেছিলাম দুজনে টাকা জমিয়ে একটা দোকান ভিটি কিনব। এখন দেখছি তোর দ্বারা আর হবে না।'

খোকা এবার চেপে ধরল রঘুকে, 'কি করে দোকান ভিটি কিনবি তুই? এতো টাকা তোর কাছে কোত্থেকে এল?'

'কেন প্রতিদিন আমরা রোজগার করছি না। যা ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি পয়সা রোজগার করছি। এক বছর পরে কতো টাকা হাতে আসবে ভেবেছিস। আমি মোটরস্ট্যান্ডে একজন দোকান মালিকের সাথে কথা বলেছি।

উনি ওনার দোকান ভিটি বিক্রি করে দেবেন। আমি ভেবেছিলাম ঐ ভিটিটা তুই আমি মিলে রেখে দেব। তাছাড়া মানুষের ভিড় তো এখন মোটরস্ট্যান্ডের দিকেই বাড়ছে। আসাম আগরতলা রোড চালু হয়ে গেছে, দুর দুরান্ত থেকে যাত্রীরা এসে এখানে বিশ্রাম করবে।'

খোকা লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এতো টাকা কোথায় পাব আমরা রঘু?'

'কেন মাত্র দশ হাজার টাকা দিতে পারবো না? তুই আমি দুজনে মিলে যা পারি দেব, বাকিটা মালিককে বলব ধার দিতে। ইচ্ছে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে দেখিস, ইচ্ছা শক্তিটাই হল আসল। কিরে পারব না?'

খোকার চোখে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে গেল, 'মনে তো হয় পারব রে রঘু।'

রঘু এবার খোকাকে দীর্ঘ সময় ধরে বোঝাতে লাগল। 'কেন রেগে যাচ্ছিস খোকা? আমি আমাদের ভালর জন্যই তো বলছি। সারাজীবন যদি গোলামি করতে চাস তাহলে ঠিক আছে তুই যেমন চলছিস চলে যা। কিন্তু যদি বড় হতে চাস তাহলে লড়তে হবে। একজন প্রকৃত কর্মী কখনও অলস হয় না। সে কাজের মধ্যেই আনন্দ খুঁজতে শুরু করে। একবার যদি একজন শ্রমিক কাজ করে আনন্দ পেয়ে যায় সে আর কখনো কাজকে ঘৃণা করে না। প্রকৃত শ্রমিক কাজ করতে করতেই গান গাইবে, বিড়ি টানবে, বিশ্রাম করবে, প্রেম করবে, সুখ দুঃখের কথা বলবে, টাকার হিসেব করবে। আসল শ্রমিকরা শ্রমের মধ্যেই জীবনের আনন্দটা উপভোগ করে। এই কৌশলটা রপ্ত করতে হয়, এটা ঝট্ করে সাধারণ মানুষের জীবনে আসে না। তার জন্য অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়। তারপর একদিন যখন ঐ মোক্ষ মানুষ লাভ করে ফেলে সেদিন থেকে কাজকে আর সে ভয় পায় না। আমাদেরও পারতেই হবে। তার আগে যে কঠিন পরীক্ষাগুলি সবাইকে দিতে হয় তাইতো দিয়ে চলেছি আমরা। এতো তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে গেলে চলবে?'

মাত্র পাঁচ ছমাসে গৌর সাহা রঘুর প্রতি অন্ধ হয়ে গেলেন। এই ছেলেটা অন্যরকম। রঘুর নির্লোভ অমায়িক ব্যবহার, কাজের প্রতি একাগ্রতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। রঘু লেখাপড়া জানা ছেলে তাই প্রায়শই খাতা লেখার পাশাপাশি টাকা ক্যাশ বাক্সে রাখার দায়িত্বও রঘুর উপর বর্তাতে লাগল। রঘু কোন আপত্তি করেনি কারণ নির্ধারিত সময়ের পরে সে প্রতিদিন ছুটি পেয়ে যেত। কিন্তু সমস্যা হল সেদিন যখন রঘুকে গৌর সাহা দোকানের ম্যানেজার বানিয়ে দিলেন। রঘুর বেতন দুই ধাপ আগেই বাড়িয়ে ছিলেন, এবার আবার তা দ্বিগুণ করে দিলেন। এছাড়া তার উপায়ও ছিল না, ছোট্ট হোটেলটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল, সাথে সাথে রঘুর উপর নির্ভরতাও বাড়তে লাগল। কারণ রঘুর মতো সৎ এবং নিষ্ঠাবান ছেলেকে তার মতো ঝানু ব্যবসায়ীর চিনতে ভুল হয়নি। গৌরবাবু অন্য ব্যবসায় নিজেকে ইদানীং জড়িয়ে ফেলেছেন বেশি। ফলে হোটেলে দুপুরবেলা

সময় প্রায় দিতেই পারছিলেন না। রঘু সব বিষয়েই রাজি হয়ে গেল কিন্তু সময়টা সেই এগারটা থেকে আটটা পর্যন্তই থাকবে। সকাল এবং বিকেলে গৌরবাবু হোটেলে থাকবেন। তখন রঘু অন্য কাজে চলে যেতে পারবে।

রঘু ম্যানেজার হওয়ায় হোটেলের কর্মচারীরা খুশিই হল। তাদের সমস্যাগুলি রঘু বুঝতে পারতো সহজে। তাছাড়া ওরা যে ফাঁকি দিত, চুরি করতো তাও রঘু ধরতে পারতো। রঘু তথাকথিত ম্যানেজারদের মতো একদিনও মালিকের চেয়ারে বসে কর্মচারীদের হুকুম দেয়নি। সে নিজেও অন্য কর্মচারীদের মতো ভাত, ডাল, লংকা, পেঁয়াজ হোটেলে খেতে আসা লোকদের এগিয়ে দিত। আবার নিজেই ছুটে এসে পয়সা রাখতো, খাতায় লিখে রাখতো ফলে কর্মীদের সাথে তার দুরত্বটা বাড়েনি। সে নিজেই ইচ্ছে করে সবার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রইল। গৌরবাবুও রঘুর এই টেক্‌নিক পছন্দ করলেন এবং নিজের পরিবারের লোকের মতো রঘুকে সাহায্য করতে লাগলেন। যে অর্থের খোঁজে রঘু নিঃস্ব হয়ে পথে বেরিয়েছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে তা যেন ধীরে ধীরে রঘুর সামনে ধরা দিতে লাগল। সারাদিন কাজ কাজ আর কাজ নিয়ে এতোই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে পৃথিবীর বাকি সবকিছুই যেন ভুলে গেল। একটা বছর কি করে যে কেটে গেল রঘু যেন টেরই পেল না। অর্থের নেশায় আগরতলা শহরের আনাচে কানচে ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো ঘুরতে লাগল সে।

গৌর সাহা হঠাৎ স্থির করলেন তার হোটেলটা ভেঙে ফেলবেন নতুন পাকা দালান ঘর তৈরির জন্য। আপাতত হোটেলটা অন্য একটা ঘরে নিয়ে খোলা আকাশের নিচেই চলবে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। হোটেল নতুন ঘরে চালু হয়ে গেল। কিন্তু খাবার দিতে হল লোকজনদের ঘরের বাইরে। তেমনি রঘুদের রাতে ঘুমের জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেল। গোলবাজারে রাজ আমলের বিল্ডিংগুলির বারান্দায় অনেক হিন্দুস্থানি শ্রমিক রাতে ঘুমায়। সেখানেই খোকা রঘু সহ কয়েকজন মিলে শোবে স্থির করল।

সেদিন প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছিল। রাতে রিক্সা চালিয়ে খোকা আর রঘু ফিরছিল বারান্দায় শুতে। বারান্দায় এসে মশারি টাঙিয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। অন্য মশারির নিচ থেকে খোকা জিজ্ঞেস করল, 'বৃষ্টি যদি সকালেও পড়তে থাকে আমাকে ডাকিস না।'

রঘু বলল, 'ঠিক আছে বাবা এখন ঘুমিয়ে পড়। বৃষ্টি পড়ছে।'

কতো লোক ঘুমিয়ে আছে এই বারান্দায় বলা মুশকিল। রঘুর মশারির চারপাশে মশার ভয়ঙ্কর শব্দ। ঘুম আসাই মুশকিল। বারবার বিদ্যুৎ চমক ও মেঘের কর্কশ গর্জনে দুয়েকবার উঠে বসে গেল রঘু। সারা রাত ধরে থেমে থেমে মুষলধারে বৃষ্টি হল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে আর বলতে পারল না।

ঘুম থেকে প্রতিদিনের মতো ভোরবেলা উঠে গেল রঘু। কিন্তু তখনও একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। অভ্যাসবশত খোকাও

ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙলো। ততক্ষণে রঘু তৈরি হয়ে যাচ্ছে দেখে খোকা বলল, 'এই বৃষ্টিতে কি করে কাজ করবি রঘু?' আয় আজ বরং একটু ভাল করে ঘুমিয়ে নেই।'

রঘু তাড়া দিয়ে বলল, 'এই উঠ্ উঠ্ – একশ বস্তা বালু টানা সোজা কথা নয়। তুই পঞ্চাশ, আমি পঞ্চাশ। এগারটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

একটা বড় হাই তুলে খোকা বসল, 'তুই শালা বৃটিশ। একবার কথা দিয়েছিস তো ঝড় বৃষ্টি কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করবি না।'

মশারি গুছিয়ে উঠেই আঁতকে উঠল খোকা। রঘু ফিরে তাকিয়ে দেখে একটা পাগলী গুটিশুটি মেরে তাদের একপাশে পড়ে আছে। অসহায় রোগা মেয়েটাকে দেখে তার মায়া হল। তার সমস্ত শরীর রোদে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে – ওর গায়ের রঙ এখন বোঝা মুশকিল। অত্যন্ত ময়লা কাপড় চোপড়। চুলে মনে হয় শত বছরের ময়লা জমে জট হয়ে গেছে। চেহারাটা দুঃখী দুঃখী অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার সারা শরীর জুড়ে মশাদের মহোৎসব চলছে। রঘুর বড্ড মায়া হল। সে তার গামছা দিয়ে মশা তাড়িয়ে দিল। তারপর নিজের মশারিটা খুলে পাগলির উপর টাঙিয়ে দিল।

খোকা বলল, 'বেশি লাই দিবি না রঘু। পরে কিন্তু তোর পিছু নেবে।'

'কি করব বল। পাগলীটাও তো মানুষ। ওর কষ্ট দেখলে প্রাণ কাঁদে, সহ্য করতে পারি না।'

'তুই যা খুশি কর শুধু প্রত্যেকদিন ওকে খাবার দিস না।'

'কেন?'

'খাবার না পেলেই পাগলী আর আসবে না তোর কাছে।'

খোকার কথাগুলি যেন বেদ বাক্যের মতো ফলে গেল। হোটেলে ফিরে এসে দেখে ঐ পাগলীটা হোটেলের সামনে মাটিতে বসে আছে। রঘুর মায়া হল সে তাকে থালায় খাবার খেতে দিল। খাওয়া শেষ করে আবার কোথায় চলে গেল পাগলীটা।

রঘু হোটেলের কাজ সেরে খেয়ে দেয়ে রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা মশারির দোকানে দাঁড়িয়ে গেল সে। একটা মশারি, একটা বালিশ কিনে রিক্সার সিটের নিচে রেখে দিল। রাত বারোটার পরে মালিকের বাড়িতে রিক্সা বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেখে পাগলী সেই গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়েছে। রঘু নতুন মশারিটা বের করতেই খোকা হেসে উঠল।

'আমি জানতাম এই পাগলীর আর কোন চিন্তা নেই। এবার ঠিক সুস্থ হয়ে যাবে।'

'আসলে কি জানিস খোকা, এতোদিন ধরে নিজের প্রয়োজনে একটা পয়সাও তো আমি খরচা করিনি। তোর তো বিড়ি খাওয়ার পয়সা লাগে আমার তাও লাগে না, তাই পয়সা খরচ করতে হয়নি। তাছাড়া পয়সাটা হাত থেকে বেরিয়ে গেলে বুকে ভীষণ লাগে। কিন্তু জানিস আজকে এই পয়সাগুলি খরচ করতে একদম

খারাপ লাগেনি মাইরি।'

একদিন রঘু হোটেলের দুইজন বয়স্ক কাজের মহিলাকে ডেকে পাগলির চুলটা কেটে দিতে বলল। তারপর ভাল করে চান করিয়ে নতুন একটা শাড়িও পরিয়ে দিতে বলল। মাসিরা রঘুর কথা শুনে হেসে উঠল, 'এই পাগলী কি সুস্থ হবে রঘুদা? পরে না আরও গন্ডগোল বাঁধিয়ে দেয় তখন মালিক আমাদেরও বকবে।'

রঘু বলল, 'আমি আছি তোমরা কেন ভয় পাচ্ছ বল? আমার মনে হয় ভাল ব্যবহার, ভাল পরিচর্যা করলে পাগলীটা কিছুটা সুস্থ হয়ে যাবে। কারণ ওর লক্ষণগুলি ভাল, তোমরা কয়েকটা দিন যতটুকুন পার নজর রাখো। তাছাড়া ওকে হোটেলের কাজে ঢুকিয়ে দেব। পেঁয়াজ, আলু, সবজি ওকে ভেতরের ঘরে কাটতে দাও দেখবে হোটেলেরও লাভ হবে। প্রতিদিন বিনে পয়সায় তো কাউকে খাওয়ানো যায় না।'

পরদিন হোটেলে ফিরে রঘু দেখে পাগলীর চেহারা আমূল পাল্টে গেছে। মুন্ডিত মস্তক, নতুন লালপাড় শাড়ি, হাতে কয়েক গাছা চুড়ি ও টিপ পরে পাগলীটা সবজি কাটছে বসে। ওর শরীরের ময়লা তুলতে নিশ্চয়ই মাসিদের অনেক সাবান সোডা খরচ করতে হয়েছে। খোকা সহ অন্য দুজন কর্মচারী এবং মাসিরা রঘু ফিরতেই এমন জোরে হাসতে লাগল। রঘুও না হেসে পারল না। রঘু একটু সময় লক্ষ্য করে দেখল যে যেখানে ডাকছে সে যাচ্ছে। অন্যদের কথা বুঝতে ওর অসুবিধে হচ্ছে না। রঘু ওকে কাছে ডাকতেই সে কাছে এল। কিন্তু রঘুর প্রশ্নের সে কোন উত্তর দিল না। বিড়বিড় করে অনুচ্চারিত স্বরে কিছু বলতে লাগল। রঘু জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাড়ি কোথায়?' সে নিরুত্তর। রঘু বলল, 'তুমি এখানে কাজ করবে, খাওয়া পরার সব দায়িত্ব আমাদের ঠিক আছে। তবে হোটেল ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। তোমার দেখাশোনা ঐ মাসিরা করবে।' কি বুঝল পাগলীটা বোঝা গেল না। রঘু মাসিদের বলল, 'তোমরা আজ সন্ধ্যায় ওকে একটু ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে এসো তো।'

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পাগলীটার স্বভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না। মাঝে মাঝেই হোটেল ছেড়ে সে বেরিয়ে যায়, আবার নিজে থেকেই ফিরে আসে। কখনো সখনো লোক পাঠিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসতে হয়। রঘুর মধ্যেও একটা জেদ চেপে বসল ওকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলার। রঘু ভাবল, যদি পাগলীটা সুস্থ হয়ে যায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তাহলে ওর জন্য যেমন মঙ্গল এই সমাজের জন্যও মঙ্গল।

কিছুদিন পর পাগলীর অনেক পরির্বতন লক্ষ্য করল রঘু। মালিক গৌর সাহাও রঘুর মতোই এই পাগলীর মধ্যে একটা অজানা অকথিত অতীত আছে বুঝতে পারলেন। পাগলীকে দেখলে তার আদব কায়দা দেখে ওর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মালিক ও ম্যানেজার দুজনেই সেই অনাবিষ্কৃত অতীত খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠলেন।

গৌর সাহা শহরেই একটা ঘর ঠিক করে দিলেন পাগলীর জন্যে। কিন্তু পাগলী সেখানে একরাতও থাকেনি। সে প্রতি রাতে হোটেলের কাজ শেষে গোলবাজারে রাজ আমলের সেই পুরানো বারান্দায় রঘুদের পাশে গিয়ে শুয়ে থাকে। রঘুর স্বাবলম্বী হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা, তার সততা, ব্যক্তিত্ব, তার চারপাশের মানুষকে অজান্তেই মুগ্ধ করে ফেলে। এই পাগলীও কেন মনে হয় রঘুর এই সমব্যথী, পরোপকারী মনের ছোঁয়া পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে। রঘুর সান্নিধ্য, ভালোবাসা, শাসন ওর মধ্যে কিছু হারিয়ে যাওয়া অনুভূতি চেতনা পুনরায় জাগিয়ে দিল। এই সামান্য কয়েকটা দিনে পাগলীটার অভাবনীয় উন্নতি হল। ওর হাঁটাচলা, তাকানো, এমনকি কাপড় পরার স্টাইল পর্যন্ত পাল্টে গেল। ক্রমাগত তেলপানি পড়ে ওর শরীরের হারিয়ে যাওয়ার রং যেন পুনরায় ফিরে আসতে লাগল। নিয়মিত ডাক্তার দেখানো, অষুধ খাওয়ানো মাসিদের তত্ত্বাবধানে হতে লাগল। এছাড়াও সময়মতো ভাত খাওয়া, বিশ্রাম ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা হোটেলের সবাই পালা করে দেখতে লাগল।

রঘু দুপুরে একবেলা ভাত খায়। সারাদিন তার টিফিন করা ছাড়া আর খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই খাওয়ার অভ্যেসটা অর্জন করার জন্য রঘুর অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু না খেয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে মাঝে মাঝে শরীর বিদ্রোহ করে। তাই কিছুদিন হল বিহারি শ্রমিকদের মতো রঘু সকালবেলা খোকাকে সঙ্গে নিয়ে পরোটা ও তরকারি খেয়ে নেয়। কিন্তু ইদানীং তাদের দুজনের সাথে যুক্ত হল পাগলী। রঘু ও খোকা পয়সার অভাবে কোন কোনদিন না খেলেও পাগলীর খাওয়াটা নিয়মিত হয়।

একদিন দুপুরবেলা গৌর সাহার হোটেলে খেতে এলো বরুণ। শান্তিবাবুর আদরের ছাত্র বরুণ আগরতলা এম বি বি কলেজে এবার ভর্তি হয়েছে। রঘুর মতো তারও দুটি বৎসর নষ্ট হয়ে গেছে অর্থের অভাবে। বরুণের বাবা দরিদ্র কৃষক। বরুণের উচ্চশিক্ষায় পাঠানোর কোন ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু শান্তিবাবুর সহকর্মী বিনয়বাবুর ইচ্ছে ও উৎসাহে ছেলেকে না পাঠিয়ে পারলেন না। তবে ছেলেকে পাঠালেন ঠিকই কিন্তু তার হাতে পয়সা কড়ি কিছুই তেমন দিতে পারলেন না। অনেকটা ভাগ্যের উপর ভরসা করেই বরুণ চলে এলো আগরতলা শহরে পড়তে।

রঘুকে দুবছর পর ফিরে পেয়ে বরুণের আনন্দের যেন আর সীমা রইল না। তবে লম্বা চুল দাড়ি গজানো রঘুকে প্রথমে বরুণ চিনতেই পারেনি। পরে চিনতে পেরে হৈ চৈ করে জড়িয়ে ধরল রঘুকে। সে খেয়ে কোন কথা না বলে জোর করে রঘুকে ধরে নিয়ে গেল তার ভাড়া বাড়িতে কলেজটিলায়।

এম বি বি কলেজের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রঘু বরুণকে জিগ্যেস করল, 'বরুণ কলেজে ভর্তি হয়েছিস কতোদিন হল?'

'এই তো মাত্র দুই দিন।'

রঘু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বরুণ বলল, 'তুই খুব ভাল করেছিস রঘু বাড়ি

থেকে বেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছিস। আমার বাবা টাকা লাগাবে বলে কিছুতেই রাজি হলেন না।'

রঘু হাসল। 'আমি এখনও কলেজে ভর্তি হতে পারিনি রে।'

অবাক হল বরুণ। 'বলিস কিরে? দুবছর ধরে এখানেই তো পড়ে রইলি, কলেজটা শেষ করতে পারলি না?'

'কি করে করব বল? নিজের পেটের ভাতের জোগাড়ই তো এখনও করতে পারলাম না। সকালে মানুষের বাড়িতে কাজ করি, দুপুরে হোটেলে, রাতে রিক্সা চালাই। ইদানীং কিছু টাকা পাচ্ছি বটে - তবু নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে আরও কিছু দিন সময় চাই আমার।'

'কিন্তু তোর অবস্থা এতো খারাপ হল কেন রঘু? মাসিমা পেনশান পাচ্ছেন না?'

মার কথা উঠতেই রঘুর চোখে জল চলে এলো। আজ কতো দিন হল মার সাথে রঘুর দেখা নেই। বুকের ভিতরটা একা হলেই ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। তাইতো রঘুর আরও কাজ চাই - আরও আরও কাজ, নিজেকে সারাদিন ব্যস্ত রাখতে। না হয় এসব স্মৃতি ঘুরে ফিরে চলে আসে রঘুর সামনে। যা তাকে দিনের পর দিন রক্তাক্ত করে দিয়ে যায়। রঘু বলল, 'না রে, মার সাথেও আমার এখন যোগাযোগ নেই। মা তো বাপের বাড়ি নদিয়ায় চলে গেছেন অনেক দিন হল।'

বরুণ কি যেন ভাবল তারপর বলল, 'তোর কাকা কিন্তু মরে যায়নি রঘু। বেঁচে গেছে, এখন তো পুরো সুস্থ।'

রঘু কথাটা শুনে ভয়ানক চমকে উঠল। কাকা বাঁচবে সেটা যেন সে কল্পনাই করতে পারছে না। সবাই যা বলেছিল তাতে রঘুর মনে হয়নি কাকা বাঁচবে। রঘুর বুকের উপর চেপে বসে থাকা একটা বিশাল পাথর যেন খসে পড়ে গেল। ভীষণ হালকা লাগছিল রঘুর নিজেকে। আগে মনে হোত কলাবাগান, নবগ্রামের মানুষের চোখে রঘু একজন খুনির ছেলে হিসেবে পরিচিত। রঘু হেসে বলল, 'ভাল খবর দিলি বরুণ। মনের কোণে একটা অপরাধবোধ সবসময় খোঁচা দিয়ে নিজেকে রক্তাক্ত করতো, আজ তার থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।'

'নিজেদের অপরাধী ভাবার কোন কারণ নেই রঘু। তোরা কেমন মানুষ ছিলি এলাকার সবাই জানে। স্যার এবং মাসিমার মতো উদার মনের মানুষ এই অঞ্চলে ছিলই না। পাপতো করেছে তোর কাকা তার ফলও ভোগ করছে। আগের রমরমা অবস্থা আর নেই এখন ভাটার টান লেগেছে ব্যবসায়। সব দিক দিয়েই শুকিয়ে যাচ্ছে।'

রঘু আর এই বিষয়ে কথা বলতে উৎসাহ দেখায়নি। বরুণ জিজ্ঞেস করল, 'তোর কাগজপত্র সব সাথে আছে রঘু?'

'কেন?'

'আমি বলি কি তুইও কলেজে ভর্তি হয়ে যা, দুজনে একসাথে পড়াশোনা

করব। আমি যে বাড়িতে থাকি তুইও ওখানে থাকতে পারবি। বাড়ির মালিক মহিলাটা বড় দজ্জাল, তবে মনটা ভাল। যদি একবার টিকে যেতে পারি তাহলে আর চিন্তা নেই।'

'কিন্তু আমি কলেজে ক্লাস কি করে করব? হোটেলে দুপুরে কাজ করি না?'

'আরে ভাই প্রতিদিন তোকে ক্লাশ করতে হবে না। সপ্তাহে দুই দিন ক্লাশ করলেই তুই পারবি। তোর মাথাটা তো খুব ভাল, আমার মতো না। তাছাড়া আমরা এক সেট্ বই কিনে দুজনে পড়ব। আরও একটা কথা বলি খারাপ পাবি না বন্ধু।'

'হ্যাঁ বল।'

'এই যে বললি রিক্সা চালাস, দিনমজুরের কাজ করিস এগুলি ছেড়ে দে। আমার অবস্থা তো তোরই মতো, আমি গাড়ির হ্যান্ডিম্যান হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম যাইনি। আমি যে বাড়িতে থাকি সেই মালিকের সাতটা ভিন্ন বয়েসী বাচ্চা আছে, তাদের পড়াই। বিনিময়ে এই বাড়িতে বিনে পয়সায় থাকার সুযোগ এবং দুবেলা ভাত ও একবেলা টিফিন পাই। ফলে বাচ্চাদের পড়িয়ে নিজের পড়াশোনাটাও আমার হবে। কিন্তু অন্য কাজে ঢুকে গেলে পড়াশোনার ফোকাসটা নড়ে যাবে।'

রঘু হেসে বলল, 'ভুল বললি বরুণ, আসল কথা হল মোটিভেশন। ওটা যদি ঠিক থাকে যে কোন কাজ করো তোমার হবেই।'

'সে যাই হোক এখন কথা দে আমার এখানে শিফ্ট করছিস।'

'তোর মালিক আমাকে থাকতে দেবে কেন বিনে পয়সায়?'

'ওসব নিয়ে ভাববি না। আমি আগেই কথা পরিষ্কার করে রেখেছি। এখানে প্রাণজিৎ আসার কথা ছিল কিন্তু সে আসেনি।'

'দেখি ভাবতে হবে। এই কদিনে এদিকে আমার কিছু দায়বদ্ধতা জন্মেছে। আমার একটা বন্ধু আছে খোকা তার সাথে বুঝতে হবে। তাছাড়া একটা পাগলীও আছে- ।'

কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিল বরুণ, 'পাগলী' তার মানে তুই বিয়ে করেছিস?'

'আরে না না সত্যিকারের রাস্তার পাগল মেয়েটা। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি ওকে সুস্থ করার। কিন্তু আমি সরে গেলে সে আবার অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।'

কথা বলতে বলতেই ওরা ভাড়া বাড়িতে পৌঁছে গেল। বরুণের ঘরটা তুলনায় বেশ বড়। ধাড়ির উপর বাঁশের চটি বেঁধে বেড়া তৈরি করা হয়েছে। উপরে ছনের ছাউনি দেওয়া। অনেক ভাড়াটিয়া আছে এই বাড়িতে।

বরুণের ঘরে ঢুকেই রঘু বিছানায় শরীর ছেড়ে দিল। এই বাড়িটা খুব

বেশি দিনের পুরোনো নয়। চারিদিকে গাছের জঙ্গাল লেগে রয়েছে। বরুণ গ্লাসে জল আর বাটিতে মুড়ি এগিয়ে দিল।

'তাহলে কি করবি রঘু?'

'ভাবছি।'

'এতে ভাবার কি আছে? হ্যাঁ বলে দে তাহলেই হল। সত্যি বলতে কি জানিস তোকে পেলে আমার আর কোন চিন্তা নেই। দেখিস আমরা দুটি মহাসুখে থাকব।'

'পড়াশোনার কথা উঠলে মনটা দুর্বল হয়ে যায়। কলেজে পড়ব আমার স্বপ্ন ছিল। মা বাবার দেখানো স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করব। এই কথাগুলি ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

'তাহলে অসুবিধা কি? চল তোর জিনিসপত্তর সব নিয়ে আসি।'

'যেদিন আমি লেখাপড়া করে বড় হব, রোজগার করতে শুরু করব সেদিন মার কাছে ফিরে যাব। তার আগে মাকে মুখ দেখাব না।'

'তাহলে ফাইনাল হয়ে গেল?'

'খোকার সাথে আগে কথা বলি তারপর তোকে জানাব। তবে আমি কিন্তু বিনে পয়সায় এই বাড়িতে থাকব না। ভাড়া দিয়ে থাকব এবং হোটেলে খাব।'

'সে তোর ইচ্ছে, আমি বিনে পয়সায় থাকব খাব সব করব বিনিময়ে ওদের শিক্ষা দান করবো।'

বরুণ মুড়িতে সরষের তেল, লবণ, পেঁয়াজ মেখে নেওয়ায় বেশ ভাল লাগছিল খেতে। হঠাৎ বাড়ির মালিক মহিলা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এই বরুণ - তোর চা নিয়ে যা।'

বরুণ ছুটে গেল চা আনতে। বলল, 'মাসিমা আমার বন্ধু যে বলেছিলাম আসবে, সে এসেছে। এখানেই আমার সাথে থাকবে। আর এক কাপ চা পাওয়া যাবে?'

কথাটা শুনেই মালকিন প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'তোর বন্ধু! এসেছে? কোথায় দেখি?' কিন্তু রঘুকে দেখেই নাক সিটকে উঠলেন তিনি। 'একি রে বরুণ - তোর বন্ধুটা দেখি মড়া পোমুহনীর গাঁজাখোর সাধুর মতো দেখতে। লম্বা লম্বা চুল দাড়ি। এটা কলেজে পড়বে? পাগল মনে করে মানুষ তো ওকে ঢিল ছুঁড়বে।'

রঘু হাসল। কিন্তু বরুণের অবস্থা তখন কাহিল। এই মহিলাকে চুপ করানো তার সাধ্য নয়। তাই দাঁতে নিজের নখ খুঁটা ছাড়া সে কিছুই করতে পারল না। মালকিন আবার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এই- বেকুবের মতো আবার হাসছ কেন মদন? মাথায় গন্ডগোল নেই তো? তবে শুনে রাখ এখানে থাকতে হলে চুল দাড়ি কেটে সুন্দর পোশাক পরে থাকতে হবে।'

মহিলা বেরিয়ে যেতেই বরুণ রঘুর হাত ধরে বলল, 'রঘু মাসিমার কথায়

তুই কিছু মনে করিস না ভাই। ওনার কথাবার্তার ধরনই এমন, তবে মানুষ হিসেবে কিন্তু খারাপ না।'

রঘু বলল, 'না না খারাপ পাব কেন? উনি তো ঠিকই বলেছেন। তোর আয়নায় এক্ষুনি নিজেকে দেখলাম, আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারছি না।'

বরুণ হা হা করে হেসে উঠল। মহিলার বড় মেয়েটা খট্ করে চায়ের কাপটা রেখে চলে গেল। রঘু বলল, 'এই বাড়িতে যদি থাকি তাহলে চুল দাড়ি কেটেই আসব। না হয় বাচ্চাগুলি সত্যিই ভয় পাবে।'

'তবে এটা ঠিকই বলেছেন মাসিমা। এতো লম্বা চুল দাড়ি রাখলি কেন? অবশ্য কুসুম থেকে আঘাত পাওয়ার পর কোন ছেলেই বা নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে।'

রঘুর শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের শক্ লাগল। কুসুমকে নিয়ে এসব কি বলছে বরুণ? বরুণ তখনও একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে, 'বেইমান - বেইমান, মেয়ে জাতটাই হল সুখের পায়রা। তোদের বাড়িতে বড় হল, অথচ তোরা বেকায়দায় পড়তেই কি বেমালুম ডানা মেলে হাওয়ায় উড়ে গেল ভাবতে পারছিস? সেদিন জানিস রঘু, কুসুমের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। অনেকদিন হল বাপের বাড়িতে আছে। বাচ্চাটা তো বেশ বড় হয়ে গেছে তাও বাপের বাড়িতেই পড়ে আছে, মনে হয় আরও কিছুদিন এখানেই থাকবে। আমার সাথে দেখা হতেই বলল, তুমি কেমন আছ বরুণদা? আমি বললাম, ভাল। তুমি কেমন আছ কুসুম? সে মুখটা শুকিয়ে বলল, এই আছি - বলতে পার মরে বেঁচে আছি। তারপর আমাকে বলে কি জানিস? বলে, রঘুদা কোথায় আছে বরুণদা তুমি জান? আমি বললাম, না গো আমার সাথে দু আড়াই বছর যাবৎ দেখা নেই। তখন বলে কি, যদি দেখা হয় তো রঘুদাকে বলবে একটা বিশেষ কথা ছিল। সময় করে অন্তত একবার যেন আমার সাথে দেখা করে যায়। ওর কথা শুনে আমার মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল জানিস, একটা ছেলের জীবন নষ্ট করে দিয়ে এখন আবার ন্যাকামি করছে, বাজে মেয়ে।'

রঘু পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল বরুণের কথা শোনে। কি বলবে সে বরুণকে? কি জানে বরুণ কুসুম সম্বন্ধে? তার চেহারা দেখে নিজেকে সামলে নিল বরুণ। রঘু বরুণের হাত ধরে বলল, 'কুসুম অনেক বড় মনের মানুষ। ওকে আর কোনদিন ছোট করে আমার সাথে কথা বলবি না।'

কথাটা বলেই রঘু ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল হোটেলের দিকে। হোটেলে সবাই নিশ্চয়ই এখনও আছে। খোকাকে পেতে হবে। ওর সাথে অনেক কথা আছে রঘুর। খোকাটা বড় সরল। রঘু সরে গেলে সে আবার আগের মতো অলস কর্মবিমুখ হয়ে যাবে না তো? যে জায়গাটা ওরা দুজন মিলে কিনবে বলে টাকা অ্যাড্‌ভান্স করেছিল সেটাও ধরে রাখতে পারবে কি? নানারকম জটিল ভাবনা মাথায় রঘুর গিজ্‌গিজ্ করতে লাগল।

সন্ধে হয়ে গেছে। অনেকদিন ভুলে ছিল সে তার মা, কুসুম ও

আইচুকতিকে। বরুণের সাথে দেখা হতেই এই তিন নারী আবার রঘুর ভেতরটা উথালপাতাল করে দিল। কুসুম কেন খুঁজছে রঘুকে? না রঘু ও কুসুমের সম্পর্কের মাঝখানে তেমন আর কিছু অবশিষ্ট নেই যা নতুন করে রঘুকে জানানো দরকার। তাহলে কি কথা লুকানো আছে কুসুমের কাছে? যা বলতে রঘুকে খুঁজছে সে। কি বলতে চায় কুসুম বিয়ের এতোদিন পরে আবার রঘুকে?

চারিদিকে সন্ধ্যার উলুধ্বনি আর ঘন্টা বাজছে। তার পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে। সন্ধ্যার আকাশে ঝলমলে তারা ফুটেছে ভোরবেলার শিউলি ফুলের মতো। মা সম্বন্ধে ঐ এলাকার লোকদের নিশ্চয় ভাল ধারণাই আছে। অন্তত বরুণের কথা শুনে তাইতো মনে হয়। রঘু তার মাকে চেনে, জানে। তার মা শুধু বড় ঘরের মেয়েই নন বড় বাড়ির বউও ছিলেন। প্রচণ্ড দৃঢ় চরিত্রের উদারমনা মহিলা। তাকে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারেই না। অথচ বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে রঘুর মাকে ওর দেবর আর গ্রামের লোক মিলে কলঙ্কিনী বানিয়ে ছেড়েছে। যদি কেউ সঠিক চিনে থাকে মাকে তাহলে ঐ কুসুম। কিন্তু মা পালিয়ে গেলেন কেন? রঘুকে একা ফেলে কেন চলে গেলেন তিনি? পুলিশের ভয়ে? না কি লোকলজ্জার ভয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেলেন? চলে গিয়ে একবার খোঁজও নিলেন না রঘুর?

বরুণের উপর রাগটা পড়ে গেল রঘুর। বরুণ সত্যিই ভালবাসে রঘুকে। কুসুম সম্বন্ধে ওর যে মূল্যায়ন তাতে তো দোষ নেই কিছু। প্রতিটি ঘটনার সত্যতা জনসমক্ষে কখনোই আসে না, নানান কারণে আসতে পারে না। তখন লোকজন তার সহজ সমাধান করে নেয় নিজের মতো করে। বাড়ির মালকিনের কথাটা মনে পড়ায় হঠাৎ হাসি পেল রঘুর। এতো স্পষ্ট অপ্রিয় শব্দ কাউকে বলতে পারাটাও মানুষের একটা মহৎ গুণ। মহিলা বাহ্যিকভাবে কড়া ধাতের হলেও তার ভেতরটা নিশ্চিত সাফ। মহিলা ও বরুণের প্রশ্নগুলি রঘুর মনে বাজতে লাগল। জমিদারদের বংশধর হয়েও কেন রিক্সা চালায় রঘু? মজুরি করে হাটে ঘাটে বাজারে দুবছর ধরে? কেন তার এই রাজকীয় চেহারার উপর পাগলের মতো চুল দাড়ি? কেন দুবছর ধরে শরীরে সাবান তেল কিছুই দেয়নি রঘু? একটাও নতুন জামা কাপড় পরেনি? পুজোর সময় মালিকের দেওয়া দুই জোড়া শার্ট প্যান্টও রেখে দিয়েছে তার ব্যাগের ভিতর? কেন এই বৈরাগ্য? কেন একবেলা ভাত খেয়ে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে রঘু? এখন তো দুবেলা তিনবেলা খেতে কোন অসুবিধা নেই তার। ভাল পয়সা সে প্রতিদিন রোজগার করে। শুধু ম্যানেজারের কাজটা করলেই যে কোন লোক তার ভরা সংসার চালাতে পারে। তাহলে রঘু পারবে না কেন? এটা কি তাহলে তার মনের কোণের জমিদারসুলভ বিত্তবাসনা? জ্ঞান নয় বিত্তের প্রতিই তার লোভ জেগেছে বেশি?

হাজারো প্রশ্ন রঘুর মাথায় কিলবিল করতে লাগল। আসলে বরুণরা কেউ জানে না আসল কথাটি। রঘু যে দুইটি মানুষকে জীবনে প্রাণের অধিক ভালোবাসতো

সে তার মা ও কুসুম। তাদের দুজনেই যখন জীবন থেকে হারিয়ে গেল তখন আত্মহত্যা করার খুব ইচ্ছে হয়েছিল তার। শুধু পারেনি আইচুকতির জন্য। এই একটি মেয়ে আলোর দীপ নিয়ে যেন সর্বদা রঘুর জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু নিজের উপর রঘুর রাগ কমল না। এইটুকুন ভাগ্য যাকে সাহায্য করে না তার সফল হওয়া জীবনে কঠিন। ফলে আর বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। সমাজের সবচাইতে নীচুতলায় হাঁটতে হবে যেখান থেকে আর কোনদিন পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। আর যদি পড়েও যায় তাহলে বড় আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। কারণ এখানে ব্যবধান নিতান্তই কম। তাই নিজেকে পুড়িয়ে নেওয়া, পোড়াতে পোড়াতে শুধু খাঁটি জিনিসটাই রেখে দেওয়া যা আর কোন ঝড়েই ভেঙে পড়বে না তার গ্যারান্টি দেওয়া।

আর কতোদিন এমন করে চলবে রঘু? আইচুকতিকে দেওয়া সময়টা চলে গেছে। কি করবে আইচুকতি? সহজ সরল প্রাণচঞ্চল আইচুকতি রঘুর জীবনের এই কঠিন বিপদসঙ্কুল আবর্তে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা নিশ্চয় জানে না। সে হয়তো সাধারণ সব মহাজনের মতোই রঘুকেও মূল্যায়ন করে কষ্ট পাবে। যদি অবশেষে ওর ধৈর্য্য ভেঙে যায়? সেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে রঘুর উপর রাগ করে তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়। কি হবে? দেনা পাওনা নিয়ে রঘু আজ একেবারেই নির্লোভ। কিন্তু এই জায়গাটায় রঘুর দুর্বলতা এখনও আছে। এখানে মোহহীন হওয়ার মতো বৈরাগ্য অর্জন এখনও সে করতে পারেনি। যে কারণে কুসুমের প্রতি তার দুর্বলতা আজও বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। বরং যত বিচ্ছেদ বেড়েছে ততই কুসুমের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার গভীরতা তার বেড়েছে। রঘু মনে মনে ভাবল, আইচুকতির কাছে ফিরে যেতে হবে আবার এবং অচিরেই।

একটা সেলুনে ঢুকে গেল রঘু। চুল দাড়ি কাটতেই পুরানো ঝকঝকে চেহারাটা আবার বেরিয়ে এল। বহুদিন নিজেকে আয়নায় দেখেনি সে কারণ তার কোন প্রয়োজন হয়নি। আজ অনেকদিন পর নিজেকে দেখে চিনতে পারল সে, মনে হল হারিয়ে যাওয়া পরিচিত কাউকে যেন অনেকদিন পর দেখল। ঠিকই তো আছে, আগের জৌলুস হয়তো নেই তবু একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়নি সব। সেলুন থেকে সোজা চলে গেল তার ব্যাগটার কাছে গোলবাজারে। সেখানে শার্ট প্যান্ট পরতেই রঘুর নিজেকে বড় বেমানান লাগল। তার চাইতে লুংগি ও ফতুয়া যেন ভাল ছিল। নতুন কাপড়ের গন্ধ, সেলুনের আঁতর রঘুর মনটা যেন মাতাল করে দিল। অদ্ভুত এক নেশায় বুঁদ হয়ে রইল সে কিছুক্ষণ।

হোটেলে ফিরে যেতেই কেউ খেতে এসেছে ভেবে সবাই প্রথমে আপ্যায়ন করল। পরে চিনতে পেরে সবাই মিলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। পাগলী পর্যন্ত হেসে অস্থির। মালিক গৌর সাহা মোটা মানুষ, কখনই তেমন হাসেন না। কিন্তু হাসি উঠলে সারা শরীর ভুঁড়ি নাচিয়ে এমন হাসি হাসেন রাতে শরীরের ব্যথায় হয়তো ঘুমোতেই পারেন না। অবশেষে মালিক হাসি থামিয়ে বললেন,

'কিরে রঘু তুই, মেয়ে দেখতে গিয়েছিলি বুঝি?'

রঘু হেসে বলল, 'না কাকু তা নয়। তবে আপনার সাথে একটু কথা আছে। হোটেল বন্ধ হয়ে গেলে তারপর বলব।' গৌরবাবু তখনও হেসে রসিক ইঙ্গিত করে বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে আমি যা বোঝার বুঝে গেছি।'

হোটেলের হিসেব নিকেশ শেষ হয়ে গেলে গৌরবাবু ডাকলেন রঘুকে, 'নে বল কি বলবি বলেছিলি।'

খোকা আর পাগলী ছাড়া বাকি সবাই চলে গেছে। রঘুদের তাড়া নেই কারণ আকাশের নিচে বিরাট বিছানা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। একটু পরে খোকাও বেরিয়ে গেল। সে বলে গেল, 'আমি গাড়ি নিয়ে বেরুব রে রঘু।' রিক্সাওয়ালারা তাদের রিক্সাকে নিজেরা গাড়ি বলে সবার সামনে। রঘু আজ রাতে রিক্সা চালাবে না বলায় খোকা প্রথমে একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু গুরুর হঠাৎ এই পরির্বতন দেখে সে বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। তাই সে চলে গেল।

রঘু হেসে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি কাকু। আমি স্কুল ফাইনাল প্রথম বিভাগে সত্তর শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছিলাম।'

গৌরবাবু পড়াশোনা তেমন করেননি তবে শিক্ষার কদর করেন। তার ছোট ভাই প্রায় পাঁচবার পরীক্ষা দিয়েও কোন মতে স্কুল ফাইনাল পাস করেছিল, সেখানে সত্তর শতাংশ নম্বর তো বিশাল ব্যাপার। তিনি অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'বলিস কিরে! স্কুল ফাইনাল প্রথম বিভাগে পাস করে তুই হোটেলে কাজ করছিস? না না এটা তো অধর্ম হয়ে যাচ্ছে। আমি যে মহাপাতকী হব। তুই এক্ষুনি বের হ - বের হ আমার ঘর থেকে।'

'আপনার ভরসায়ই তো বেঁচে আছি। আপনি বের করে দিলে আমি খাব কি?'

'কেন চাকরি করবি। স্কুলের জন্য শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তুই হোটেলে কাজ করছিস?'

'আসলে অমি আরও পড়তে চাই কাকু। বাবা মার স্বপ্ন ছিল আমি ব্যারিষ্টার হব, তাই চাকরি করিনি।'

'হারামজাদা পড়তে চাইলে পড়িসনি কেন? নিজের দুটো বছর নষ্ট করে দিলি হোটেলে গোলামি করে? রিক্সা চালিয়ে মজদুরী করে কাটিয়ে দিলি মূল্যবান সময়টা। এতো ভাল মাস্টারি চাকরিটাও নিলি না?'

'হোটেলে কাজ নিয়েছি বলেই তো বেঁচে আছি। আপনার মতো মানুষের দেখা পেয়েছি।'

'ও সব মন ভুলানো কথায় কাজ হবে না। আগামিকাল সকালেই যাও, কলেজে ভর্তি হও গিয়ে। না হয় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব ঘর থেকে। টাকা পয়সা যা লাগবে আমি দেব ওসব নিয়ে চিন্তা করবে না।'

'ঠিক আছে কাকু। আর বলছিলাম কি ডিউটিটা আমি এখন থেকে শুধু

রাতের বেলা করব। দুপুর তিনটে থেকে রাত অব্দি যতক্ষণ হোটেল খোলা থাকে আমি কাজ করব। আমার চাকরিটা যেন থাকে সেটা দেখবেন।'

'হারামজাদা বলে কি? তোর সব দায়িত্ব এখন আমার। টাকা পয়সা যা লাগবে চেয়ে নিবি, সংকোচ করবি না।'

গৌর সাহার ব্যবহারে রঘুর চোখে জল এসে গেল। মনে মনে স্থির করল না আগামিকালই যাবে কলেজে। এই সুযোগ আর জীবনে কখনো আসবে কি না কে জানে।

আজ এতো তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে গেল বলে রঘুর কেমন জানি অস্বস্তি হল। প্রতিদিন এই সময় রিক্সা নিয়ে শহরের অলিগলি ঘুরে বেড়াত। রঘু তাই রাস্তায় অসংলগ্ন ভাবে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখল পাগলীটা তার পেছন পেছন আসছে। পাগলীটার অনেক পরিবর্তন এসেছে জীবনে। গৌরবাবু ওর কাজ করার একাগ্রতা দেখে বললেন, 'সবাই যখন বেতন নেয় পাগলী নেবে না কেন?' সেই মাস থেকে বেতনটা তুলে দেন গৌরবাবু পাগলীর হাতে। সেই টাকা পেয়ে পাগলীর আর আনন্দ ধরে না। একে ওকে বারবার দিয়ে দেয় পুরো টাকাটাই। হোটেলে যারা কাজ করছে তারা এবং বাইরের লোকদের কেউ টাকাটা সরিয়ে নিতে পারে ভেবে রঘু ওই টাকাটা গৌরবাবুর কাছে রেখে দিল। একটা বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হল তাকে। তবে অভ্যাসবসত প্রায়ই সে সেই বারান্দায় চলে আসতো। রঘু ও খোকা ওকে জোর করে ওর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসতো।

ওকে দেখে প্রথম দিন থেকেই মনে হোত ওর পেছনে কিছু একটা অতীত লুকিয়ে আছে। দেশ ভাগের আগে ও পরে কতো মেয়ের জীবনে নেমে এসেছে কতো অভিশাপ। এমনওতো হতে পারে পাগলীটাও একটা বড় বিপর্যয়ের পরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ওর চলাফেরা আদব কায়দা, একা একা রবীন্দ্র আবৃত্তি করা, ফাংশানে নৃত্যরতা মেয়েদের সামনে বিভিন্ন মুদ্রায় চোস্ত নর্তকীর মতো নাচার মধ্যে একটা ঘরানা লুকিয়ে আছে। হয়তো সে কোন পরিবারের মেয়ে অথবা বৌ যারা তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ওকে ভুলে গেছে। পাগলীর চেহারার যে অধঃপতন হয়েছিল তার অনেকটাই পুনরুদ্ধার হয়েছে। যত্ন ও ভালবাসার আতিশয্যে পাগলী এখন নিয়মিত তেল সাবান দেয়, স্নো পাউডার মাখে। তাছাড়া নতুন শাড়ি কাপড় পরেই থাকে। আর কোনদিন গোলমাল করলেই রঘু ও গৌরবাবুর ধমকে কাজ হয়ে যায়। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে পাগলীর বয়সটা যেন কমে যাচ্ছে। এতোদিন ওকে মনে হতো পঞ্চাশ পঞ্চান্নের প্রৌঢ়া। আর এখন মনে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ চল্লিশের মহিলা। তার সম্বন্ধে হোটেলের মালিক ও কর্মচারীদের কৌতূহল আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না।

রঘু অনেক চেষ্টা করেও ওর নামটা জানতে পারেনি। নিজের নাম, ঠিকানা, বাবা বা স্বামীর নাম কিছুই সে বলতে পারে না। ওর কথা বলার ধরনটা একেবারেই স্থানীয় নয়। খাঁটি কোলকাতার টান ওর কথায় না থাকলেও বনেদি

বাড়ির মানুষরা যেমন কোলকাতার ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে নিজেদের মধ্যে অন্যদের থেকে আলাদা বোঝানোর জন্য। অথবা কোলকাতার বলার ঢং এখানকার কথার সাথে মিশে গেলে যা হয় তাও হতে পারে। যদিও পাগলী কথা বলে খুব কম।

রঘু ওর নামটা জানার জন্য একেকবার একেক নামে ডাকতে শুরু করল। একবার শেফালী, অন্যবার রেণু, মুক্তা, গান্ধারী, দুর্গা, কালী - কিন্তু পাগলী তো আর সাড়া দেয় না। একদিন কি মনে করে রঘু ডাকল, 'রমলা।' আড়াল থেকে পাগলী উত্তর দিল, 'যাই'। রঘু মজা পেয়ে আবার ডাকল, 'রমলা তাড়াতাড়ি এসো।' পাগলী এবার বাসন কোসন ফেলে আঁচলে হাত মুছে সোজা রঘুর সামনে চলে এলো। বিস্মিত রঘু ওকে বলল, 'রমলা তুমি হিসেবটা একটু লিখে রাখো আমি আসছি।'

সবাই রঘুর কাছে জানতে চাইল, এই রমলাটি কে? রঘু পাগলীকে দেখিয়ে দিতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল আনন্দে। যেন ওরা হিমালয়ের শিখরে উঠার গৌরব অর্জন করল। রঘু ইচ্ছে করেই রমলাকে দায়িত্ব দিয়ে বাইরে চলে গেল। আড়াল থেকে নজর দিয়ে দেখল রমলা কি করছে এবং কি আশ্চর্য্য একটু সময় পর ফিরে এসে রঘু দেখল রমলা গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে প্রতিটি খদ্দের পিছু ভাত লটপটি - আটানা, ভাত পাঠার মাংস সবজি - বারো আনা লিখে রেখেছে স্পষ্ট। রঘু যেতেই রমলা কলম ছেড়ে ওর কাজে চলে গেল। রঘুর ধারনা যে সঠিক ছিল তা রমলা বারবার প্রমাণ করছে। সে যতই নিজেকে প্রমাণ করছে রঘুরা ততই মরিয়া হয়ে উঠছে তারপর কি আছে খুঁজে পাওয়ার জন্যে। এটা যেন অপ্রকাশিত রহস্য উপন্যাস - একটু একটু করে তার আবরণ উন্মোচিত হচ্ছে।

খোকাও আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এল। আজ যেন রিক্সা নিয়ে ঘুরতে আর মজা পেল না সে। রাত এগারটার মধ্যে খোকা ফিরে এসে রঘুর পাশে ধপাস্ করে বসল। রঘুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার রঘু, হঠাৎ আজ শ্রমিক থেকে নায়ক বনে গেলি?' রঘু খোকাকে কাছে টেনে বলল, 'আগামিকাল সকালে কলেজে ভর্তি হতে যাব তো, তাই চুল দাড়িটা কেটে নিতে হল।'

'ভাল করেছিস রঘু। তোর চেহারা যে এতো সুন্দর এতোদিন মনেই হোত না।'

দুজনেই হেসে উঠল জোরে। রঘু বলল, 'ভাত খেয়েছিস খোকা?'

'না রে আজ রাত্রে আর খাব না, পেটে গন্ডগোল হচ্ছে। আচ্ছা রঘু কলেজে ভর্তি হয়ে গেলে তুই হোটেলের কাজটা ছেড়ে দিবি?'

'না হোটেলের কাজটা ছাড়ব না।'

'তাহলে রিক্সা তো নিশ্চয় চালাবি না?'

'হ্যাঁ রে। পড়াশোনা করে রিক্সা চালানোর মতো সময় মনে হয় আর পাব না।'

'সকালের কাজটা।'

'তাও ছেড়ে দেব।'

'তাহলে আমি কি করব রঘু? এতোদিন তুই যেভাবে বলতিস আমি সেভাবেই কাজ করেছি। এখন তোকে তো আর পাব না। আমি কি করে চলব?'

'খোকা তুই আমার ভাই। দুজনে একসাথে পরিশ্রম করে দুবছর ধরে কিছু পয়সা তো উপার্জন করেছি। যে ভিটি আমরা দুজনে কিনব বলে অ্যাড্‌ভান্স করেছি সেটা তোরই থাকবে।'

খোকা প্রতিবাদ করল, 'এটা তুই কি বলছিস? তুই দিয়ে দিলেই আমি নেব কেন? আমাদের দুজনের শরীরের রক্ত জল করা পয়সা কেন আমি একা নেব? দুটি বছরের প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত আমার মনে আছে রঘু। আমার চোখে বড় হওয়ার স্বপ্নটা তুইইতো বসিয়ে দিয়েছিস। তোকে ছাড়া আমি পারব না রঘু।'

'আমি দূরে সরে যাচ্ছি না রে তোর পাশেই আছি। হোটেলে আমরা একসাথে কাজ করব। কলেজটিলা একটা বাড়িতে ভাড়াও থাকব। প্রয়োজনে তুইও আমার সাথে থাকবি।'

'তুই বাড়ি ভাড়া নিবি? তার মানে নিজেকে আর কষ্ট দিবি না?'

'পড়াশোনা করতে গেলে এই সুবিধেটুকু আমার নিতে হবে খোকা।'

'তাহলে তুই যা আমি যাব না।'

কথা বলতে বলতেই মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়ল খোকা। রঘু বলল, 'তুইও আর রিক্সা চালাবি না খোকা।'

'তাহলে কি করব?'

'তুই পরোটা তরকারির দোকান দিবি মোটরস্ট্যান্ডে। সারা জীবন তোকে পুড়তে হবে কেন? তুই এতোদিনে নিজেকে পুড়িয়ে শুদ্ধ হয়ে গেছিস। এখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবি।'

'না রঘু, আমার তো তোর মতো লেখাপড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন নিজেকে পুড়াব আমি। যেদিন বুঝব শুদ্ধ হয়েছি সেদিন অন্য কাজ করব।'

'তাহলে তুই আমার সাথে থাকবি না?'

'না না পয়সা খরচ হয় এমন কাজে আমি নেই।'

'আমি কিন্তু আগামিকাল সকালেই কলেজটিলা চলে যাব।'

'যা।' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল খোকার, 'মাঝে মাঝে আমার কথাও ভাবিস। দেখিস পাশ করে বড় চাকরি করে আমাদের ভুলে যাস না যেন।'

রঘু কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। দুয়েকজনের নাক ডাকার ভয়ানক শব্দও কানে আসছে। রঘুর দূরে সরে যাওয়া খোকা মানতে পারছে না। যে স্বপ্ন রঘু খোকার চোখে বসিয়ে দিয়েছে সেই পথে চলে খোকা সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু পুরো পথটা এখনও অতিক্রম করতে পারেনি, তাই আশঙ্কায়, প্রকৃত বন্ধু হারানোর ব্যথায় সে মুহ্যমান হয়ে রইল। রঘু এক অদ্ভুত জাতের মানুষ,

সে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন মানুষের উপকার করতে সে ভুল করে না। এই বন্ধুটিকে অনেক ভাগ্যে খোকা পেয়েছে। তাকে হারিয়ে ফেলবে কিনা সেই ভয়টাই তাকে এখন তাড়া করছে। এতোদিন একসাথে চললেও আজ হঠাৎ যেন রঘুকে ভীষণ অপরিচিত লাগছে তার।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রঘু দেখে খোকা চলে গেছে কাজে। এতো সকালে খোকা কখনোই ঘুম থেকে উঠে না। প্রতিদিন রঘুই ওকে ঘুম থেকে জাগায়। কিন্তু আজ কি করে উঠল খোকা? তাহলে খোকা কি কাল রাতে ঘুমোয়নি? রঘুর মনটা খোকার জন্য দুলে উঠলেও নিজেকে সংবরণ করল সে। গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল লক্ষ্যটা যখন স্থির হয়ে গেছে অন্য কিছু ভেবে লাভ নেই। অর্জুনের পাখির চোখের মতোই তার নিশানা স্থির, শুধু পড়াশোনা করতে হবে এবং যেভাবেই হোক তাকে কলেজের পড়াশোনা শেষ করতে হবে। খোকা আজ রাগ করেছে ঠিকই, রঘুকে সে স্বার্থপরও ভাবতে পারে। কিন্তু রঘু যখন সফল হবে তখন সবচাইতে খুশি হবে খোকাই।

সাতসকালে বরুণ রঘুকে দেখে খুশি হয়ে গেল। এক রাত্রিতে রঘুর এতো পরিবর্তন চোখে লাগার মতো। রঘুকে যেন পাগল থেকে রাজপুত্তুরের মতো লাগছে। বাস্তবিকই রঘু তার মায়ের মতোই চেহারা ও গায়ের রঙ পেয়েছে। ফলে ওকে দেখে মানুষ মোহিত হয়ে যায়। রঘু ঘরে ঢুকেই বলল, 'বরুণ, তোর কাছেই ফিরে এলাম আবার। আমাকে জায়গা দিবি তো?'

'এটা তুই কি বললি রঘু? আমিও তো নিশ্চিন্ত হলাম তোকে পেয়ে, আমার পাশ করতে অসুবিধা হবে না এবার।'

'কলেজে অ্যাড্মিশনের কাগজপত্রগুলি কি কি লাগবে একটু গুছিয়ে দিবি?

দুজনে মিলে কাগজপত্র সব তৈরি করতে লাগল। এমন সময় সকালের ঠাকুর পুজো সেরে মধ্যগগনের সূর্যের মতো বিশাল এক সিঁদুরের ফোটা কপালে দিয়ে বাড়ির মালকিন বরুণের দরজায় এলেন। রঘুকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'এটা কেরে বরুণ? পড়াশোনা ছেড়ে নতুন নতুন ছেলে আমদানি করে আড্ডা বসিয়েছিস?'

বরুণ হাতে প্রসাদের বাতাসা নিয়ে জোড় হাতে প্রণাম করে উৎসাহের সাথে বলল, 'মাসিমা ওতো রঘু।'

'কে রঘু?'

'এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? গতকাল সন্ধের সময় তার সাথে কথা বললেন না!'

'গতকাল সন্ধ্যায় তোর এক দাড়িওয়ালা বাবাজি বন্ধু এসেছিল।'

'এ তো সেই।'

মালকিন বড় বড় চোখ করে রঘুর দিকে তাকালেন। তার যেন কিছুতেই

বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি রঘুকে ডাকলেন, 'এই শোন, তোমার নাম কি?'

'রাঘবেন্দ্র প্রসাদ রায়, ডাক নাম রঘু।'

'গতকাল তুমি এসেছিলে?'

'হ্যাঁ। আপনি বললেন তাই চুল দাড়ি আমি কেটে নিয়েছি।'

মালকিন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন একবার রঘু ও একবার বরুণের দিকে। 'তোরা আমাকে পাগল পেয়েছিস বরুণ? তুই শয়তান, তোর এই বন্ধুটাও ধূর্ত। তার চাইতে সাধু বাবাজিটা অনেক ভাল ছিল।'

কথার মাঝখানেই বাড়ির মালিক চলে এলেন। তার স্ত্রী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি গলা চড়িয়ে বললেন, 'তোমরা পেয়েছটা কি? পাগল পেয়েছ নাকি আমাকে?'

মালকিন ছেলে দুটির সামনে নিজেকে সামলে নিলেন। 'কি হয়েছে এতো মেজাজ করছো কেন বুড়ো?'

'আমার গামছাটা উঠোনে ঝোলানো ছিল, সেটা কে নিয়ে গেল? আমি যত বলি আমার গামছাটা তোমরা কেউ ধরবে না ততই গামছাটা কে নিয়ে যায় প্রতিদিন? আমি যে এই পরিবারের গার্জেন সে কথাটা তোমরা ভুলে যাও?'

'তোমার গামছা নেবে কে বলতো? ছেলেগুলি সব ছোট - বড়গুলি তো সব মেয়ে। তারা গামছা দিয়ে কি করবে?'

'আমিও তো তাই বলি। আজকে গামছা না পেলে আমিও বাড়ি মাথায় করে ছাড়ব। এই বরুণ তোরা নিয়েছিস আমার গামছা?'

রঘু হেসে বলল, 'আপনার কাঁধের গামছাটা কার মেসোমশাই?'

এবার মালকিন মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন, 'একি! নিজের কাঁধে গামছা নিয়ে সবাইকে দোষারোপ করছ? ভীমরতি ধরেছে তোমার? তোমাকে -- ইয়ে বলবে না তো কি বলবে মানুষ?'

মালিক হঠাৎ গামছাটা পেয়ে নিজের গলা ঘাড় মুছে অন্য হাতে তাল পাতার পাখা চালিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। মালকিন এবার রঘুর দিকে তাকালেন। 'তুমি তাহলে এই বাড়িতেই থাকবে?'

'যদি আপনি অনুমতি দেন।'

'তোমার খাওয়া দাওয়া আমাদের চুলোতেই হবে?'

'আজ্ঞে না। আমার খাওয়ার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি একটা হোটেলে কাজ করি সেখানে একবেলা খেয়ে নেই। আর দুইবেলা মুড়ি খেয়ে আমার চলে যায়।'

'তার মানে তুমি এক বেলা ভাত খাও?'

'হ্যাঁ মাসিমা।'

'দুই বেলা মুড়ি!'

রঘু হেসে বলল, 'বরুণের সাথে আপনাদের সম্পর্ক আগের মতোই

থাকবে। তবে আমি কিন্তু ঘর ভাড়া দিয়েই থাকব।'

'বেশ থাক। তবে মদ গাঁজা খাবে না, আর মেয়েমানুষ নিয়ে বাড়িতে ঢুকবে না। আর শোন খিদে পেলে না খেয়ে থেকো না আগে থেকে বলে এ ঘরেই খেয়ে নিও।' কথাগুলি বলে মালকিন রঘুর হাতে একখানা বাতাসা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

কলেজে ভর্তির সময় এখন। ফলে রঘুর অসুবিধে হোল না। বরুণ দৌড়ঝাঁপ করে সাহায্য করল এবং অবশেষে রঘু কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। কলেজে ভর্তি হয়ে রঘু ও বরুণ একসাথে ঘরে ফিরল। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ল রঘুর। খবরটা যদি মা পেতেন যে রঘু কলেজে ভর্তি হয়েছে তাহলে মা খুব খুশি হতেন, নিশ্চয় জীবিত থাকলে বাবাও খুব খুশি হতেন। রঘু ভাবল হোটেলে যাওয়ার আগে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে একবার প্রণাম করে যাবে।

রঘু এখানেই রয়ে গেল। তাদের পাশের একটা ঘরে এসে জায়গা পেল পাগলীটাও। সব শুনে মালকিন ও মালিক মরীয়া হয়ে উঠলেন পাগলীটাকে সুস্থ করতে। রঘু খুব খুশি হল, সত্যি সমাজে এখনও ভাল মানুষের সংখ্যাই বেশি। আর তাই তো এই সমাজ ও মানুষের মাঝে বাঁচতে ইচ্ছে করে আরও বহুকাল। রঘুর হাত থেকে পাগলীর দায়িত্ব চলে গেল মালকিনদের হাতে। প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত ডাক্তার দেখানো, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করানো চলতে লাগল। পাগলীও যেন দিন দিন একটু একটু করে পরিবর্তিত হতে লাগল। পাগলী এখন শুধু রঘুর নয় সে এই বাড়ির সবার পরমাত্মীয়। রঘু ও বরুণও উপকৃত হল পাগলীর উপস্থিতিতে। তাদের ঘরে একটা প্রকৃত ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি হল। কলেজে লেকচার শুনে ও হোটেলে কাজ করে সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল রঘুর।

আইচুকতির দেওয়া কয়েন দুটির সাথে ভোলার দেওয়া কয়েনগুলি একটা কাপড়ের পুঁটলিতে বাঁধা ছিল। সেদিন হঠাৎ কয়েনগুলি ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল। রঘু কয়েনগুলিকে আবার যত্ন করে পুঁটলিতে ব্যাগের এক কোণে রেখে দিল। আইচুকতির কাছে রঘুর করা প্রতিজ্ঞার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সে। তার হঠাৎ আইচুকতির কথা মনে পড়ল। তার মনে হল ক্লাশ এইটে পড়া আইচুকতিও ঠিকমতো পড়াশোনা করলে কিছুদিনের মধ্যে কলেজে আসতে পারে।

কি ভাবছে আইচুকতি রঘুকে। অল্প কটা দিনের মেলামেশায় আইচুকতি কেন রঘুকে এতো ভালোবেসে ফেলল। অথচ রঘু নিজেকে তৈরি করার, যোগ্য করার নেশায় আইচুকতির ভালবাসার টান যেন ছিন্ন করে ফেলেছে। আজ এই রুপোর টাকাগুলি ঝন্‌ঝন্ শব্দে আইচুকতির পায়ের খারুকের মতো বেজে উঠতেই রঘুর বুকে বিশাল এক শূন্যতার সৃষ্টি হল। কি এক অমোঘ টানে রঘু পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভরত চৌধুরী পাড়ার উদ্দেশে। অন্তত একবার আইচুকতির সাথে দেখা হওয়া দরকার। রঘু ওকে বুঝিয়ে বলবে তার দুঃসময়ের কথা।

আইচুকতি নিশ্চয়ই বুঝবে কি নিদারুণ কষ্ট করছে রঘু নিজে দাঁড়াবার

জন্য। অন্তত আরও তিন চারটে বছর সময় সে রঘুকে দেবে। আর যদি না দেয় এবার বিয়ে করে ওকে সংগে নিয়েই ফিরবে। একটা মেয়ের স্বপ্ন আর ইচ্ছেটা পুরণ করতে পারবে না রঘু? তাহলে আর পুরুষ হয়ে কি লাভ? কোন নতুনত্বহীন গতানুগতিক জীবন রঘুর আর ভালো লাগছিল না।

আসাম আগরতলা রোডের সামান্য কিছু উন্নতি হয়েছে এই ক বছরে। ফলে আগের মতো পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয় না দুর্গম আঠারমুড়া, বড়মুড়া। এই দুই পাহাড়ের বুক চিরে জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। কোথাও রাস্তা হয়েছে বটে তবু তা অতিক্রম করা খুবই কষ্টসাধ্য। রঘু এই পথে আগে কখনো যায়নি। সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে বিকেলে অনেক কষ্ট করে সে ভরত চৌধুরী পাড়া পৌঁছে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য গোটা পাড়াটাই যেন পূর্বের জায়গা থেকে হাওয়ায় উড়ে গেল। একটা টং ঘরও এই ত্রিসীমানায় নেই। কোন মানুষ জনও চোখে পড়ল না রঘুর। পুরানো রাস্তাগুলি জঙ্গালে ভরে গেছে। এখন ঐ রাস্তাগুলির উপর কোন মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রঘু মনে মনে ভাবল, শেষবার যখন ভরত চৌধুরী পাড়াতে রঘু এসেছিল তখন এই পাড়াটা প্রায় আট দশ মাইল সরে গিয়েছিল তার আগের জায়গা থেকে। রঘু ভেবেছিল নিশ্চয় ওরা জুমের ফসল তুলে আবার ফিরে আসবে তাদের পুরোনো জায়গায়। এখন সে বুঝতে পারছে তাদের প্রত্যাবর্তন আর ঘটেনি। বরং ওরা চলে গেছে আরও দুরে। কিন্তু কতদুরে রঘু সেটা জানে না।

তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। পাড়াটা যতদুরে যায় যাক না তাতে কি। কিন্তু ওরা যে তাদের সাথে নিয়ে গেছে আইচুকর্তিকে, রঘুর মনের মানুষটিকে। আঠারমুড়ার কোলের এই পাহাড়ি গ্রামটার অস্তিত্ব আজ বিলোপ হয়ে গেলেও রঘুর চোখের সামনে যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠল। পিরিখা, মণিমালা, দা-বুড়া, বিনন্দ, গিরীন্দ্র, বাচ্চু চোধুরী সবাই যেন রঘুর সামনে এসে দাঁড়াল। এক অদ্ভুত নস্টালজিয়ায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রঘু।

লাকড়ি কেটে একদল হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তারা রঘুকে দেখে দাঁড়াল। রঘু তাদের কাছে গিয়ে ভরত চৌধুরী পাড়া কোথায় জানতে চাইল। ছেলেমেয়েগুলি এতো অবাক হল যেন এই নামে কোন উপজাতি মহল্লা এই অঞ্চলে আছে তারা আগে শুনেইনি। রঘু আবার জানতে চাইল, আইচুকর্তি, পিরিখা বা বিনন্দ দেববর্মা নামে কাউকে তারা চেনে কি না? ওরা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। এরা কাউকেই চিনল না। লাকড়ি মাথায় নিয়ে ওরা হেলে দুলে চলে গেল। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেছে অথচ এদিক ওদিক ঘুরে রঘু তার পরিচিত ভরত চৌধুরী পাড়ার কোন সন্ধান পেল না।

এখানে আর একা থাকা ঠিক নয়, একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে। তাই কুলাই বাজারে দ্রুত ফিরে এল সে। কুলাই এসে খবর পেল পরদিন সকাল থেকেই শুরু হবে কুলাই সাপ্তাহিক বাজার। এই বাজারে বহু দুর দুর থেকে পাহাড়িরা

দল বেঁধে আসে এবং আজ রাত থেকেই ওরা আসতে শুরু করবে। রঘু রাতটা এখানেই একটা অস্থায়ী চালা ঘরে শুয়ে বসে কাটিয়ে দেবে স্থির করল। রঘুর মনে হল অন্তত একজন মানুষ সে পেয়ে যাবে যে ভরত চৌধুরীর মানুষদের চিনবে। ভরত চৌধুরী পাড়াটা কোথায় চলে গেছে একটা দিশা দিতে পারবে। তাছাড়া এমনও হতে পারে আইচুকতি, পিরিখা, তাদের বাবা বা দা-বুড়াকে কেউ না কেউ অবশ্যি চিনতে পারবে।

পরদিন ভোরবেলা মানুষের চলাচল কথাবার্তায় ঘুম ভেঙে গেল রঘুর। সে উঠে হাত মুখ ধুয়ে বাজারে পসরা সাজানো লোকজনদের মাঝে ভরত চৌধুরীর লোকজনদের খুঁজতে লাগল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভিড় বাড়তে লাগল। একটা সময় ভিড় এতো বেড়ে গেল বাজারের মাঝখানে হেঁটে যাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। তবু রঘু পাট-ধানের বাজার, শুয়োর-মুরগি বাজার, ছাগল-পাঁঠা বাজার আলাদা আলাদা করে খুঁজল। কিন্তু ভরত চৌধুরীর লোক পরিচিত কাউকে সে খুঁজে পেল না। অবশেষে একটা চায়ের দোকানে দীর্ঘ সময় বসে রইল সে ক্লান্ত হয়ে।

রঘু হতাশ হয়ে গেল। কোথায় খুঁজবে আইচুককে সে? এই যে জনজাতির মানুষজন বাজারের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তাদের কাছে আসলেই রঘুর মনের উপর আইচুকতি প্রজাপতির অজস্র ডানা মেলে দেয়। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না সে। নিজেকে অনেক প্রলোভন স্পৃহা থেকে বিরত করেছে, কিন্তু আইচুকতির অমোঘ টানের থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই তার।

মা, কুসুম, আইচুকতি তিনজনই কি রঘুর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে? মার সাথে, কুসুমের সাথে স্বেচ্ছা নির্বাসন পছন্দ করে রঘু। কিন্তু যার সাথে মিলন কামনা করে সেও যে অধরা থেকে যাচ্ছে। কোথায় আছে সে? কেমন আছে? বয়সন্ধি পেরিয়ে এখন সে পূর্ণ যুবতী। এখনও কি সে অপেক্ষা করছে শুধু রঘুর জন্য। নাকি অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে গেছে আইচুকতির।

আগরতলায় আবার ফিরে এলো সে। যদিও তারপরও, আরও দুইবার আইচুকতিকে খুঁজতে এই পাহাড়ে, ওই পাহাড়ে ঘুরেছে রঘু, কিন্তু আইচুকতিকে আর খুঁজে পায়নি সে। সামান্য একটা দিশা সে পেয়েছে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে যে ভরত চৌধুরী পাড়াটা এখন চলে গেছে খোয়াই সীমান্তের কাছাকাছি। তার মানে বাল্লার ইষ্টিশন হয়ে যেতে হবে সেখানে।

১১

রঘুর সাথে আইচুকতির দেখা নেই আজ কয়েক বছর হয়ে গেল। রঘু কথা দিয়েছিল সে ফিরে আসবে, কিন্তু আসেনি। সত্যিই রঘু আইচুকতিকে খুঁজতে এসেছিল কিনা তাও বোঝার কোন উপায় নেই। কারণ ভরত চৌধুরী পাড়াটা ক্রমাগত দুরে সরতে সরতে অনেকটা দুরে চলে গেছে। যে গ্রামটা আঠারমুড়ার মাথার উপরে কমলপুর সীমান্তে ছিল, তা এখন অঠারমুড়ার তলদেশ খোয়াই সীমান্তে চলে এসেছে। সাধারণত এই উপজাতি বস্তিগুলি এত দ্রুত জায়গা পরিবর্তন করে না। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে এই বস্তিটা যেন দ্রুত গতিতে মাত্র তিন চার বছরে এখানে চলে এলো।

বদন চৌধুরীতে গোলমালের পর থেকে তেমন বড়সড় আক্রমণ আর এই অঞ্চলে ঘটেনি। কিন্তু মাত্রা ছাড়া পুলিসি তল্লাশিতে গণমুক্তি পরিষদ ও কম্যুনিষ্ট নেতা কর্মীদের অধিকাংশই বাড়ি ঘর ছাড়া হয়ে গেলেন। দা-বুড়া সেই যে তিন বছর আগে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন তারও আর কোন খোঁজ পেল না আইচুকতিরা। বাড়িতে থাকাকালীন দুবার গভীর রাতে দা-বুড়াকে পাকড়াও করতে পুলিস বাড়ি ঘেরাও করেছিল। পুলিসের দলটা এতো নিঃশব্দে বাড়িটা ঘেরাও করেছিল কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। ঘরের দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু করায় বিনন্দ দরজা খুলে দিল। কিন্তু ঘরের ভেতর তার পাশের টিলা লুঙ্গা সব তল্লাশি চালিয়েও দা-বুড়াকে ওরা পেল না। দা-বুড়াকে না পেয়ে সমস্ত আক্রোশটা ওদের গিয়ে পড়ল তাঁর পরিবারের উপর। বিনন্দকে মারধর করে থানায় নিয়ে গেল। আর আইচুকতি, পিরিখা, ভাগ্যলক্ষ্মীদের সাথে করে গেল অশালীন ব্যবহার। একই রাতে আরও নেতা কর্মীর বাড়িও আক্রান্ত হল সারা ভরত চৌধুরী পাড়ায়। তবে বলরাম দেববর্মা ধরা পড়ে গেলেন। এই পুলিসি ধরপাকড় থেমে থেমে চলতেই থাকল। দা-বুড়া সেই যে পালিয়ে গেলেন আর এখনো ফিরলেন না। এলাকার লোকও ভেবে দেখল এখানে থাকা আর ঠিক নয়। থানার বড়বাবু যেন ভরত চৌধুরী পাড়াটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার খেলায় মত্ত হয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। তখন পাড়ার সব লোক মিলে স্থির করল এই থানা এলাকা ছেড়ে দুরে সরে যেতে হবে।

গ্রামটা ধীরে ধীরে সত্যিই সরে যেতে লাগল আর আইচুকতিরও মন ভেঙে গেল। আইচুকতিরা দুরে সরে গেলে রঘু কি করে খুঁজে পাবে তাকে? প্রথম যে জায়গায় গ্রামটা সরে গেল তা প্রায় দশ বার মাইল দুরে। সেখান থেকে আইচুকতি

ও পিরিখা কোনদিন মণিমালা সহ প্রায় প্রতিদিন ছুটে আসতো সরল বিশ্বাসে রঘুর ফিরে আসার আশায়। আইচুকতি নিশ্চিত ছিল রঘু ফিরে আসবেই। তার মন বলতো তাকে আসতেই হবে। প্রথমদিকে উৎসাহের সাথে পিরিখা, মণিমালা আইচুকতির সঙ্গ দিলেও ক্রমাগত ব্যর্থতায় ওদেরও মন ভেঙে গেল। ওরা এখন আর এতদুরে পুরোনো গ্রামে আসতে চায় না। কিন্তু আইচুকতির মন মানে না, ফলে সে একা একাই চলে আসে এই পাহাড়ে।

পাহাড়ি মহল্লাটাও আর আগের মতো নেই। ভাঙা বাড়ি ঘর, কোথাও বা দুয়েকটা বাঁশের খুঁটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জীর্ণ শীর্ণ একটা কঙ্কালের মতো এই গ্রামটাও আইচুকতির স্বপ্নের মতোই করুণ দশা নিয়ে এখনও জেগে আছে। এই পাহাড়ের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে ছোট মাজনের অনেক স্মৃতি। যা মনে পড়লেই আইচুকতি একা একা বসে কাঁদে। তবু এই কান্নাও কিছুটা সুখ এনে দেয় তাকে। তাই এখানে বারবার ছুটে আসতে ইচ্ছে করে তার। সবই তো আছে আগের মতোই। সেই জুম খেত, ঘন্টাছড়া বাজার, মায়াংটুকু। শুধু মানুষগুলি নেই। আর কোনদিন ফিরে আসবে কিনা কেউ জানে না।

একদিন পিরিখা আইচুকতিকে খুঁজে না পেয়ে সোজা চলে এল তাদের পুরোনো গ্রামে। কিন্তু এদিক ওদিক অনেক খোঁজেও তাকে না পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেল সে। আইচুকতি পিরিখা দুজনেই এখন যথেষ্ট বড়। আইচুকতি সাহসী মেয়ে বটে তবু বারবার এমন বেপরোয়া চলাফেরা নিরেট বোকামি। প্রতিদিন কি এক প্রবলটানে আইচুকতি এখানে চলে আসে পিরিখা বুঝতে পারে না। আইচুকতির চেহারা, হাসি দেখে ওর মনটাকে বোঝা যায় না। তবে পিরিখা ওর বাইকে তো চেনে, কি ভয়ানক জ্বালায় যে সে জ্বলছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পিরিখা জোরে চিৎকার করে ডাকল, 'বাই - , বাই- ।' পাহাড়ে এই শব্দ প্রতিধবনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পিরিখা যতবার ডাকল ততবার সেই একই শব্দ-তরঙ্গ প্রতিধ্বনি হয়ে তার কাছেই ফিরে এল। হঠাৎ পাহাড়ের অনেক উঁচুতে রঙ্গিন কাপড় দেখতে পেল পিরিখা। সে বুঝতে পারল এটা বাই হবে। সে পাহাড়ে উঠছে দেখে আইচুকতি নিঃশব্দে নিচে নেমে এল। পিরিখাকে কাছে পেয়ে হাউমাউ করে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল আইচুকতি। ওর কান্না যেন আর থামতেই চায় না।

পিরিখা মৃদু সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে বাই? কেন কাঁদছিস বল?'

'ছোট মাজন এখানে এসেছিল পরশুদিন।'

'কে বলল তোকে?'

'কয়েকটা হিন্দুস্থানী মেয়ের সাথে দেখা হয়েছিল। ওরা বলল -

'কি বলল?'

'একটা বাঙালি ছোড়া এসেছিল লম্বা চওড়া ফর্সা টানা টানা চোখ। সিটা এসে বিনন্দ দেববর্মার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলো। আইচুককে চিনি কি না সিটাও জানতে চাইল।'

'তাহলে নিশ্চয় ছোট মাজনই হবে।'

'এই মেয়েগুলি আমাদের বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারল না? ওরা বলে দিয়েছে, জানি না। তোদেরও দোষ আছে পিরিখা, আমি কত বলেছি সে ঠিক আসবে। আমার মন বলছে তোরা বিশ্বাস করলি না। গত পড়শুদিন যদি আমরা আসতাম তাহলে ছোট মাজনের সাথে দেখা হয়ে যেত।'

আইচুকতির মড়াকান্না দেখে পিরিখাও নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। দুই বোন মিলে নির্জন এই পাহাড়ে অঝোরে কাঁদল। আইচুকতি তখনও বলে যাচ্ছে, 'সে আমাকে পাগলের মতো খুঁজছে। আমি এখন কি করব পিরিখা? তুই বল আমি এখন কি করব?' আকাশে কালো মেঘ ছাতার মতো আইচুকতি ও পিরিখাকে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে ক্রমশ মাটির দিকে নেমে আসছে। কিন্তু ওরা দুজনের সেদিকে খেয়াল নেই। মৃদু বাতাস বইতে শুরু করায় পিরিখা ডাকল আইচুকতিকে, 'বাই বৃষ্টি আসছে।'

'আমার অন্তর জুড়িয়ে গেছে পিরিখা ছোট মাজন আমার খুঁজে এসেছিল। তার মানে সে আমাকে খুঁজছে।'

'তুই আর কাঁদিস না বাই। কাঁদতে কাঁদতে তোর কি চেহারা হয়েছে দেখ। এখন ছোট মাজন যদি আসে তোর এই চেহারা দেখে তোকে আর নিয়ে যাবে না। একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিস তুই।

'আমি আর কাঁদব না পিরিখা আর এখানেও আসব না। সে যখন আমাকে খুঁজছে তাহলে একদিন ঠিক আসবে সে। আর কোনদিন এমন করব না আমি। আবার যদি বেচাল দেখিস তুই আমাকে শাসন করিস।'

'লক্ষী বোন আমার - চল বাই এখুনি তুফান আসবে। বাতাস বইতে শুরু করেছে।'

সত্যি বাতাস বইতে শুরু করেছে। আইচুকতি তখনও বলে যাচ্ছে, 'যে দুটি মানুষের উপর ভরসা করতাম তারাও হারিয়ে গেল। না হয় দা-বুড়া বা বাচ্চু কাকু থাকলে ওরা চুপ করে বসে থাকত না। আমার জন্য কিছু একটা করতো।'

বাতাসের ঝটকা বেশ জোরে এসে লাগছে গায়ে। ওদের শরীরের কাপড়গুলি যেন টেনে হিঁচড়ে কেউ খুলে নিতে চাইছে। বাতাসের তীক্ষ্ণ শিষের শব্দ কানে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, বুকে ভয় ধরিয়ে দেয়। আইচুকতি ও পিরিখা প্রাণপণে ছুটতে লাগল। তীব্র হাওয়ার দাপটে ওদের যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাছের নিচে বা গোড়ায় লুকিয়েও রক্ষা নেই। এদিকে ওদিকে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে বিকট শব্দ করে। বাঁশ ঝাড়ের মাথাগুলি বারবার মাটিতে নেমে আসছিল। চারদিক থেকে শুধু ধ্বংসের শব্দ কানে আসছে। জঙ্গালের ভিতর দিয়ে যুবতী দুটি বোন প্রাণপণে ছুটছে বাঁচার জন্যে। ভয়ে ওদের মুখ কালো হয়ে গেছে। হঠাৎ শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। হাওয়ায় দাপটও কমে গেল বৃষ্টি শুরু হতেই। দুবোন মিলে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। কোথাও কোন বাড়ি ঘর নেই। নির্জন ফাঁকা অরণ্যে পাহাড়ের কোলে

দুইটি মেয়ে ঘন বৃষ্টিতে ভিজে অবশেষে বাড়িতে পৌঁছে গেল। সেই বৃষ্টি ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে গেল আইচুকতিকে। তার উচ্ছ্বাস, ছোট মাজনের প্রতি অমোঘ টান সব যেন কোথায় উবে গেল।

সেদিন থেকে আইচুকতি কেমন যেন চুপ মেরে গেল। ওকে দেখতে খুবই স্বাভাবিক লাগলেও পিরিখা বুঝতে পারতো বাই ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। আইচুকতিকে বিয়ের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে প্রস্তাব আসতে লাগল। কিন্তু আইচুকতি কোন কিছুতেই সাড়া দিল না। পড়া বন্ধ হয়ে গেছে নবম শ্রেণীতেই, কারণ বিনন্দ সবকটি বাচ্চার পড়াশোনা একসাথে চালাতে পারে না। পার্টির কাজেও আর তেমন উৎসাহ পায় না সে। সারাদিন বাড়ির কাজ খেতের কাজে ডুবিয়ে রাখে নিজেকে। মনের কথা বলার লোক নেই এই গ্রামে। মণিমালাদের মতো বন্ধুদের বিয়ে হয়ে গেছে। পিরিখাও কদিন পরে আগরতলা গিয়ে স্কুলে ভর্তি হবে। মেয়েদের বোর্ডিংএ থাকবে সে। আইচুকতি ভাবতে লাগল পিরিখা চলে গেলে এখানে কি করে থাকবে সে।

ভরত চৌধুরী পাড়াটা আইচুকতি ও রঘুর পরিচিত জায়গা ছেড়ে প্রায় ষাট মাইল উত্তর দিকে সরে গেছে দুভাগ হয়ে। অন্য ভাগটাতে রয়ে গেছেন বাচ্চু চৌধুরী সহ আরও অনেকে, তারা এদিকে আসতে চাননি। এই জায়গাটা ঠিক পাহাড় নয়। দুই টিলার মাঝখানে যে লুঙ্গাগুলি আছে তা সমতলভূমি। এখান থেকে সামান্য দুরে বাঙালিরাও আছে। বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যে নিত্য যোগাযোগও আছে। জুম চাষ এখানে খুব একটা হয় না। আইচুকতিরাও সমতল জমিতে হালের গরু দিয়ে চাষ করা শিখে গেছে। কি করে ধানের চারা তুলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে মাটিতে রুইতে হয় আইচুকতি এখন জানে। নিজের খেতের জমিগুলি আইচুকতি বাবা মায়ের সাথে মিলে চাষাবাদ করে। হালের গরুগুলি ছাড়াও বেশ কয়েকটি গরু, ছাগল, মুরগি, শুয়োর বিনন্দের আছে। বাঁচার জন্যে আইচুকতি ভাগ্যলক্ষ্মী ও তার ভাইরা মিলে এগুলি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেল।

জীবনের সমস্ত অতীত সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে গেল আইচুকতি। এখন আর একাকী নীরবে বসে কাঁদে না সে। চোখের জল যেন অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে। মাঝখানে একদিন পিরিখাও চলে গেল আগরতলা। তখন বাড়ির সবাই কাঁদলেও কাঁদেনি আইচুকতি। মণিমালা, ছবিকন্যাদের বিয়ে হয়ে গেছে আগেই। ফলে আইচুকতি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। আর যেন পৃথিবীতে কিছুই চাওয়া পাওয়ার নেই তার। ভাল ছাত্রী ছিল সে। কিন্তু রঘু চলে যাওয়ার পর লেখাপড়ায় আর মন বসেনি। দুবছর ফেল মারতেই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। বিনন্দেরও কিছু করার ছিল না। এক সাথে চারটে বাচ্চার পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। জীবনের সব কিছু হারিয়ে আইচুকতি যেন এক মৃন্ময়ী মূর্তি। ওর কিছু চাওয়ার নেই, অনুভূতিগুলি সব মরে গেছে। একে একে সব আত্মীয় স্বজন আইচুকতিকে বুঝিয়েছে, ভাল পাত্রের সন্ধান দিয়ে ওদের আগ্রহের কথা বলেছে।

কিন্তু আইচুকতির অবুঝ মন তাতে সাড়া দেয়নি। এক জটিল নিস্পৃহ আবর্তে আইচুকতির জীবন নৌকা ভাসতে লাগল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল ঠিকই তো আছে, জীবন তো এগিয়ে যাচ্ছে, যাক না। একটা দুটো করে জীবন থেকে অনেকগুলি দিন হারিয়ে গেছে। কারো প্রতীক্ষায় তিনটে বছর অপেক্ষা করা অনন্তকাল ধরে পথে বসে থাকার মতোই দীর্ঘ মনে হয়। আজ আর এই প্রতীক্ষার কোন মানে আছে কিনা আইচুকতি নিজেই জানে না।

মাঝে মাঝে ওরা এই জায়গা ছেড়ে অল্প কদিনের জন্য চৈত্র বৈশাখ মাসের দিকে পাহাড়ে চলে যায়। সেখানে টং ঘরে হয় তাদের অস্থায়ী ঠিকানা। জুমের খেতে সারাদিন খাটাখাটুনির পর যখন সন্ধ্যা নামে তখন ক্লান্ত শরীর আর চলতে চায় না। মনও উৎসাহিত হওয়ার মতো কোন কিছুই খুঁজে পায় না। সমস্ত পাহাড় জুড়ে শুধু নির্মম নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে অচেনা অজানা পশু পাখির ডাক ছাড়া পোকাদের ক্রমাগত উল্লাস চলতে থাকে সারাটা রাত ধরে। আইচুকতিদের পাশের পাহাড়ি টিলায় জুম করছে অন্য একটা পরিবার। সেই টিলার টং ঘরটি থেকে প্রতিরাতে ভেসে আসে জাদুকলিজার সুর। নানাহ প্রস্তাব, প্রশ্ন, উত্তর, কৌতুহল, অভিমানে ভরা গানের কলি বারবার উত্যক্ত করে আইচুকতিকে। অচেনা ছেলেটা জানেও প্রেমের নানান ছলাকলা। প্রতিরাতে নতুন নতুন গানের কথা অন্ধকার ভেদ করে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন সে গাইছে -

তুমি কোন পাহাড়ের তোতা গো?
অচিন দেশের সবুজ তোতা -
মান্দার গাছের আগায় বসেও তুমি ময়নাকে দেখতে পাওনা?
ময়নার মিঠে বুলি শুনেও কি তোমার অন্তর কাঁপে না?

এই যে টাক্কাল দিয়ে নরম হাতে তুলছি মৃত্তিঙ্গার বেত
তা দিয়ে পিঞ্জিরাই বানাব, আমি বেড়া দেবো না জুমের খেত।
জুমে বেড়া দিয়ে কি লাভ?
যদি বেড়া ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে যাওয়াই হয় তোমার স্বভাব
তোতা চাইলে এই বাঁশ দিয়ে আমি সুমুলও বানাতে পারি
যদি কেউ গান ধরে তার মিষ্টি সুরে কোন নাম না জানা পরি

কি নেই আমার সবই তো আছে শুয়োর, মুরগি, জুম
পায়ের পাতা শক্ত আছে, বুকে রঙিন খুম
এতো ডাকি তবু কথা কয় না কেন লাজুক তোতা?
তুমি কোন পাহাড়ের তোতা গো?
অচিন দেশের সবুজ তোতা

এমন জাদুকলিজা প্রায়শই করুণ সুরে ভেসে আসতো। কিন্তু আইচুকতি

কোন উত্তর দেয়নি। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রতিদিন এই নিয়ে হাসাহাসি করে, গালি দিয়ে প্রত্যুত্তর দেওয়ার কথা বলেছেন। তাতেও সে নির্লিপ্ত থেকেছে। ইচ্ছে করলে অপছন্দ ব্যক্তিকে দুচার কথা সে শুনিয়ে দিতে পারতো জাদুকলিজার সুরে। অন্তত ভাগ্যলক্ষ্মী তাই চেয়েছিলেন। বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটল না। আইচুকতি যেন নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে, আর তাকেই অবিরাম খুঁজে চলেছে সে। কদিন পরে বিনন্দ ও ভাগ্যলক্ষ্মীকে ছেড়ে সবাই আবার বাড়ি ফিরে এলো।

এভাবেই দিন কেটে যায়। লুঙ্গা জমিগুলিতে সবসময় জল লেগে থাকে। কখনো সখনো জল শুকিয়ে যায় বটে তবে মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে জমির বুক চিরে দিলেই জল বেরিয়ে আসে। বিনন্দ সবসময় বলে এখানকার জমিতে লক্ষ্মীর পা পড়েছিল। সেদিন ভোরবেলা বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে গেল। সূর্যের তেজ বাড়ার আগেই জমিতে ধানের চারা লাগাতে হবে। বিনন্দ ও তার ছেলে দুটি মিলে গতকাল বিকেলে ধানের হালি তুলে রেখেছে। আজ সেই ধানের চারা কাঁচা মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। বাড়ির সবাই খেতে নেমে গেল। আইচুকতিও মাথা গুঁজে কাজ করে যাচ্ছে। কাজ করতে করতে বেলা হয়ে গেল প্রায় দুপুর। তখন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হিন্দুস্তানীদের কাঠি নাচের একটা দল এই নতুন গ্রামে চলে এলো। খেতের মাঠ ছেড়ে ছেলে বুড়ো সবাই ছুটে চলে এলো বাড়িতে। আইচুকতি হাতে হালির গোছা নিয়ে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের নাচ দেখছিল। কি অপূর্ব এই নাচ ও গানের সুর। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কথায় জোড়া জোড়া ছেলেমেয়েরা আনন্দে, সুরের অনাবিল স্পর্শে উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। ধামসা, মাদলের সাথে একগুচ্ছ কাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দে সবাই যেন দুলে উঠল। কাঠি নাচের দলটি তাদের পাড়া থেকে ধীরে ধীরে আবার অন্যদিকে চলে যায়। আগে ঘন ঘন পাহাড়ে ওরা আসতো না, এখন মিশ্র বসতি হওয়ায় ওরা এদিকেও আসে। সারাদিন পরিশ্রম করলেও এক অদ্ভুত অনুভূতি হল আইচুকতির।

এই কাঠি নাচের দল এক নতুন দিনের সূচনা করে দিয়ে গেল যেন আইচুকতির জীবনে। সূর্যটা পশ্চিমাকাশে রঙ ছড়িয়ে ডুবে যাচ্ছে। পাখিরা সব ডানা ঝাপটে কিচিরমিচির করে ঘরে ফিরছে। আকাশে মেঘ করেছে, হয়তো বৃষ্টি আসবে। এক পশলা হিমেল হাওয়া আইচুকতির অন্তর ছুঁয়ে পালিয়ে গেল। আইচুকতির ভোঁতা অনুভূতিতে যা কিছু গতকালও অধরা ছিল তা যেন আজ ধরা দিতে লাগল। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন, পাখিদের কিচির মিচির শুনে আইচুকতি যেন আজ সন্ধ্যায় মোহিত হয়ে গেল। আঁধার নরম হাতে আইচুকতিকে ছুঁতেই সে যেন আজ শিওড়ে উঠল। বাতাসের দুষ্টুমিটা অন্যদিন অনুভব না করলেও আজ যেন ওকে ঘনঘন বিরক্ত করছিল। আইচুকতি বাইরের কাজ সেরে চলে এল ঘরে। চোখে তখনও ভাসছে সেই নাচ ও গানের মিঠা সুর। বাঁশের মাচানে শুয়ে সে নিজের আবেগকে আর চেপে রাখতে পারল না। কেন জানি না কখনো কখনো ফালতু কেঁদেও মানুষ আনন্দ পায়। মনের সুখে সে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদল।

অনেকদিন পর আজ আবার কাঁদল সে। আজ কান্নার মধ্যে অন্যদিনের মতো বিষাদ নেই। আইচুকতি যেন কিছুটা হাল্কা হয়ে গেল।

হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ ডাকল, 'আইচুক - আইচুক -।' কে ডাকছে তাকে - চুপিচুপি নিচু গলায়। লোকটা সোজা ঘরে চলে এল, 'কেমন আছিস তোরা আইচুক? তোর বাবা কোথায়?'

চমকে উঠল আইচুক এই কণ্ঠ যে তার খুবই চেনা। তার পরম প্রিয় দা-বুড়া। গলা থেকে 'দা' শব্দটা বেরিয়ে এলো অজান্তেই কিন্তু দা-বুড়া ওকে থামিয়ে দিলেন, 'চুপ। আস্তে কথা বল। তুই নাকি পার্টির কাজে ইদানীং যাস না?'

আইচুকতির ভেতরের সমস্ত কথা যেন এক সাথে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এইতো একটা জায়গা যেখানে সব দুঃখের কথা পরম নিশ্চিন্তে ঢেলে দেওয়া যায়। কিন্তু দা-বুড়া আবার বাধা দিলেন আইচুকতিকে।

'তোর কথা পরে শুনব হাতে সময় নেই। শোন আইচুক দুই বছর জেল খেটে মাসখানেক আগে বেরিয়েছি। এখন আছি আত্মগোপন করে। নইলে ওরা আবার আমাকে জেলে পুরবে। খোলা ময়দানে নেমে পার্টির কাজ করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। যাক বাকি কথা পরে হবে। আমি সময় বুঝে গোপনে আসব তখন সব কথা হবে। তবে আমার ফিরে আসার কথাটা কাউকে বলবি না। এমনকি বাড়িতেও না - না হয় আবার ঝামেলা হবে।'

কথাটা শেষ করেই তিনি যেমন গোপনে এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। কোন কথাই তার বলা হল না তাঁকে। আইচুকতি যেন নিজের চোখ কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। সমস্ত চাওয়া পাওয়াই যখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে তখন হঠাৎ দা-বুড়ার ফিরে আসা আইচুকতিকে নতুন আশার পথ দেখাল। তার ফিরে আসাটাই একটা বিশাল অনুপ্রেরণা। সমস্ত প্রতিকূলতাকে যিনি জয় করতে জানেন তিনিই তো দা-বুড়া। আইচুকতি বুঝতে পারল নিজেকে আর গুটিয়ে রাখতে পারবে না সে। পার্টির কাজে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায় কিভাবে দা-বুড়াকে পুলিশ পাকড়াও করেছিল সেটা তখন আর জানা হল না।

চার পাঁচদিন পর দা-বুড়া ফিরলেন আবার বাড়িতে। তিনি পরম স্নেহে আইচুকতির মাথায় হাত রেখে বললেন, 'কিরে তোর এই অবস্থা হয়েছে কেন? তোর শরীর স্বাস্থ্য কোথায় পালিয়ে গেল?' আইচুকতি কিছুই বলল না। চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল তার। 'কি চুপ করে রইলি যে? ছোট মাজন আসেনি আর?'

'না।'

'সেকি কদ্দিন হল তোর সাথে দেখা নেই তার?'

'তুমি চলে যাওয়ার পর একবার শুনেছি আমাকে খুঁজতে এসেছিল। কিন্তু আর আসেনি। আমাদের পুরোনো ভরতে এসেছিল কিনা আমি জানি না। তারপর আর কোন খবর পাইনি।'

'তুই যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলি?

'হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় খুঁজব তাকে আমি? আমি তার সন্ধান পাইনি।'

'ঠিক আছে ওসব নিয়ে তোকে আর ভাবতে হবে না আমি দেখছি। শোন্ হাতে আর সময় নেই। তুই আগামিকাল সকালে আগরতলা চলে যাবি।'

'আগরতলা?' চমকে উঠল আইচুকতি। 'কেন?'

'প্রশ্ন করতে নেই কমরেড। আমাদের নেতা কর্মীদের খুব ধরপাকড় চলছে চারদিকে। অন্যরা গেলে সমস্যা হতে পারে। আমি ভেবে দেখেছি তুই গেলেই কোন ঝামেলা হবে না। কোথায় যেতে হবে সময় মতো তোকে জানানো হবে। তুই এখন তৈরি হয়ে যা। মনে রাখিস আগামিকাল সকালে।'

সকলের অগোচরে আবার বেরিয়ে গেলেন তিনি বাড়ি থেকে। কিন্তু চিন্তায় পড়ে গেল আইচুকতি, দলের নির্দেশ মেনে ওকে যেতেই হবে। কিন্তু সে যাবে কি করে? প্রথমত আগরতলা সে কখনো যায়নি। শুধু আগরতলা কেন কোথাও কখনো যায়নি সে ভরত চৌধুরী ছেড়ে। তার জগৎ মানেই এই ভরত চৌধুরী পাড়া। কোনদিন গাড়িতে চড়েনি, কি করে গাড়িতে চড়তে হয়, কি করে বসতে হয় কিছুই তো সে জানে না। সে তো কেবল জানে দুর্গম পাহাড়ের আকাশ বাতাস, গাছপালা, অরণ্যের পশু পাখি। আরণ্যক স্নিগ্ধতা সরলতা ওর চেহারায়, শরীরে, মজ্জায় শেকড় গেড়ে আছে। যান্ত্রিক সভ্যতার মুখোমুখি হতে তার মন চাইছিল না। এদিকে আরও বড় সমস্যা হল পোশাক, যা কিছু আইচুকের ছিল সব সে দিয়ে দিয়েছে পিরিখাকে। একটাও ভাল কাপড় নেই যা পরে সে আগরতলায় যেতে পারে। তখনি তার মনে হল যে ভাগ্যলক্ষ্মী যে পাছড়াটা তাঁতে বুনছে সেটা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আইচুকতি মুহূর্ত দেরি না করে তাঁতে বসে গেল। কোমরে বেল্ট বেঁধে হাতে কাপড় বোনার কাঠের টুকরোটা নিয়ে ছপ্পাত ছপ্পাত করে বাঁশের মধ্যে গুটিয়ে রাখা সুতো ছড়িয়ে বুনতে বসে গেল।

পরদিন সকালে আইচুকতি পুরান বাজারে এসে গাড়ি ধরল। অচেনা ছেলেটা ভর সন্ধ্যায় বাড়িতে এসে যে নাম ঠিকানা তাকে দিয়ে গেল তা জপতে জপতে গাড়িতে চুপচাপ বসে রইল সে। ছেলেটা যে চকোলেট সাইজের পুঁটলিটা দিয়ে গেল সেটা ব্লাউজের ভেতর মিশে গেছে। তবে পুঁটলিটা গাছের পাতা দিয়ে বানানো। তাই আইচুকতির একটু অস্বস্তিও হচ্ছিল। কখন অসহ্য চুলকানি শুরু হয়ে যাবে আর সে বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু একটু পরেই আইচুকতি বুঝতে পারল না ঐ পাতার পুঁটলিটা কোন খারাপ কিছু নয়। ঐ পুঁটলির ভেতর কি আছে আইচুকতি জানে না। তবে আইচুকতি এটা জানে এটা খুলে দেখলেও সে বুঝবে না এতে কি সংকেত দেওয়া হয়েছে।

আগরতলা মোটরস্ট্যান্ড এসে নির্দেশ মতো একটা পরোটা তরকারির দোকানে ঢুকে গেল সে। দোকানে ঢুকেই এমন ভাবে চমকে উঠল আইচুকতি তার বুক ধুকপুক করে কাঁপতে লাগল। কম বয়সী মালিকটার পেছনে বাঁশের বেড়াতে টাঙানো রয়েছে ছোট মাজনের ছবি। আইচুকতি হাঁ করে কিছুক্ষণ সেদিকেই তাকিয়ে

রইল। তারপর অনেক কষ্ট করে নিজেকে সংবরণ করল সে। কৌতূহলটা বুকে চাপা রেখে দোকানের ভেতর চলে গেল। বুকের ভেতরের উথাল পাতাল ভাবটা শেষ হতেই আরও এক বিপদ। ভেতরে অনেক মানুষের সাথে দুজন লাঠিওয়ালা পুলিসও বসে চা খাচ্ছে। কি করি কি করি ভেবে আইচুকতি নীরবে বসে পরোটা তরকারি নিয়ে খেতে লাগল। পুলিস বাঁকা চোখে আইচুকতির দিকে দুবার তাকিয়ে চা খেয়ে সরে গেল। একটু পরেই মাঝ বয়সী লোকটা এলেন। আইচুকতির দিকে হেসে এগিয়ে এসে পাশে বসলেন। লোকটা হেসে বললেন, 'আইচুকতি কেমন আছ?' আইচুকতি বুঝতে পারল ইনিই সেই লোক যার কথা ছেলেটা বলেছিল। ফলে ফাঁকা পেয়ে পুঁটলিটা তার হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটা পরম মমতায় আবার বললেন, 'একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে কমরেড্ যেন বিপদ না আসে।' আইচুকতি কোন উত্তর না দিয়ে উঠে চলে গেল মালিক ছেলেটার কাছে। তাকে বলল, 'দাদা আপনার পেছনে এই ছবিটা কার?'

ছেলেটা বলল, 'কেন বলতো? সে আমার বন্ধু রঘু।' কথাটা বলেই আইচুকতির দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে রইল মালিক ছেলেটা। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি রঘুকে চেনো? আচ্ছা তোমার নাম কি গো?'

নামটা প্রায় বলেই ফেলেছিল আইচুকতি, হঠাৎ কি মনে করে বলল, 'এই লোকটা আমাদের এখানে ময়ালে যেতেন। আমি ওকে চিনি।'

মালিকটা লাফিয়ে উঠল, 'তোমার নাম আইচুকতি দেববর্মা নয়তো?'

একটু সময় ইতস্তত করে আইচুকতি বলল, 'না না। তবে আমি এই মেয়েটাকে চিনি। কেন বলুন তো?'

'কোথায় থাকে সে এখন?'

'কেন ভরত চৌধুরী পাড়া।'

'এই এক জ্বালা তোমাদের ভরত চৌধুরী পাড়া তো হাঁটতে পারে। সে কখন কোথায় চলে যায় কে জানে।'

মালিকটার কথা বলার ধরন দেখে আইচুকতি হেসে ফেলল। হেসে বলল, 'এখন কুলাই দিয়ে নয় খোয়াই দিয়ে যেতে হবে আমাদের মহল্লায়।'

'তাই নাকি! আমরা তিনবার গিয়ে খুঁজেছি কিন্তু কিছুতেই পাইনি। তুমি দয়া করে একটু বসবে আমি এক্ষুণি আসছি।'

'কোথায় যাবেন আপনি?'

'গুরু কলেজের ফাইনাল ইয়ারে পড়ে, এই তো কয়েক মাস পরেই গুরুর পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। খুব ভাল রেজাল্ট করেছে সে পরীক্ষায়। তুমি একটু দাঁড়াবে ওকে ডেকে নিয়ে আসি। সে তো ভাল করে চিনে রাখতে পারবে তোমাদের গ্রামটা। আসলে আমাকে নিয়ে তিনবার রঘু ঐ গ্রামে গেছে ঐ মেয়েটাকে খুঁজতে। কিন্তু তোমাদের এই গ্রামটা কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কেউ বলতে পারল না। তুমি একটু বসো আমি যাব আর আসব।'

মালিকটা দ্রুত চলে যেতেই আইচুকতি দোকান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যে কাঙ্ক্ষিত মানুষটার সাথে দেখা হওয়ার জন্য এতোদিন পাগলের মতো আইচুকতি অপেক্ষা করছিল তাকে আজ এতো কাছে পেয়েও তার সামনে যাওয়ার সাহস পেল না। ছোট মাজন এখন কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পড়ে অথচ আইচুক পড়াশোনাটা মাঝ পথে শেষ করে দিল। ছোট মাজনের সামনে দাঁড়ানোর কোন যোগ্যতাই তার নেই। নিজের প্রতি এতো অযত্ন, এতো অত্যাচার করেছে আইচুকতি তার রূপ লাবণ্য কোথায় যেন হারিয়ে গেছে? মানুষকে সম্মোহিত করার ঈর্ষণীয় তার শরীরের ভাষা আজ অস্তমিত। কি নিয়ে দাঁড়াবে আজ রঘুর সামনে? আইচুকতি যেন পালিয়ে বাঁচল। প্রতাপ নামের লোকটা কোন ফাঁকে পুঁটুলিটা নিয়ে চলে গেছেন সে বুঝতেই পারল না।

চায়ের দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে রাজপথে হাঁটতে লাগল আইচুকতি। একটু সামনে এগিয়ে ডানদিকে এগুলেই জ্যাক্সন গেট্। তার পরেই পিরিখাদের হোস্টেল। হোস্টেলে পৌঁছে আইচুকতি যেন বেঁচে গেল। পিরিখার রুমে আরো দুজন মেয়ে থাকে। তারা আইচুকতিকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ পেল। একটি রাত আইচুকতি থাকবে তাদের সাথে। সেটাই বা কম কিসে? একটা রাত ওরা একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবে। মেয়েগুলি এতো হৈ হুল্লোড় শুরু করে দিল আইচুকতি তার নিজের কথা ভাবতেই পারল না। পিরিখা ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বাই, তোর চেহারায় আজ মিটমিট করে তারারা জ্বলছে? কিরে ছোট মাজনের কোন খবর পেলি?

'হ্যাঁ।' ছোট্ট সলজ্জ উত্তর দিল আইচুকতি।

'কোথায় থাকে রে তোর বাঁদরটা?'

'আগরতলাতেই আছে। কলেজে পড়ছে - ফাইনাল ইয়ার।'

'তোর সাথে দেখা হয়েছে?'

'না'।

'এতো নিস্পৃহের মতো উত্তর দিচ্ছিস কেন বাই? তিন চার বছর ধরে দিন রাত তার কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে শেষ করে দিলি। আর আজ ওকে পেয়েও তোর কোন উৎসাহ নেই?'

আইচুকতি মুচকি হাসল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ছোট মাজন তিন তিন বার ওকে খুঁজতে গেছে পাহাড়ে কথাটা ভেবে সে যেন কেমন রোমাঞ্চিত হল। আইচুকতি ছোট মাজনের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন আনমনা হয়ে গেল। পিরিখা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে অথচ আইচুকতির কোন সাড়া নেই। চেঁচিয়ে উঠে পিরিখা, 'আবার কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিস বাই?'

'অ্যাঁ!' বলে চমক ভাঙল আইচুকতির।

'তুই আর পাগলামি করিস না বাই, চল খোঁজ খবর নিয়ে সোজা ছোট মাজনের বাড়িতে চলে যাই।'

'না পিরিখা।' বাধা দিল আইচুকতি।

'কেন বাই, তোর বর তুই যাবি না?'

'ওর পড়াশোনার ক্ষতি হবে। এইতো আর কটা দিন তারপর ওর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যাবে। তারপর আমি - না - না সে আসবে আমার কাছে।'

'আর যদি সে না আসে? কি করবি?'

'জানি না।'

'শোন নিজের অধিকার নিজেকেই ছিনিয়ে নিতে হয়। পাহাড়ে গিয়ে মজা করতে পেরেছে, আর এখন খবরও নিতে সময় পাচ্ছে না। ওসব আদিখ্যেতা আমার পছন্দ হয় না বাই।'

পিরিখা এতো ঝরঝর করে কথা বলতে লাগল আইচুকতি কোন উত্তর দিতে পারল না। পিরিখা যেন এই কদিনে অনেকটা বদলে গেছে। পাহাড়ের ছোট্ট মেয়েটা আর সে নয়, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে কথা বলে। আইচুকতি ওকে আঘাত না দিয়ে হেসে বলল, 'ছিঃ পিরিখা, কাউকে না জেনে এভাবে বলতে নেই।'

'আর বলিস না বাঙালি ছেলেগুলিকে দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়। এমনভাবে তাকিয়ে থাকে মনে হয় গিলে খেয়ে নেবে।'

'তাই বুঝি। আর পাহাড়ি ছেলেরা?'

'অনেক ভাল। ওরা অনেক লাজুক।'

'পড়াশোনা করছিস তো না ছেলেদের রকম সকম নিয়েই সারাদিন চর্চা করিস?'

পিরিখা কথা ঘুরিয়ে বলল, 'তবে তোর ছোট মাজন যতই পালিয়ে বেড়াক বাই আমি ওকে ঠিক খুঁজে বের করব।'

'সে আমাকে খুঁজছে পিরিখা। তিন চারবার ঘন্টাছড়া ওর এক বন্ধুকে নিয়ে গেছে আমাকে খুঁজতে। কিন্তু পায়নি।'

হাল্কা একটা ধাক্কা খেল পিরিখা, 'বলিস কিরে? সত্যি?'

'হ্যাঁ ঐ মালিক ছেলেটা বলল তো।'

'ছেলেটা কে বাই?'

'ওর বন্ধু।'

পিরিখা চুপ মেরে গেল। আয়নাতে চোখে কাজল টেনে ওর মুখের মেক-আপটা ঠিক করে নিচ্ছিল। আইচুকতি বলল, 'আমি ওর সাথে আর দেখা করব না পিরিখা।'

'কেন?'

'ছোট মাজন পাহাড়ে যে আইচুকতিকে দেখেছিল সেই আইচুকতি মরে গেছে। তাকে আর খুঁজে পাবে না সে। তার ছায়াকে দেখে যদি সে আমাকে অস্বীকার করে। এই অপমান আমি সইতে পারব না পিরিখা।'

'কি পাগলের মতো বকছিস তুই বাই? তুই তো আগের মতোই আছিস। এই শহরের ছোড়াগুলো তোকে দেখলে ওদের চোখ ফেটে যাবে।'

'শহরের ছেলেদের কথা আমি বলছি না পিরিখা। আমি ছোট মাজনের কথা বলছি। আমার কেন যেন মনে হয় আমি ওর তুলনায় বড়ই বেমানান - অর্ধশিক্ষিত, অযোগ্য। ছোট মাজন পাহাড়ের আইচুকতিকে এখন আর খুঁজে পাবে না। আমাকে তার যোগ্য হতে হবে।'

'কি জানি বাপু আমি জানি না। তবে তোকে দেখে একটা শিক্ষা হয়েছে বাই। আর যা করি না করি জীবনে কখনো প্রেম করবো না।'

'আচ্ছা প্রেম কি শুধু বিয়েতেই পূর্ণতা পায়?

'তোর কথাটা আমার মাথায় ঢুকেনি বাই।'

'ঐ যে রাইমা সরমার প্রেম কাহিনি কি অমর নয়?' পিরিখার রুম পার্টনাররা সব হুড়মুড় করে চলে এল। দেয়াল ঘড়িতে রাত আটটা বাজে। আইচুকতি উঠে দাঁড়াল। 'পিরিখা আমি একটু বাইরে যাব?'

'আটটা বেজে গেছে বাই?' সলজ্জ হাসল আইচুকতি। পিরিখা তখনও বলে যাচ্ছে, 'বাই এখন তারা দেখতে যাবে।'

সবাই রহস্য গল্পের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল, 'তারা' কেন?'

'এখন নীরবে দুটি তারার দিকে এক মনে দশ মিনিট তাকিয়ে থাকবে বাই। কেন জানিস?'

'কেন?'

আইচুকতি বারবার বাধা দিয়েও পিরিখাকে আটকাতে পারেনি। পিরিখা বলতে লাগল, 'বাই'র বরও এখন এই দুটি তারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। ওরা যখন পরস্পরকে ছেড়ে দুরে চলে যায় তখন রাত ঠিক আটটায় আকাশের ঐ তারা দুটিকে দশ মিনিট ধরে দেখে পরস্পরকে নিয়ে ভাবে।'

একটা মেয়ে অবাক হয়ে বলল, 'বাঃ কি গভীর প্রেম!'

অন্য মেয়েটা তাড়া দিল, 'দিদি কোন্ তারা দুটি আমাদের দেখাও না। দেখাও না- দেখাও প্লীজ।'

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিতেই জানালা দিয়ে আকাশটা যেন আইচুকতির সামনে চলে এল। আইচুকতি পাশাপাশি দুটি উজ্জ্বল তারাকে দেখিয়ে বলল, 'এই দুটি।'

'বাঃ কি সুন্দর। তুমি কোনটা দিদি?'

'পিরিখা হেসে বলল ঐ যে বা দিকেরটা।

'তার মানে ঠিক এই মুহূর্তে তোমরা দুজনেই জান তোমাদের দৃষ্টিটা একই জায়গায় আটকে আছে।'

আর কেউ কোন কথা বলল না। সবাই অবাক হয়ে তারা দুটির দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে রইল।

পরদিন খুব সকালবেলা গাড়ি ধরতে মোটরস্ট্যান্ড চলে এল আইচুকতি। মোটরস্ট্যান্ডে এসে সেই চায়ের দোকানটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। ছোট মাজন দাঁড়িয়ে আছে সেই দোকানটার সামনে। নিশ্চয় তাকে খুঁজতেই এসেছে সে। হঠাৎ ভয়ে লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে গেল আইচুকতি। সে চকিতে নিজেকে আড়াল করে নিল। কেন সে এতো ভয় পেল সে নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর পেল না। সে ছোট মাজনকে এতো ভালবাসে, নিজের বর হিসেবে সেই দিন থেকেই তাকে মেনে নিয়েছে। তারপরও এতো লজ্জা কেন? এতো কাছে ছোট মাজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে নিশ্চয় ওকে জিজ্ঞেস করতে পারে এতদিন আমাকে ভুলে ছিলে কি করে? ভালবাসার টান যদি এতোই তীব্র হোত তাহলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যেখানেই আমি থাকি না কেন তোমার খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল। দেখো তোমার বিরহে কতো বিবর্ণ, মলিন হয়ে গেছি । তুমিও কতো ম্লান হয়ে গেছো এই চার বছরে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু বলতে পারল না আইচুকতি। নিজেকে আড়াল করে রাখাটাই যেন সে নিরাপদ মনে করল। মনটা বারবার ওর ছুটে যেতে চাইছে ছোট মাজনের কাছে, তাকে আরও একবার দেখার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু বাস্তবে সে পারল না, বেমালুম হেরে গেল। আইচুকতির বারবার মনে হতে লাগল আপাত দৃষ্টিতে ম্লান, নুয়ে পড়া ছোট মাজন একদিন এতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সেদিন নিজেকে আইচুকতির বড্ড দীনহীন নিস্প্রভ মনে হবে। আইচুকতি তার ছোট মাজনের কাছে ছুটে যেতে পারল না। কোন রকমে পালিয়ে গাড়িতে উঠেই তার মনে হল যেন সে মহাবিপদ থেকে জোর বাঁচা বেঁচে গেল। কিন্তু সেই যে চোখের জল তার স্রোতের মতো বইতে লাগল তা আর থামল না।

বাড়িতে ফিরে দা-বুড়াকে দেখে খুশি হল আইচুকতি। তাকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গেল সে। দা-বুড়া আইচুকতির চোখ মুখ ফোলা দেখে ঘাবড়ে গেলেন।

'কি রে আইচুক কি হয়েছে তোর?'

আইচুকতি এবার হাসল, 'ছোট মাজনকে পেয়েছিলাম দা-বুড়া। মোটরষ্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল, দূর থেকে ওকে আমি দেখেছি।'

'সে কি! ওর সাথে কথা হয়নি তোর?'

'না।'

'কেন? ও কি তোকে চিনতে পারেনি?'

'সে আমার জন্য মনে হয় সারারাত ধরে জেগে অপেক্ষা করেছে। সে এখনও পাগলের মতোই আমাকে ভালোবাসে, সেটা ওকে দেখেই আমি বুঝেছি। সে আমার জন্য খুব কষ্ট পাচ্ছে দা-বুড়া।'

'তাহলে তুই ওর সাথে দেখা করে কথা বললি না কেন? এটা একদম ঠিক হয়নি আইচুক। ওর সাথে তোর দেখা করা উচিত ছিল।'

এবার চুপ মেরে গেল আইচুকতি। তারপর আদ্যোপান্ত সব কিছুই খুলে

বলল সে দা-বুড়াকে। তিনি সবকিছু শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আইচুকতির মনোভাব বুঝতে পারলেন। তার মনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা কি করে পূরণ করা যায় তাই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তিনি আইচুকতিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই এখন কি চাস বোন?'

'আমি ওর যোগ্য হতে চাই দা-বুড়া।'

'তার মানে আবার পড়াশোনা করতে চাস তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো অনেকদিন সময় লেগে যাবে, প্রায় পাঁচ ছ বছর সময় লাগবে তোর। তারপর যদি তোকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে তোকে ভুলে যায় ছোট মাজন? তখন যোগ্য হয়ে ফিরে এলেও তুই তো নিঃস্ব হয়ে যাবি।'

'ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই আমার। তুমি দুরে কোথাও আমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দাও যেন ছোট মাজন আমাকে খুঁজে না পায়।'

'তাহলে তুই বুলঙবাসা চলে যা। ওখানে তোর এক কাকা আছে। টাকা পয়সার ঝামেলা নেই। তোকে কেউ কোনদিন আর খুঁজেও পাবে না সেখানে।'

'কিন্তু বুলঙবাসাতে পড়াশোনার পরিবেশ কোথায়?'

'তাহলে শিলচার যাবি?'

'শিলচার! হ্যাঁ যাব।'

'ঠিক আছে আমি তাহলে ব্যবস্থা করতে পারি। ওখানেও আমার বোন আছে। তা হ্যাঁরে পরে কিন্তু আমাকে দায়ি করিস না।'

'না করব না। তবে তুমি কাউকেই বলতে পারবে না আমি কোথায় গেছি। এলাকার সব লোক যেন-জানে আমি কোথাও হারিয়ে গেছি।'

'তুই পালাতে চাইছিস কেন?'

'আমি কোথায় আছি জানলে ছোট মাজন আমার কাছে সোজা চলে যাবে। সে একবার আমার কাছে ফিরে এলে আমার আর লক্ষ্যপূরণ হবে না।'

'বুড়ো বয়েসে এই কঠিন শাস্তিটা তুই আমাকেই দিবি আইচুক?'

'শাস্তিটাতো এখানেই শেষ নয় দা-বুড়া। এই কয়টি বছরের পড়াশোনার খরচটাও তোমাকেই দিতে হবে। যদিও আমি খুব চেষ্টা করব নিজে কিছু করতে। কোন কাজ পেয়ে গেলে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'বেশ তাই হবে। যদি বেঁচে থাকি, পুলিসের জালে ধরা না পড়ে যাই, তাহলে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে।'

রঘু প্রায় পনের দিন যাবৎ প্রতিদিন সকাল বিকেল মোটরস্ট্যান্ড দাঁড়িয়ে থেকে সেই মেয়েটাকে খুঁজেছে যে আইচুকতিকে চেনে, যে মেয়েটার বাড়ি ভরত চৌধুরী পাড়ায়। সারাক্ষণ খোকা এবং বরুণও তার পাশে ছিল। তাদেরও কৌতূহল ছিল পুনরায় আইচুকতিকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তার একটা সূত্র পাওয়া। রঘুর

কাছ থেকে যা গল্প শুনেছে তা থেকে তাদের আগ্রহটা আরও বেড়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই মেয়েটাও যেন আইচুকতির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সেদিন খোকার দোকানে বসে এই বিষয়ে আলোচনা চলাকালীন প্রতাপ দত্ত এসে পাশে বসলেন। লোকটা একনিষ্ঠ পার্টি কর্মী। ধুতি ফতুয়া খালি পায়ের লোকটা অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। রিক্সা চালানোর সময় থেকে রঘুদের সাথে ওর ঘনিষ্ঠতা। প্রতাপবাবু কখনোই কাউকে পার্টিতে আসার পরামর্শ দেন না। তিনি শুধু মানুষের সাথে মিশে যান। মানুষকে নির্লোভ, সংবেদনশীল ও সমাজের বন্ধু হয়ে সঠিক পথে চলার পরামর্শ দেন। লোকটার মধ্যে এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে লোককে সম্মোহিত করার। তিনি এসে পাশে বসতেই খোকা ডাকল তার ছেলেদের চা দেওয়ার জন্য। প্রতাপবাবু তাদের আলোচনার মাঝখানে বললেন, 'যৌবন যখন এসেছে সঙ্গিনী তো খুঁজবেই। কিন্তু কাকে খোঁজছ ভাইরা আমরাও তো শুনি?'

খোকা হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'আমার মনে পড়েছে রঘু, সেদিন প্রতাপদাও ছিলেন। আচ্ছা প্রতাপদা, সেদিন আপনি যখন ছিলেন তখন দোকানে একটা পাহাড়ি মেয়ে এসেছিল না? মনে করে দেখুন প্রায় দুসপ্তাহ আগে, দুপুরবেলা। ওরা কেউ আমাকে বিশ্বাসই করছে না।'

'হ্যাঁ এসেছিল তো।'

সমর্থন পেয়ে খোকা আরো চটে গেল। 'তোরা তো আমাকে পাগল ছাগল যা কিছু বলছিলি, এখন শোন্ প্রতাপদা কি বলছেন। তিনি তো মিথ্যে বলবেন না। তাছাড়া এই মেয়েটা আমাকে স্পষ্ট বলেছে সে আইচুকতি দেববর্মাকে চেনে।'

'কি! ওই মেয়েটা বলেছে সে আইচুকতি দেববর্মাকে চেনে?' প্রতাপবাবু ভয়নাক জোরে হাসতে লাগলেন।

রঘু ওকে থামানোর চেষ্টা করে বলল, 'কি ব্যাপার প্রতাপদা, হাসছেন কেন?'

বরুণ বলল, 'দয়া করে কেন হাসছেন বলুন? আমাদের তো প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।'

প্রতাপবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'সে তোমাকে বলেছে সে আইচুকতিকে চেনে? সে তোমাদের মস্ত ফাঁকি দিয়েছে ভায়া। কারণ সেই তো আইচুকতি দেববর্মা। সে আমার কাছেই এসেছিল।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কয়েক মুহূর্ত আর কেউ কথা বলতে পারল না। প্রতাপবাবু নীরবতা ভেঙে বললেন, 'আইচুকতির সাথে কার প্রণয়ের সম্পর্ক?' কেউ কোন উত্তর দিল না। তিনি আবার বললেন, 'রঘুরই হবে, কারণ তুমিই তো ভরত চৌধুরী পাড়ায় গিয়েছিলে, আমাকে বলেছিলে। তবে সত্যিই ভায়া তোমার আইচুকতিকে দেখে আমিও চমকে উঠেছি ও যে সত্যিই পাহাড়ি ফুল। এই বুড়ো বয়েসেও মনে রঙ ধরে যায়।'

কথা শুনে বরুণ হাসল। কারণ যে লোকের মনে আজও কেউ রঙ ধরাতে

পারেনি তার মনও টলেছে বুড়ো বয়েসে আইচুকতিকে দেখে? রঘু জিজ্ঞেস করল, 'আইচুকতিকে আপনি কি করে চেনেন?'

'উই আর ইন দ্য সেম্ বোট ব্রাদার। বাকিটা তোমাকে বলা যাবে না।'

'আগে থেকেই আপনি ওকে জানতেন?'

'মোটেই না। বরং আমি আগে ওকে যেমন জানতাম না, সেও আমাকে জানত না। এখন আমি ওকে জেনেছি বটে কিন্তু সে এখনও আমাকে জানে না।'

'আপনি তাহলে কি করে জানলেন যে সেই আইচুকতি?'

'যে ওকে পাঠিয়েছিল সেই তো লিখে দিয়েছেন, পত্রবাহক আইচুকতিকে পাঠালাম।'

রঘু এমনিতেই চাপা স্বভাবের ছেলে। তবু এতক্ষণ তার চেহারায় একটা খুশির আলো ছিল। হঠাৎ তা দপ্ করে নিভে গেল। ভেতরের সমস্ত হাওয়া নীরবে যেন চুপসে বেরিয়ে গেল। আইচুকতি নিজের পরিচয়টা গোপন করল কেন? খোকা চিনে ফেলবে বলে? খোকা তো স্পষ্ট বলেছিল যে সে রঘুকে খবর দিতে যাচ্ছে, তাহলে সে চলে গেল কেন? খোকার দোকানে রঘুর ছবিটা দেখে আইচুকতি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল যে এই দোকানের সাথে রঘুর একটা সম্পর্ক আছে। তাহলে নিজেই রঘুর খবর নিয়ে সে ওর কাছে চলে যেতে পারত। কেন নিজেকে আড়াল করে আবার হারিয়ে গেল আইচুকতি? কি এমন ঘটেছে যে আইচুকতি নিজেকে লুকিয়ে রেখেই আনন্দ পাচ্ছে। একি শুধুই অভিমান? নাকি রঘুর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নতুন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে আইচুকতির দরজায়।

বরুণের ডাকে রঘু ফিরে তাকাল। 'কিরে, তুই আবার আনমনা হয়ে কি ভাবছিস?'

রঘু জিজ্ঞেস করল, 'প্রতাপদা আইচুক এখানে কেন এসেছিল?'

'বলব না।'

'আপনি আগে থেকে ওকে চিনতেন না বলছেন?'

'না রে বাবা মোটেই না। আমরা পরস্পরকে এই প্রথম দেখলাম।'

'খোয়াইয়ের কোন জায়গায় ওদের বাড়ি আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ জানি। তুমি কি যাবে ওখানে? তাহলে চলে যাও আমি চিঠি দিয়ে দেব। ওখানে গেলে একটা ব্যবস্থা তোমার ঠিক হয়ে যাবে।'

রঘু কি যেন ভাবতে লাগল। এদিকে বরুণ ও খোকা সবকিছু ভুলে প্রতাপবাবুর হোমিওপ্যাথি অষুধের বাক্স দেখে মাথা ধরা, পেটে ব্যথার বাহানা করতে লাগল। প্রতাপবাবুও সাদাশয় লোক। রোগের লক্ষণ শুনে অষুধ বিলোতে লাগলেন। এই একটা ভান্ডার যেখান থেকে কোন কিছু পেতে পয়সা লাগে না।

১২

চিকিৎসায় ভাল সাড়া দিয়েছে রমলা। ইদানীং পাগলী শব্দটা তার নামের পাশে প্রায় উচ্চারিত হয়ই না। রীতিমতো দায়িত্ব নিয়ে তিনটে ছেলের সংসার সে একাই চালাচ্ছে। তিনটে ছেলের তিন রকমের মর্জি, খাবারের ফর্দ, কাপড় কাচা, বিছানা, বই পত্তর, জামা কাপড় গুছিয়ে রাখা। সে অনেক কাজ। বিশেষ করে খোকা যখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে এই বাড়িতে চলে এল সেদিন থেকে ওর সমস্যা হয়েছে বেশি। কারণ খোকার সাথে তার পরোটা তরকারির দোকানেও এখন রমলাকে যেতে হয়। নতুন লোকেরা অনেকেই ভাবে এই মহিলা বোধ হয় খোকার স্ত্রী।

রঘু ছাড়া বাকিরা হোটেলের কাজটা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু রঘু ছাড়েনি বরং সময় পেলে হোটেলের কাজে আরও বেশি সময় দেবার চেষ্টা করছে। খোকার কোন উপায় ছিল না, রঘুর সাথে পরামর্শ করেই সে এই দোকানটা শুরু করেছে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে। দোকানে রঘুরও একটা শেয়ার আছে। দোকান চালু হওয়ার পর থেকে দোকানের উন্নতি হয়েছে ভাবনার চাইতেও অনেক বেশি। এখন মোটরস্ট্যান্ড অনেক জমজমাট। ফলে খোকার বিক্রিবাটা এতো বেড়েছে সে আর একদম সময় পায় না। রমলার অবশ্য কোন বিষয়ে কোন ভাবনা নেই। যে কোন কাজ করতে বললেই সে করছে। একটু পর পরই রঘু ওরা ওকে ডাকছে, 'দিদি চা খাব।' কিন্তু রমলার কোন ক্লান্তি নেই। সে সকাল সন্ধ্যা শুধু খেটে যাচ্ছে। তবে এই এক দেড় বছরে রমলার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আবর্জনা সদৃশ মেয়েটা এখন আর পাঁচটা মেয়ের মতোই দেখতে। অন্য মেয়েদের মতোই সুন্দর পোশাক সাজসজ্জা সে ভালবাসে। বাড়ির সব মহিলাদের সাথে মিলেমিশে সে আদব কায়দা এখন রপ্ত করে ফেলেছে। এখন রমলাকে উন্মাদ বলে কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

রঘুরা রমলার জীবনের নেপথ্য কাহিনি জানার যে আগ্রহ এতদিন দেখিয়েছিল তা আজ হারিয়ে ফেলেছে। রমলা তার অতীতের কিছুই মনে করতে পারে না। বহু সময় বাড়ির সবাই মিলে নানা রকমের চেষ্টা করেছে। কিন্তু রমলা তার অতীত সম্বন্ধে একদম নীরব। অনেক সময় সন্দেহ হয়েছে যে রমলা সম্ভবত এখন সব বুঝতে পারে, বলতে পারে, তবু ইচ্ছে করেই কিছু বলে না। হয়তো তার অতীতটা খুবই নোংরা কলঙ্কিত তাই সে সবকিছু ভুলে থাকতে চায়। অথবা ওর অতীত থাকলেও সে ওখানে আর ফিরে যেতে চায় না। এখানে দুবছর ধরে

তো সুখেই আছে, তাহলে আর ফিরে যাবে কেন? এখানে ধীরে ধীরে নিশ্চিত কোন ঠিকানা হয়ে যাবে তারও। যদিও রঘু অন্যদের সাথে একমত হতে পারেনি কখনোই। রঘুর প্রথম দিন থেকেই রমলাকে একটা বনেদি ঘরের মেয়ে বা বউ মনে হয়েছে। তার কিছু লক্ষণ ও গুণ রমলার মধ্যে সব সময় পাওয়া যায়। তাছাড়া রমলা কথা খুব কম বলে। প্রশ্ন করলে উত্তর খুবই সংক্ষেপে শেষ করে নেয়। কখনোই খুলে কথা বলে না। সারাক্ষণ চলাফেরা ও কথাবার্তায় সংযত আচরণ করে। রঘু এখনও রমলাকে সুস্থ মনে করে না। কারণ সে স্বাভাবিকের মতো চলাফেরা করলেও মাঝেমাঝেই মনে হয় কোথাও যেন একটু গোলমাল আছে। ফলে অন্যরা যতই সন্দেহ করুক, মাঝে মাঝে বিরূপ মন্তব্য করুক, রঘু কিন্তু কোনদিন তাকে আঘাত দেয়নি।

এদিকে রমলাও রঘুর প্রতিই একটু বেশি দুর্বল। তার সময়ের বেশির ভাগ সময় যদিও খোকার সাথে কাটে। তবু সময় পেলেই রঘুর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। হয়তো রঘু পড়ছে, পাশে বরুণও, রমলা তীব্র গরমে হাত পাখাটা নিয়ে রঘুর পাশে বসে বাতাস করতে শুরু করবে। যদি কিছু খাবার তৈরি করে, খাবারের বাটিটা সবসময় প্রথম রঘুর সামনেই এনে ধরবে। ভাত খেতে বসলে ভাল যা কিছু হবে সে মাছের টুকরোই হোক বা ভাজা বড়া সবসময় রঘুকে ভালটা দিয়ে অন্যদের পাতে পড়বে।

সেদিন রঘু বিছানায় শুয়ে পড়ছে। রমলা একটা ক্ষুর নিয়ে এলো রঘুর পায়ের নখ কাটতে। এক সপ্তাহ পরে রঘুর ফাইনাল পরীক্ষা ফলে সে একদম সময় পাচ্ছে না। কিন্তু রমলার এটা নজর এড়াল না। সে রঘুর পায়ের নখগুলি বড় হয়েছে দেখতে পেয়েই কাটতে বসে গেল। কিন্তু পায়ে হাত পড়তেই রঘু লাফিয়ে উঠল।

'এই – এই দিদি, কি করছ?'

'নখ কাটছি।' ছোট্ট উত্তর রমলার।

'এই পায়ে ধরবে না আমার কাতুকুতু লাগে। আমি নিজেই কেটে নেব।'

কিন্তু রঘুর কথা রমলা শুনবে কেন? সে রঘুর পা-টা নিজের কাছে টেনে সযত্নে নখগুলি কাটতে লাগল। রঘু উশখুশ করলেও নিরুপায় হয়ে এই ভালবাসার অত্যাচার সওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। রমলা আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে কি করবে রঘু?'

'একটা চাকরির চেষ্টা করব।'

'কি চাকরি করবে?'

'যা পাই।'

'এখানে থাকবে না দূরে কোথাও চলে যাবে?'

'সে আমি কি করে বলব বল। এখানেই পোস্টিং হতে পারে অথবা দূরে কোথাও।'

'তুমি দুরে চলে গেলে আমাকে নিয়ে যাবে তো?'

প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেল রঘু। এই ভাবনাটা তার মাথাতেই আসেনি। রঘু চাকরি পেয়ে দুরে কোথাও চলে গেলে রমলার কি হবে? ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে মানুষ কি বলবে, এই সমাজ কি বলবে? না না তা কি করে হয় যদি আইচুকতি এই কথাটা শুনে তাহলে ভয়ানক রাগ করবে। আর রমলাকে না নিয়ে গেলে ওর মনে আঘাত লাগতে পারে। এই যে সুস্থ হওয়ার দিকে সে ক্রমশ এগোচ্ছে তার ক্ষতি হতে পারে। রঘু অনেক ভেবে চিন্তে বলল, 'তুমি এসব নিয়ে ভাবছ কেন বলতো? আমি আগরতলা ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি এখানেই থাকব, আমরা একসাথেই থাকব।

রমলা বিড়বিড় করে কি যেন বলল। তারপর রঘুকে বলল, 'কালরাত স্বপ্নে দেখেছি আমার ছেলেটাকে।'

রঘু চমকে কৌতূহলী হয়ে উঠল। 'কি বললে দিদি?'

'আমাদের বাড়ির উঠোনে আমার ছেলেটা আমার দিকে ছুটে আসছে। সে খিল খিল করে হাসছে। আমাকে চিৎকার করে ডাকছে।'

'কেন ডাকছে?' না আর আর কোন কথা বলল না রমলা, চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

বরুণ এসে ঢুকল ঘরে। বরুণ বাড়ি থেকে ফিরেছে। বাড়ি থেকে চাল, সবজি, মুড়ি কত কিছু নিয়ে ফিরেছে সে। খুশি হয়ে রঘুকে সে দেখাচ্ছিল সবকিছু। কিন্তু উদাস রঘুকে সে কিছুতেই উৎসাহিত করতে পারছিল না। ব্যাপারটা খেয়াল করে সে বলল, 'কি রে, তুই ওরকম হাদার মতো মুখ করে বসে রয়েছিস যে? কি হয়েছে তোর?'

'না কিছু না।'

'কিছু একটা আছে তো বটেই। বল কি হয়েছে?'

বরুণকে এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল তাই রঘু প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বলল, 'না আইচুকের কথা ভাবছিলাম।'

রমলা ফাঁকে চা নিয়ে ঢুকল। বরুণ হেসে বলল, 'ঠিক আছে বাবা, প্রতাপদার থেকে ঠিকানা নিয়ে আমরা ঠিক পৌঁছে যাব পরীক্ষার পর।'

'না বরুণ, আমার বোধ হয় তার আগেই একবার যাওয়া দরকার। আইচুকতি আমাকে ভুল বুঝতে পারে।'

'দেখ রঘু - পরীক্ষার আগে তোকে আমি কিছুতেই ওখানে যেতে দেব না। বারবার তোর জীবনটা ছোট ছোট ভুলে, দুর্ভাগ্যে নষ্ট হয়েছে। এমনিতেই আমরা দুজনেই তিনটে বছর পিছিয়ে গেছি। না হলে আজ আমরাও সরকারি চাকরি করতাম। এতো ভাল রেজাল্ট করেছিস তুই। আর এক মাস বাকি ফাইনাল পরীক্ষার। এখন কোন ঝুঁকি আমি তোকে নিতে দেব না।'

রঘু তখনও ভাবতে লাগল অরণ্য যেন তাকে ঊর্ধবাহু তুলে প্রাণপণে ডাকছে,

'ফিরে এসো – ফিরে এসো রঘু।'

বরুণ বলল, 'শোন রঘু একটা মজার ঘটনা হয়েছে। আজ সকালে আমার বাবা আমার হাতে একশ টাকা গুঁজে দিয়েছেন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এতো টাকা তোমরা কোথায় পেলে? বাবা বললেন, জমি বিক্রি করে দিয়েছি। এতোদিন তো তোকে একটা পয়সাও দিতে পারিনি। তোর মা বলল মাস দুয়েকের মধ্যে তোর কলেজ শেষ হয়ে যাবে তাই।'

বরুণ নিজেই একা একা হাসতে লাগল। 'বাবার বুদ্ধিটা দেখলি। তিনটে বছর একটা পয়সা ছেলেকে দেয়নি ছেলে নষ্ট করবে ভেবে। আর আজ আমার পড়া যখন শেষ তখন অন্যদের কাছ থেকে শুনে হয়তো বাবা বুঝতে পেরেছেন যে ছেলে সম্ভবত ভাল কিছু করছে। তাই এক কানি ধানি জমি বিক্রি করে দিল। এই রঘু আমি খোকাকে নিয়ে বাজারে যাব মাংস আনব। তুই তো রাতে ভাত খাসনা আজকে কিন্তু খেতে হবে।'

বরুণ হাত মুখ ধুতে চলে গেল। রমলা এখন চা বেশ ভালই করে। চায়ে চুমুক দিয়ে রঘু রমলার দিকে তাকাল। রমলাও বারান্দায় বসে একমনে কি যেন ভাবছে। কি ভাবে রমলা? ওর এই যে বর্তমান অবস্থা তার বয়স তো বড় জোর আড়াই তিন বছর। এই তিন বছরে তার যে জীবন সে কাটিয়েছে তাতে ভাবার তো কিছুই নেই। তবু রমলা কি ভাবে? রঘুর মনে হল নিশ্চয় সে সেই অধরা অতীতকে খুঁজছে। সেই অতীত ও রমলার সামনে একটা হালকা পর্দা পড়ে আছে। ফলে অতীতের একটা অস্পষ্ট ছায়া সে দেখতে পাচ্ছে। সেই অধরা অতীতের একটা অনুভব আছে, যা ওকে অন্ধকারে হাতড়াতে তাগাদা দিচ্ছে। রঘু মনে মনে বলল, 'হে ঈশ্বর তাকে তুমি এখন স্বাভাবিক করে দিয়েছ, এখন ওর ঘর সংসার ফিরিয়ে দাও। এটা ঠিক যে এই কদিনের মেলামেশায় রমলার উপর বাড়ির সবার একটা মায়া পড়ে গেছে। যদি রমলা ফিরে যায় ওর বাড়িতে, সবার ভাল লাগবে ঠিকই, পাশাপাশি সবার কষ্ট হবে, রঘুরও হবে। কারণ পাগল থেকে স্বাভাবিক হওয়ার এই যে বিবর্তিত সময়টা শুধুই স্মৃতিময়।

বরুণ হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বলল, 'এই রে চা টা বোধয় ঠান্ডা হয়ে গেল।' তারপর রঘুর কাছে গিয়ে বলল, 'শোন রঘু, তুই রাগ করিস না বন্ধু একটা কথা বলি। সেদিন তুই যখন কুসুমকে দেবতার মতো পবিত্র বললি, তখন আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি। তাই কুসুমদের বাড়িতে গিয়েছি এবার। কুসুম আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। চিঠিটা তোকেই লেখা, এই নে। আমি আর কিছু বলব না বাকি কথা চিঠি পড়েই তুই জানতে পারবি।'

রঘু কুসুমের চিঠিটা হাতে নিয়ে আবার আনমনা হয়ে গেল। বরুণ রমলা কখন খোকার দোকানে চলে গেছে রঘু বুঝতেই পারল না। কি লিখেছে কুসুম এই চিঠিতে? কোন দুঃসংবাদ নেই তো? জীবনে এত কষ্ট রঘু পেয়েছে তাতে কোন দুর্ঘটনাই আর তাকে নাড়া দেয় না। তবু যে কোন দুঃসংবাদ মানুষকে একটা প্রাথমিক

ধাক্কা দেয়। যা এই চার পাঁচ বছরে রঘু একদম অনুভব করেনি। বেশ ভালই আছে সে পিছুটান ছাড়া। কিন্তু আজ আবার কুসুম কেন ওর ক্ষতস্থানগুলিকে খুঁচিয়ে দিচ্ছে? অনেক ভেবে কুসুমের চিঠিটা খুলল রঘু।

"রঘুদা,

কেমন আছ? বিয়ের এক বছর আগে থেকেই তোমার সাথে দেখা হোত না। তবু তুমি কাছে ছিলে, দূর থেকে তোমাকে দেখতে পেতাম। রেণুর কাছে তোমার কথা শুনতাম ফলে সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু তারপর কটি বছর তুমি যে কোথায় হারিয়ে গেলে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন কতশত যুগ ধরে তোমাকে দেখি না। তুমি এখন কেমন দেখতে হয়েছ? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোমাকে। কতোদিন সকালে বিকেলে তোমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে ভাবি ভুল করেও যদি তুমি কোনদিন চলে আস কোন কাজে তাহলে তোমাকে দেখতে পাব। তোমার ওপর থেকে আমার সমস্ত অধিকার তুমি কেড়ে নিয়েছো বলে নিজেকে খুব অসহায় লাগে। ঐ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অতীতের স্মৃতিগুলি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করি। ভালো লাগে। বাঁচার প্রেরণা পাই।

বরুণদার কাছ থেকে তোমার সব খবর আমি নিয়মিত পাই। তোমার ইচ্ছা শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে। এতদূর যখন এগিয়েছো তখন হাল ছেড়ে দিও না। আরও পড়াশোনা করতে হবে। অর্থাভাব ঘোচাবার জন্য সাময়িক চাকুরি নিলেও লক্ষ্যচ্যুত হবে না। আমি যে জায়গায় তোমাকে দেখতে চাই সেই জায়গাটা তোমাকে ছুঁতে হবে। তবু তোমার পূর্বাপর সব কিছু জেনে আমি স্বস্তি পেয়েছি।

আমার কথাও কিছুটা তোমাকে বলতে হয় তাই বলি। আমার ছেলের বয়স তিন বছর হয়ে গেছে। তার জন্মের সময় এতো অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম বাঁচব বলে ভাবিনি। তবে এখন ঠাকুরের অশেষ কৃপায় সুস্থ আছি। আমার পুত্র ও তার পিতা সুস্থ এবং ভালো আছে। আমার পতিদেবকে তুমি দেখোনি। অত্যন্ত গো বেচারা নিরীহ ভাব ধরে থাকলেও এক নম্বরের ধূর্ত। ওর মা মানুষ হিসেবে আরও খারাপ। যদিও আমি তোমার সব কথাই ওকে খুলে বলেছি। তিনি তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।

যে কথাটি বলতে এতো কথা লিখলাম সেই কথাটিই বলা হল না। বরুণদার কাছ থেকে আমি জেনেছি পিসিমার কোন খবর তোমার কাছে নেই। পিসিমা চলে যাওয়ার পর থেকে নিয়মিত আমার সাথে যোগাযোগ রাখেন। তোমার ঠিকানা চেয়ে আমাকে বারবার চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু তোমার পোস্টাল এড্রেস আমার কাছে না থাকায় আমি পিসিমাকে সাহায্য করতে পারিনি। অবশেষে বরুণদার কাছ থেকে তা সংগ্রহ করলেও তোমার অনুমতি ছাড়া তা দেওয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে দেইনি। গত তিন বৎসর যাবৎ কদাচিৎ শ্বশুরবাড়ি গেলেও আমি বাপের বাড়িতেই আছি। এই ক-বছরে তোমাকে লেখা পিসিমার প্রায় একশখানা চিঠি পেয়েছি।

আমি সযত্নে চিঠিগুলি রেখে দিয়েছি। ঐ চিঠির ভেতরে কি লেখা আছে আমি জানি না। এই চিঠিগুলি আমি বরুণদার হাতে দিয়ে তোমার কাছে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু অন্তত আরও একবার তোমাকে স্বচক্ষে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে তোমার এই অতি মূল্যবান সম্পদগুলি আটকে রাখলাম।

আমি আরও কিছুদিন এখানে থাকব। ততদিনে তোমার পরীক্ষাও শেষ হয়ে যাবে। তুমি একবার দেখা করে যেও। রেণুর এখনও বিয়ে হয়নি। সমর আর পৃথিবীতে নেই। বাকি সবাই আগের মতোই আছে। আমাদের শৈশবের দলটা মাঝে মাঝে এক সাথে মিলিত হই। তখন দলনেতার অভাবটা বড় বেশি চোখে পড়ে। তুমি ফিরে এলে আমাদের মাঠে আবার কাশফুল ফুটবে। এক বার ফিরে এসো রঘুদা। দেখবে তোমার শৈশবের মাঠ ঘাট এখনো হারিয়ে যায়নি। হারিয়ে যায়নি তোমার কুসুমও। তোমাকে আরও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে পিসিমা গত তিন মাস যাবৎ আমাকে এবং তোমাকে কোন চিঠি লেখেননি। আমি বারবার তাকে চিঠি দিয়েও সাড়া পাইনি। তোমার চিঠিতে হয়তো কিছু লেখা থাকতে পারে। আমার কাছে এই প্রসঙ্গে কোন তথ্য নেই। ভালো থেকো।

ইতি

তোমার কুসুম।"

চিঠিটা শেষ হয়ে গেলেও রঘু আবার পড়তে লাগল। বারবার পড়েও চিঠিটার অন্তর্নিহিত অর্থ যেন সে ধরতে পারেনি। যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেগুলির তীব্রতা তীক্ষ্নতা এতো বেশি রঘু সইতে পারছিল না। কিন্তু রঘুর মনে হচ্ছে এই চিঠির প্রতিটি ছত্রে অনন্মোচিত অনেক কথা লুকিয়ে আছে যা রঘু ধরতেই পারেনি। চোখের পাতাগুলি কখন ভিজে গেছে সে খেয়াল করেনি।

নিজেকে যোগ্য হিসেবে তৈরি করার জন্য যারা তার পরম প্রিয় তাদের সবাইকে একে একে ভুলে গেছে রঘু। কুসুমকে এড়িয়ে গেছে, মা'র কাছেও ইচ্ছে করেই ফিরে যায়নি সে। এমনকি আইচুকতিকেও ভুলে থেকেছে সে নিজেকে গড়ার জন্য। কিন্তু আজ রঘু যোগ্য হতে যাচ্ছে। হয়তো আরও পড়াশোনা করে আরও যোগ্য হবে। কিন্তু পরম প্রিয় আপনজনেরা একে একে সবাই দুরে বহুদুরে রঘুর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। রঘু যোগ্য হলেও ওদের আর কাছে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

তরুবালা রঘুর কাছে এতোগুলি চিঠি লিখেছেন, অথচ রঘু বারবার কুসুমের কাছ থেকে মৌখিক খবর পেয়েও গুরুত্ব দেয়নি। নিশ্চয় তরুবালা হাজার সুখ দুঃখ বেদনার কথা লিখতে লিখতে রঘুর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কুসুম রঘুর ব্যাপারে অনেক কিছু লিখেছে তরুবালাকে। তার মধ্যে কুসুম বলেছে রঘুর ঠিকানা তরুবালাকে দেয়নি। কিন্তু রঘু এখন কেমন আছে কি করছে সেটা নিশ্চয়ই জানিয়েছে।

নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হল রঘুর। মামা বাড়ির ঠিকানা মসন্দরের কাছ থেকে নিয়েছিল সে। তবু কি এক অভিমানে সে একবারও চিঠি লেখবার প্রয়োজন মনে করেনি। কেমন আছেন তরুবালা? কি করছেন এখন তিনি? কি করে দিন কাটছে তার? এই সব প্রশ্নের সমাধান কুসুমের কাছে রক্ষিত আছে। কিন্তু গত তিন মাস ধরে আর কোন যোগাযোগ নেই কেন? মা কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কুসুমের কাছে ফিরে যেতেই হবে। এই সব প্রশ্নের উত্তর এখুনি জানতে হবে রঘুকে। কুসুমের কাছেই কি করে ফিরে যাবে সে? কতোদিন পর কুসুমের সাথে দেখা হবে তার। কুসুমের পতি যদি বাড়িতেই থাকেন, কি ভাববেন? কুসুমও কি অস্বস্তিতে পড়বে না রঘুর উপস্থিতিতে? ছোট্ট ছেলেটি কুসুমের। সেও নিশ্চয় কুসুমের মতোই দেখতে ফুটফুটে হয়েছে। আর সমর? সে কেন অকালে ঝরে গেল? শৈশবের অনেক স্মৃতিই তো তাকে ঘিরে। সেও চলে গেল? কি হয়েছিল তার? বুকের ভেতরটা যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল।

কুসুমের কাছে ফিরে যেতেই হবে তাকে। তরুবালার চিঠিগুলি না পেলে রঘু কিছুই বুঝতে পারছে না। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আর যাই হোক মার কাছে তাকে যেতেই হবে। তার আগে পরীক্ষাটা শেষ করে ফেলতে হবে। যার জন্য সব ত্যাগ করল রঘু, সেই মোক্ষ লাভ করাই এখন তার একমাত্র কাম্য।

হঠাৎ মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল রঘুর। বালিশের নিচে খোকার বিড়ির বান্ডিল থাকে, সেখান থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। সন্ধ্যা হয় হয়। যতক্ষণ মন চায় একমনে পথে পথে ঘুরবে রঘু। তারপর তার বর্তমান পরিবার যারা খোকার দোকানে বসে আছে তাদের কাছে চলে যাবে। রাতে হৈ চৈ করে সবাই একসাথে ভাড়া ঘরে ফিরবে। এভাবেই তো চলে যাচ্ছে জীবন। অতীতের সুখ দুঃখ ভুলে থাকতে বর্তমানটাকে উজ্জ্বল করে নিলেই তো হয়।

রঘুর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পরীক্ষার প্রতিটি দিন কলেজে অশান্তি হয়েছে। কম্যুনিষ্টদেব পাইকারি হারে সন্দেহমূলক ভাবে ধরপাকড় শুরু হয়েছে চারিদিকে। কলেজও তার তাপ থেকে বাদ যায়নি। পরীক্ষার হল থেকে দুইটি ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। রঘুর কম্যুনিষ্টদের সাথে মেলামেশা আছে। তাই আতংকে পরীক্ষা দিয়েছে সেও। ফলে পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়েছে সেদিন বিকেলে আর বাড়ি ফেরেনি সে। কারণ প্রতাপ দত্ত সহ বহু পরিচিত পার্টির লোক আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছেন। প্রতাপদা কদিন আগে রঘুর ঘরে এসে বলে গেছেন. 'রঘু পরিস্থিতি ভাল না। কার বিপদ কার উপর যে এসে পড়বে তা তো বলা যায় না। ফলে পরীক্ষা শেষ হলে আর দেরি করবে না। সোজা লুকিয়ে পড়বে। পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হলে ফিরে আসবে।'

রঘু কোথায় যাবে ঠিক করতে পারল না। মোটরস্ট্যান্ডে এসে ভাবছিল কোথায় যাবে। কুসুমের সাথে দেখা করা খুব দরকার, সেখানে একবার যেতেই

হবে তার। তরুবালার চিঠিগুলি না পেলে ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুই ভাবতে পারছে না সে। কিন্তু হঠাৎ কি হল তার, খোয়াইর গাড়িতেই চেপে বসল সে। আইচুকতির মুখটা ভেসে উঠতেই একটা হ্যাঁচকা টানে তাকে যেন ভরত চৌধুরী পাড়ার দিকে টেনে নিয়ে গেল। কতোদিন আইচুকতির সাথে রঘুর দেখা নেই। গাড়িতে চাপতেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল তার। রঘু মনে মনে ভাবল আর দেরি করা ঠিক হবে না। এবার ঘর বাঁধার কথা আইচুকতিকে বলবে সে। গুরুজনদের অনুমতি পেলে আর দেরি করবে না। আইচুকতি এতোদিন পর রঘুকে দেখে কি করবে কে জানে।

বিয়ের আগে কুসুমের কাছ থেকে মার ঠিকানা নিয়ে পত্রযোগে হলেও মার অনুমতিটা নিয়ে নেবে। পরীক্ষাটা হয়ে যাওয়ায় রঘুর মনটা যেন হাল্কা হয়ে গেল। যে লক্ষ্য নিয়ে সে আগরতলা এসে পৌঁছেছিল তার ষোলো কলাই যেন পূর্ণ হল। এখন আইচুকতির ঠিকানা যখন পেয়েছে তাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। বাকি রইলেন শুধু তরুবালা। তাকেও খুব দ্রুত কাছে পেতে হবে রঘুর। জীবনে অনেক কষ্ট করেছে রঘু, অনেক দুঃখ সয়েছে। এবার ভাগ্যের চাকা সঠিক দিকেই ঘুরবে। যা কিছু হারিয়েছে রঘু সব ফিরে পেতে হবে তাকে। শুধু আইচুকতিকে তরুবালা মেনে নিলেই পৃথিবীর সব সুখ ধরা দেবে রঘুর কাছে।

রঘু পালাতে চেয়েছে ভয়ে। অহেতুক কোন বিপদে যেন পড়ে না যায় সেজন্য নিজেকে নিরাপদ দুরত্বে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সাধারণত রঘু কখোনই এমনটা করে না। তার প্রতিটি কাজ খুবই শৃঙ্খলাপূর্ণ। প্রতিদিন পড়াশোনা ছাড়াও কলেজে যাওয়া এবং হোটেলে কাজ করা। মাঝে মাঝে কখনো সময় পেলে খোকার দোকানে সময় কাটাতে যায় সে।

সেই ছেলেটা হঠাৎ ভোজবাজির মতো বেপাত্তা হয়ে গেল। এদিক ওদিক পরিচিত সব জায়গা খুঁজেও রঘুর কোন হদিশ পাওয়া গেল না। তখন সবার বদ্ধমূল ধারনা হল রঘুকে হয়তো পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। পরদিন গৌর সাহা থানা পুলিশ সব খুঁজেও রঘুর কোন খোঁজ পেলেন না। বরুণ, খোকা, বাড়ির মালিক মিলে সারা আগরতলা শহর তন্ন তন্ন করেও যখন রঘুকে পেল না তখন সবাই হাল ছেড়ে চিন্তায় পড়ে গেল। রঘু বেপাত্তা হওয়ার দিন থেকেই রমলা ছটফট করতে শুরু করল। একদিন দুদিন পর রমলা যেন আরও বেপরোয়া হতে শুরু করল। বরুণ ও খোকা রমলার কান্ডকারখানা দেখে ভয় পেয়ে গেল। বাড়ির মালকিন থেকে অন্যান্য ভাড়াটিয়া মহিলারা সকাল বিকেল বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু রমলা কিছুতেই রঘুর অভাব যেন মেনে নিতে পারল না। রঘুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এই কথাটা তার মাথায় পোকার মতো ঢুকে গেল। বহু কষ্টে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রমলাকে দিন চারেক আটকে রাখা গেলেও পঞ্চম দিন সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর দিন ভোরবেলা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল বরুণদের ভাড়া বাড়িতে। গাড়িতে একজন দারোগাবাবু ছিলেন। তিনি নেমে এসে রঘুর নাম ধরে ডাকলেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বরুণ ও খোকা পুলিশের ডাক শুনে হক্‌চকিয়ে ঘুম থেকে

উঠল। বাড়ির উঠোনে বাড়ির সব ভাড়াটিয়া, পাশের বাড়ির লোকজন সবাই ভিড় জমাল।

দারোগাবাবু ভিড়ের উদ্দেশে বললেন, 'রঘু কে?'

বাড়ির মালিক এগিয়ে এসে বললেন, 'রঘুকে আজ পাঁচ দিন যাবৎ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দারোগাবাবু।'

'আপনি কে?'

'আজ্ঞে আমি রসময় পাল। রঘু আমার বাড়িতে তিন বছর ভাড়াটিয়া হিসেবে আছে।'

'থানায় মিসিং ডায়েরি করেছেন?'

দারোগাবাবু এমন কড়া সুরে কথাটা বললে বাড়ির মালিক আমতা আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে না।'

বরুণ জিজ্ঞেস করল, 'রঘুর কি হয়েছে স্যার?'

'রঘুর কি হয়েছে আমি কি করে জানব? তবে রঘুর বউটা এক্সিডেন্ট করেছে কালরাতে। আমাদের এই পুলিশ ভ্যানের সামনে হঠাৎ ছুটে এসে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়ার আগে বউটা বোধ হয় 'রঘু-রঘু' বলে চিৎকার করছিল। পরে আশেপাশের লোকের সাথে কথা বলে এই বাড়ির ঠিকানাটা পেয়েছি। কাল রাতে খুব খারাপ অবস্থা গেছে মহিলার। বাঁচবে কিঁ না সন্দেহ ছিল। যাই হোক ঈশ্বরের কৃপায় এ যাত্রা সে বোধ হয় বেঁচে যাবে।'

দারোগাবাবু ভিড় ঠেলে চলে গেলেন। কিন্তু বাড়ির উঠোনে তখন যেন বজ্রপাত হল। রঘুর বউ বলতে দারোগাবাবু যে রমলার কথাই বলেছেন সে ব্যাপারে কারোর কোন সন্দেহ রইল না। তবে সে কেন পুলিশের ভ্যানে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটাই বোঝা গেল না। খোকা যা বলল তার সারমর্ম এই রকম, রমলা ভেবেছিল পুলিশ রঘুকে ধরে নিয়ে গেছে। তাই সে পুলিশকে খুব শাপ শাপান্ত, বাপ বাপান্ত করেছে। হয়তো পুলিশের ভ্যান দেখে রমলা ভেবেছিল রঘু এই ভ্যানে থাকতে পারে। তাই রঘুকে ছিনিয়ে আনতেই সে পুলিশ ভ্যানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নানা রকম জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। ডাকসাইটে মালকিনও রমলা রঘুর চিন্তায় চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

হাসপাতালের বেডে রমলাকে বিশেষ কেয়ারে রাখা হয়েছে। ওর জ্ঞান আছে বলে তখনও মনে হচ্ছে না। সারা শরীরে ক্ষতগুলি সাদা কাপড় ও তুলোর ব্যান্ডেজে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেই অষুধ এবং রক্তের লাল দাগ উঁকি মারছে। বরুণ, খোকা, গৌর সাহা, বাড়ির মালিক সবাই হাসপাতালে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু রমলার সাথে কেউ দেখা করতে পারলেন না। নানা ভাবনা উদ্বেগের মধ্যে দু দিন কেটে যাওয়ার পর একজন নার্স এসে বললেন, রমলার জ্ঞান ফিরেছে। সে তার বাড়ির লোককে খোঁজছে।

বরুণ, খোকারা আর দেরি করেনি। ফলমূল, দুধ ইত্যাদি নিয়ে সবাই

ভেতরে গেল। কিন্তু রমলার এই কষ্ট দেখে কেউ কথা বলল না। মালকিন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। রমলা অবাক হয়ে সবার দিকে তাকিয়ে রইল। কাউকে সে চিনতে পেরেছে বলে মনেই হল না।

প্রায় দিন চারেক পর রমলা কেবিন থেকে ছাড়া পেয়ে জেনারেল ওয়ার্ডের বেডে চলে এল। ওর চিকিৎসার ব্যয় গৌর সাহা নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন। বাড়ির মালিক ও মালকিনও প্রচন্ড খাটাখাটুনি করলেন। অবশেষে মেয়েটা বেডে উঠে বসেছে দেখে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এখন স্বাভাবিক খাবার দেওয়া হচ্ছে তাকে। বরুণ, খোকা প্রায় নাওয়া খাওয়া ভুলে দিন রাত ডিউটি করছে। সেদিন সকালে হাসপাতালে এসেই বরুণ চলে গেল রমলার কাছে। রমলা তখন চা পাউরুটি খাচ্ছে। বরুণ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছো রমলাদি?'

রমলা এমনভাবে বরুণের দিকে তাকাল তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। ইহজন্মে কোনদিন সে বরুণকে দেখেছে বলে মনে হল না। রমলা চোখে একরাশ কৌতূহল ও বিস্ময় নিয়ে বরুণের দিকে তাকাল। 'আপনি আমাকে কিছু বলছেন?'

বরুণ প্রচন্ড ঘাবড়ে গেল। রমলা একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলছে। বরুণ হেসে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, তোমাকেই বলছি। এখন কেমন আছ রমলাদি?'

'কি বললেন? রমলা!'

'হ্যাঁ দিদি।'

'আপনি কে ভাই? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

'আমি বরুণ।'

'বরুণ!'

বরুণ অসহায় হয়ে গেল। মা, মাসি, দিদি ছাড়া অন্য মেয়েদের সাথে কথা বলে সে তেমন অভ্যস্ত নয়। অবশ্য রাস্তার পাগলী মনে করে রমলার সাথেও কথা বলতে ওদের অসুবিধে হোত না। কিন্তু এই নবজন্ম পাওয়া মহিলা মোটেই রমলা নয়। বরুণ 'তুমি টুমি' বলা সম্বোধনগুলি দূরে সরিয়ে দিল। সে তাড়াতাড়ি সট্‌কে পড়ার ধান্দায় বলল, 'তাহলে আজ আমি আসি দিদি।'

রমলা বলল, 'না না দাঁড়ান। এটা কোন্ জায়গা বরুণবাবু?'

'এটা আগরতলা।'

'আগরতলা! মানে কোন্ জায়গা?'

'এটা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা।'

'মানে ইন্ডিয়া!' রমলার চোখগুলি প্রায় কপালে ওঠার জোগাড়। অস্ফুটস্বরে সে বলল, 'আমি এখানে কি করে এলাম?'

বরুণ এবার বুঝতে পারল অ্যাক্সিডেন্টে একটা চমৎকার কান্ড হয়ে গেছে। রমলার স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে। কথাটা বুঝতে পেরে বরুণের মনটা খুশি হয়ে গেল। রঘুর জন্য তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুধু এই দিনটা দেখার জন্য রঘু

কতো চেষ্টা করেছে। কতো এক্সপেরিমেন্ট করেছে রমলাকে স্বাভাবিক করার জন্য। অথচ আজ সবাই আছে শুধু রঘুই নেই। রমলা বরুণকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কতোদিন এখানে আছি?'

'তিন বছর ধরে আমাদের সাথেই আছেন, তার আগে আমি জানি না।'

'আমি কি আপনাদের সাথেই থেকেছি এতোদিন?'

'হ্যাঁ দিদি। আমরা তিন জনের সাথে - রঘু, খোকা ও আমি।'

'আপনারা আমাকে কোথায় পেলেন?'

'আমি তো সঠিক বলতে পারব না দিদি। তবে রঘু সব জানে। আসলে আপনি তো উন্মাদিনী পাগল-।' কথাটা বলতে গিয়েও আটকে গেল বরুণ। তার খারাপ লাগছে দেখে রমলা বলল, 'আপনি বলুন আমার খারাপ লাগবে না। সবকিছু আমার জানতে হবে। না হলে আর সময় হবে কি? আপনি বলুন।'

'না মানে বলছিলাম কি দিদি আপনার ঐ অবস্থা দেখে রঘুর মায়া হয়। আপনার ময়লা ছেঁড়া কাপড়, জট লাগানো চুল, সব রঘুর চেষ্টায় পাল্টে গেছে। আপনার চিকিৎসা করিয়ে, আপনার যত্ন করে ধীরে ধীরে আপনাকে সুস্থ করে তুলেছে রঘু।'

'তারপর?'

'প্রথমদিকে আপনি কিছুদিন গৌর সাহার হোটেলে কাজ করেছেন। তারপর ঐ কাজ রঘু ছাড়িয়ে আপনাকে কলেজ টিলার রসময় পালের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। এখানে ঘরোয়া পরিবেশ পেয়ে আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে।'

'এখানে কতোদিন আছি আমি?'

'রসময় পালের বাড়িতে পুরো তিন বছর।'

'তার আগে কোন বাড়িতে ছিলাম?'

বরুণ হাসল। 'তার আগে কোন বাড়িতে না দিদি। গোলবাজারের বারান্দায় রাতে শুতেন আপনি। সাথে রঘু ও খোকাও ছিল। আপনি সবকিছু ভুলে গেছেন দিদি? খোকা একটু পরেই আসবে। সে সবকিছু আপনাকে বলতে পারবে।'

'না-না আপনি বলুন আমি খোকাবাবুর কাছ থেকে পরে শুনব।'

বরুণ এক এক করে সব ঘটনাই খুলে বলল। তার জন্য রঘুর এই মমতার কথা শুনে ওর চোখ জলে ভরে গেল। বরুণ কিছুই লুকোয়নি। সে যা জানত সব খুলে বলল ওকে। রমলা বোধ হয় আর কিছুই শুনতে পেল না। ভাবনার কোন অতল তলে ডুবে গেল সে। বরুণ আর কথা বাড়ায়নি, মানসিক রুগী যদি আবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে? সে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে একটা আনন্দের লহর বয়ে গেল বরুণের। রমলার স্মৃতি ফিরে এসেছে। নিশ্চয় তার পরিবার সম্বন্ধে সে সবকিছু বলতে পারবে। বরুণ, খোকা, রঘু মিলে ওকে

তার বাড়িতে, তার পরিবারের কাছে, পৌঁছে দেবে। নতুন করে আরও একটা পরিবারের সাথে ওদের সম্পর্ক তৈরি হবে।

সময় নষ্ট না করে বরুণ সোজা চলে এল খোকার কাছে। খোকাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল গৌর সাহার কাছে। বরুণের আনন্দ দেখে তারা সবাই অবাক। তারা আরও বিস্মিত হল যখন বরুণ বলল, রমলা একদম স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সে আর বরুণকে চিনতে পারছে না। গৌর সাহা আর দেরি করলেন না। খোকাকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন হাসপাতালে।

বেডের পাশে বসে থাকা গৌর সাহা ও খোকাকেও রমলা চিনতে পারেনি। মাত্র কটা দিনে রমলার স্মৃতি থেকে ওরা পাকাপাকিভাবে হারিয়ে গেল। ফলে খোকার মনে সামান্য কষ্ট হল। রমলার শরীর এখনো পুরো সুস্থ হয়নি। ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। গৌর সাহা বললেন, 'না না ঠিক আছে। উঠতে হবে না তুমি শুয়ে পড়।'

রমলা প্রশ্ন করল, 'আপনারা?'

'আমি গৌরাঙ্গ সাহা আর সে খোকন দেব। আমরা দুজনেই ব্যবসায়ী। আমরাই তোমার দেখভাল করেছি এতোদিন। এখন তোমার স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে আর কোন চিন্তা নেই। আমরা যা চেয়েছিলাম তা পূর্ণ হয়েছে। রঘু থাকলে এখন কি খুশিই না হোত। সে সবসময় বলতো তুমি খুব বড় ঘরের মেয়ে।'

'রঘু এখন কোথায়?'

'তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কলেজের এতো ভাল ছাত্র, এতো ভাল ছেলে, কোথায় যে হারিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের কথা তোমার কিছুই মনে পড়ছে না?'.

রমলা আবার বিস্মিত নয়নে তাকাল। গৌর সাহা বললেন, 'না না থাক। আমাদের কথা আর মনে করতে হবে না। ভগবান যখন তোমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন তখন নিশ্চয় তোমার পরিবারের কথা তোমার মনে পড়বে। তাদের নাম ঠিকানা আমাদের দাও। আমরাই তোমাকে তোমার নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

খোকা বলল, 'তোমার বাড়ির কথা কিছু মনে পড়েছে দিদি? কোথায় তোমার বাড়ি?' রমলা হঠাৎ ঝড়ঝড় করে কাঁদতে লাগল। ওর কান্না দেখে গৌরবাবু, খোকা সবাই ঘাবড়ে গেলেন। রমলা বলল, 'আপনারা আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। না বুঝে অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাদের আমি। আপনাদের জন্যই আমি সুস্থ হতে পেরেছি।'

খোকা বলল, 'এসব কি বলছ দিদি তুমি! আমাদের আবার কষ্ট কি?'

গৌরবাবু বললেন, 'সব কষ্ট আমরা ভুলে গেছি তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ দেখে। তোমাকে এবার নিয়ে যাব কলেজটিলা রসময় পালের বাড়িতে। তার মধ্যে রঘু যদি ফিরে আসে তাহলে তো খুব জমবে। তারপর একেবারে সুস্থ হয়ে তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে, আমরাই তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসব।'

রমলা গৌর সাহাকে বলল, 'আপনার সাথে একান্তে আমার কিছু কথা ছিল।' খোকা ইঙ্গিত বুঝতে পেরে দূরে সরে গেল। রমলা জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে একটা কথার সঠিক উত্তর দেবেন দাদা?'

'হ্যাঁ বল।'

একটু ইতস্তত করে রমলা নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কি এখানে কারো সাথে নিকাহ্ হয়েছিল?'

গৌরবাবু বললেন, 'না না এই ভয় তোমার নেই। তুমি তো বদ্ধ পাগল ছিলে। ফলে - ।'

রমলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। গৌরবাবুও হাসলেন, এই মেয়ে হিন্দু নয়, মুসলমান। তাই হয়তো ভয়ে নিজের পরিচয় গোপন করতে চাইছে। রমলা বলল, 'আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'বল।'

'আমি যে কোন সময় আমার বাড়িতে চলে যেতে পারি। আপনি এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবেন না।'

'কিন্তু তোমার এই শরীর নিয়ে এখন যেতে পারবে তো?'

'কিচ্ছু হবে না, আমি ঠিক পৌঁছে যেতে পারব। একবার সুস্থ যখন হয়ে গেছি তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে ভয় হয় সবাইকে পেয়ে আমি যদি আবার আমার সন্তান সংসার সবকিছু ভুলে যাই। ফলে আমি আজকের এই মনটাকে তাজা রাখতে চাই। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে আর দেরি করা ঠিক হবে না। যা হারিয়েছিলাম তা আবার ফিরে পেতে চাই। এখন দেখি ভাগ্যে কি লেখা আছে।'

'তুমি কোথায় যাবে বোন? তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার স্বামীর নাম কি?'

'এখন আপনাকে এ বিষয়ে কিছুই বলব না। তবে কথা দিচ্ছি সবাইকে যদি ফিরে পাই একদিন ঠিক আপনাদের এখানে আসব। কারণ এই দেশ আমাকে নবজন্ম দিয়েছে। ফলে এই দেশও আমার নব জন্মভূমি, আর আপনারা আমার পরমাত্মীয়।'

'ভগবান না করুন তবু বলছি, আর যদি ওখানে ঠাঁই না পাও, তাহলে?'

'পরমাত্মীয়দের কাছেই আবার ফিরে আসব। এখন আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে কিছু টাকা দিন। আমি আপনার ঠিকানায় পরে টাকাগুলি পাঠিয়ে দেব।'

গৌর সাহা হেসে বললেন, 'এই টাকা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। এটা তোমারই টাকা, তুমি আমার হোটেলে যখন কাজ করতে তখন তোমার মাসিক বেতনের টাকাটা রঘু ও আমার কাছেই জমা থাকতো। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এই শরীর নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে কোথাও তোমার যাওয়া ঠিক হবে না।'

'না-না আমি সুস্থ হয়েই যাব। সুস্থ হয়ে আপনাদের সাথে দেখা করে তারপর যাব। এই শরীর নিয়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।'

গৌরবাবু কোমরে বাঁধা থলে থেকে গুনে গুনে টাকা দিলেন রমলাকে। তারপর নিজের ঠিকানাটা লিখে ওকে দিয়ে বললেন, 'ভেবো না টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য এই ঠিকানা তোমাকে দিয়েছি। আসলে তুমিও তো মেয়ে, কখনো যদি কোন অবিশ্বাস তৈরি হয় তোমার পরিবারে তখন আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

গৌরবাবু উঠে দাঁড়ালেন। রমলা বলল, 'আগামিকাল সকালে আবার আসবেন।'

'হ্যাঁ আমরা অবশ্যই আসব।'

'রঘুকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।'

'সে কদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলে দেখা হতেও পারে।'

রমলা ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল। গৌরবাবু চলে যেতে গিয়েও আবার একবার ফিরে তাকালেন। তার ভেতরটা কেমন যেন সুখে দুঃখে হঠাৎ কেঁদে উঠল। এই মেয়েটার উপর এই কদিনে তারও যে মায়া পড়ে গেছে সেটা তিনি বুঝতে পারলেন।

খবরটা দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রমলা স্বাভাবিক হয়ে গেছে এটা চমৎকার থেকে কম নয়। রসময়বাবু মা কালীর নামে জোড়া পাঁঠা বলি দেবেন মার বাড়ি মানৎ করলেন। অনেক রাত ধরে শুধু রমলার কথাই আলোচনা চলল ঘরে ঘরে। রমলা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য আরও বেড়ে গেল সবার। কার মেয়ে? কার বউ? কেমন পরিবার কিছুই জানা হল না। তার সত্যিকারের নামটাই বা কি সেটাও কেউ জিজ্ঞেস করল না। কি করে যে সে এখানে এল সব কিছুই এখন জানতে হবে রমলার কাছ থেকে। বাড়ির মালকিন প্রতিবেশী দুই মহিলাকে নিয়ে রীতিমতো ফর্দ তৈরি করলেন কি কি ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন রমলাকে। দুয়েকজন অতি উৎসাহে বললেন, 'যদি ওর বাপ বা স্বামী বড়লোক হয় দু চার দিন কিন্তু ওদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসব আমরা সবাই।' সবার ধারনা হল রমলা দুরের কোনও দেশের মেয়ে। কারণ ওর কথা বলার ঢং-এর সাথে এই অঞ্চলের মানুষের কথার তেমন কোন মিল নেই। মহিলারা রাতেই তাদের ঝুড়িতে ফলমূল গুছিয়ে রাখলেন। কারণ অনেকটা পথ, একটু সকালবেলা বেরিয়ে পড়তে হবে।

পরদিন সকালে হাসপাতালের সামনে রীতিমতো ভিড়। গৌর সাহা এলেন একটু দেরিতে। জটলা দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখেন পুরুষরা কেউ নেই। রসময় পালের স্ত্রীর চোখে জল। গৌরবাবুকে দেখে তিনি বললেন, 'কেন এসেছেন দাদা? মাগী আমাদের ভেল্কি দিয়ে পালিয়ে গেছে।'

গৌরবাবু প্রথমে কথাটা বুঝতে পারেননি। অন্য একজন মহিলা বললেন,

'কাল রাতেই রমলা হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ছেলেরা সব ওকে খুঁজতে গেছে এদিক ওদিক।'

মালকিন এবার পুরানো চেহারা ধরে বললেন, 'কতো বড় বেইমান দেখলে টেপুর মা। আমরা যে ওর জন্য এতো করলাম তার সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধ আছে?'

গৌরবাবু সবাইকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। রমলা যে চলে যাবে সেটা গৌরবাবু আগেই জানতেন। তবে সে গতরাতেই যেতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। কিন্তু তার মনে কোন দুঃখ রইল না। যদিও সে ভয়ে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখেছে, কিছুই বলে যায়নি। কারণ এখানে সে কি করেছে এই কটা বছর সে নিজেই জানে না। যা কিছু শুনেছে তাও বড়ই লজ্জার, বেদনার। এই অজ্ঞাত, অবাঞ্ছিত ইতিহাস তার পেছনে তাড়া করুক তা রমলা চাইবে না। সে আগে ফিরে যাবে তার ঘরে। তারপর হিসেব করে দেখবে, মেপে দেখবে কতটুকু কি বলা যায় তার পরিবারকে। তবে গৌর সাহা মনে মনে আশীর্বাদ করলেন ওকে। যা মেয়ে তুই ফিরে যা তোর ঘরে। আবার ভরে উঠুক তোর ঘর সোনায় সোহাগে।

পাল বাড়ির আকাশ সারাদিন যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল। একটা গুমোট ভাব ধরে আছে। কেউ মরে গেলে যেমন সবাই মুষড়ে পড়ে তেমনি হাল হল সবার। খোকা বরুণের মতো ভাল ছেলে নয়। কিন্তু রঘুর ছোঁয়ায় সে অনেকটাই মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ সে আর পারল না। আকন্ঠ মদ গিলে দোকানেই পড়ে রইল। কেন ফিরে যাবে সে ঘরে? কার জন্য? বেঁচে থাকার মানেটাই যেন তার হারিয়ে গেছে।

১৩

ভরত চৌধুরী পাড়ার আগের চেহারা আর নেই। আঠারমুড়া পাহাড়ের কোলে যে বুনো গন্ধ ছিল এই পাড়াতে তা প্রায় নেই। এই পাড়াতে সামান্য টিলাভূমি আছে বটে তাও সমতল ভূমির মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত এবং বড়ই উপেক্ষিত। ঘন্টাছড়া বাজারের পাশে যে পাড়াটায় ভরত ছিল সেখানে ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট টং ঘর। সীমাহীন পাহাড়ের বুকে পাথর ও রুক্ষ লাল মাটির মাঝে মাঝে জুম চাষের খেত। কিন্তু এখানকার জমি ততটা রুক্ষ নয়, বরং লুঙ্গার মাটি নরম ও সমতল। এখানে পাহাড়ের মতো বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ করতে হয় না। লুঙ্গা জমিতে সারাক্ষণ জল লেগে থাকে। ভরতের লোকেরা এখনও পাহাড়ে গিয়ে জুম চাষ করে বটে কিন্তু তা বছরে একবার। তবে এখন সমতল ভূমিতে ধান চাষ করে ওরা তিনবার। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের হাজার বছরের যে সংস্কৃতি জুম চাষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে তা উপেক্ষিত হতে শুরু করেছে। পুরুষ মহিলারা এখন ধানের খেতে সারা বছর পড়ে থাকে। ফলনও হয় ভাল। তাছাড়া ওখানে টং ঘরের উপর বসবাস করত সবাই। কিন্তু এখানে এমন নয়। প্রতিটি বাড়িতে একটা আধটা টং ঘর আছে বটে শুকনো লাকড়ি রাখার জন্যে তবে নিজেদের থাকার ঘরগুলি সব বাঙালিদের মতোই স্থায়ী ঘর। এই ভরত চৌধুরী পাড়ার চারিদিকে দুটো চারটে বাঙালি পাড়াও আছে। ফলে আগে যে উপজাতি সংস্কার সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল ভরত চৌধুরীতে তা এখন আর নেই। এখন প্রতিরাতে এদিক ওদিকে কীর্তনের শব্দ, মনসা মঙ্গল, সূর্য বর্ত, বিয়ের ধামাইল সারারাত ধরে চলতে থাকে। চম্‌প্রেঙের মন মাতাল করা সুর এখানে আর খুব একটা শোনা যায় না। নির্জন পাহাড়ের কোন এক গাছের ডালে বসে অচেনা যুবকের জাদুকলিজা গানের সুরও খুবই বিরল শোনা যায়। জুম যেখানে উপেক্ষিত সেখানে জুমের সংস্কৃতিও ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাবে। পাহাড়িদের জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে দ্রুত, শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ছে। ঘরে ঘরে রেডিও, বাইসাইকেল ঢুকে মানুষের মন ও জীবনের গতি দুটিই বাড়িয়ে দিচ্ছে। রঘুর এই ভরত চৌধুরী পাড়াটা প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়নি। পাহাড়ের কোলে যে পাড়াটা ছিল সেটা ছিল গাঢ় সবুজ গালিচায় ঢাকা অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাণবন্ত।

অনেকটা পথ হেঁটে এসে ভরত চৌধুরী পাড়াতে ঢুকে গেল রঘু। পথ চলতি লোকদের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে গেল সে। একটা লোকও রাস্তায় পরিচিত খুঁজে পেল না। রঘু বুঝতে পারল এই পাড়াটা ভরত চৌধুরী হলেও তার অনেক মানুষ আজ আর এই পাড়ার সাথে নেই। ওরা অন্য কোথাও চলে গেছে। আবার

বেশ কিছু নতুন লোকও এই পাড়াতে এসে জুটেছে। অবশেষে বিনন্দ দেববর্মার বাড়িটা খুঁজে পেল রঘু। রাস্তায় বারবার বিভিন্ন মানুষের চোখা দৃষ্টির সামনে পড়েও অবশেষে আইচুকতির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। রঘুর চেহারাটা হঠাৎ শত সূর্যের আলোতে ঝলমল করে উঠল। যে দিনটার জন্য এতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা সেই দিনটা ছুঁতে পেরে রঘুর মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। নিজের চুল, শার্ট ও প্যান্টটা একটু ঠিকঠাক করে নিল। এই ঘরের ভেতরেই আইচুকতি আছে ভেবে রঘুর হৃৎস্পন্দন আরও দ্রুততর হল। কি অবাক চোখে আইচুকতি রঘুকে দেখবে সেটা ভেবেই তার মজা লাগল। অন্তত দু-চারটে দিন এখানে থেকে কলাবাগানে ফিরে যাবে সে।

আইচুকতির বাড়িতে কোন লোক নেই। অনেক ডেকেও কাউকে খুঁজে পেল না সে। পাশের বাড়ি থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, ওদের কেউ বাড়িতে নেই, কাজে গেছে। তাছাড়া আইচুকতি এখানে থাকে না, কোথায় থাকে তাও কেউ জানে না। তাহলে আইচুকতি ভরত চৌধুরী পাড়ায় নেই। সে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছে কেন? তাহলে কি আইচুকতি অন্য কাউকে বিয়ে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে? আইচুকতি এমন করতে পারে রঘুর কিছুতেই বিশ্বাস হল না। না আইচুকতি এমন করতেই পারে না। তাহলে কি আইচুকতি মারাত্মক কোন বিপদে পড়েছে? চারিদিকে যেমন করে ধরপাকড় চলছে, পার্টির লোকেদের নানা ভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে, তাতে চিন্তাটা অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আইচুকতির হৃদয়ে রঘু ছাড়া অন্য কারো উপস্থিতি থাকতে পারে এমন চিন্তাকে রঘু কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। পৃথিবীর সব কিছু মিথ্যে হয়ে যেতে পারে তবু আইচুকতি কখনোই রঘুর জীবন থেকে হারিয়ে যেতে পারে না।

রঘু হতাশ হয়ে ফিরে এল খোয়াই শহরে। পরদিন সকালে গিয়ে আবার এলোমেলোভাবে খুঁজতে লাগল সে। সে ভাবল হয়তো ভুল জায়গায় চলে এসেছে। আর একটু পরেই সবাইকে পেয়ে যাবে।

কিন্তু আইচুকতি গেল কোথায়? আইচুকতির চেহারাটা চোখ বন্ধ করলেই সামনে চলে আসে। কোথায় চলে গেল আইচুকতি? এটা ঠিক যে রঘুর উপর থেকে তার ভরসা চলে যাওয়ার কথা। দুবছর সময় চেয়ে পাঁচ বছর পর রঘু ফিরে এসেছে। কিশোরী থেকে যৌবনে পা দেওয়া একটা মেয়ের পক্ষে এই বয়সে নিজেকে সামলে চলা খুবই কঠিন। সামনে হাজারো প্রলোভন, সামাজিক পরম্পরা, বাধাবিপত্তি, সব মিলে নিশ্চয় অনেক কষ্ট দিয়েছে সে আইচুকতিকে। কিন্তু আইচুকতি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন? কি করে একা একটি মেয়ে নীরবে হারিয়ে যেতে পারে লোকচক্ষুর আড়ালে? নিজের উপর, নিজের ভাগ্যের উপর প্রচন্ড বিরক্ত হল রঘু। কেন বারবার তার সব স্বপ্ন নাগাল থেকে দূরে বহুদূরে একরাশ অনিশ্চয়তায় ডুবে যায়?

কি আশা নিয়ে এসেছিল রঘু এখানে? দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও বিরহের পর

আইচুকতির সাথে তার দেখা হবে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় এতদিন দুললেও রঘুর জীবন যন্ত্রণা শুনে আইচুকতি রঘুর সমব্যথী হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল কই? আইচুকতির কোন সন্ধান তো পেলই না, উল্টে হাজারো অপ্রিয় প্রশ্নের সামনে এসে সে দাঁড়াল। এখন একটি প্রশ্ন রঘুকে ভাবিয়ে তুলল, আইচুকতি কোথায়? এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও কোন সঠিক তথ্য না পেয়ে একটা গাছের নিচে বসে ভাবতে লাগল সে, এবার কি করবে?

হঠাৎ পুলিসের একটা দল রঘুকে সন্দেহ করে আটক করল। তার কাছে কিছু না পেয়ে রঘুকে জেরা করতে লাগল। এই এলাকার লোক না হয়েও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিসের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। ওরা সোজা পুলিস ভ্যানে তুলে রঘুকে থানায় নিয়ে গেল। টানা দুই তিন ঘন্টা জেরা করে রঘুর সাথে বামপন্থীদের যোগাযোগের একটা সন্ধান ওরা পেল। ফলে ওকে লক-আপে ঢুকিয়ে দুদিন রেখে কোর্টে চালান করে দিল।

থানা থেকে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে রঘুকে জেলে পাঠিয়ে দিল। জেলে তখন কম্যুনিষ্টদের অনেক নেতা আটক হয়ে আছেন। যাদের অনেকেই পুলিসি অত্যাচারে আহত বিপর্যস্ত। যাদের চিনের দালাল বলে গণহারে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। জেলের ভেতর একটা থমথমে ভাব। বন্দিদের চাপা ক্রোধে জেলের সেলগুলি যেন বারুদের উপর বসে রয়েছে বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। রঘু জেলে যে দল করার অপরাধে বন্দি হয়ে এল সেই দলের কেউই তাকে চিনতে পারল না।

একদিন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারের জন্য তাকে হাজির করা হল। মামুলি কয়েকটা প্রশ্ন করে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে খালাস করে দিলেন। জেল থেকে এক মাস পর বেরিয়ে আসার সময় তার চোখে জল এসে গেল। এক মাসের এই জেলের জীবন রঘুর প্রাণটাকে ছুঁয়ে গেল। জেলটা যেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একটা নির্দিষ্ট ছাদের নিচে নিয়ে এসেছিল। সবাইকে এতো কাছ থেকে চেনার, জানার এবং নিজেকে উপলব্ধি করার এই সুযোগ আর হয়তো কোনওদিন সে পাবে না। সবার মতামত শুনে নিজের একটা পথ তৈরি হয়, সবার দেখানো পথ দেখে নিজের পছন্দের একটা পথ পাওয়া যায়। রঘু যেন সেটাই পেয়ে গেল। সবাই তো আর সক্রিয় রাজনীতিতে আসতে চায় না। কিন্তু রঘুর মতো যারা নীরবে এই দলটার জন্য কিছু করে যেতে চায় তাদেরও অবদান বড় কম নয়। নাই বা মিলুক পার্টির স্বীকৃতি বা শিরোপা। সে তার তোয়াক্কাই করে না। জেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় নেতাদের আশীর্বাদ উপদেশ, চোর ডাকাতদের ভালবাসা, হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানানো, রঘু কখনোই ভুলতে পারবে না। এই এক নবজন্ম হল তার। জেলে যাওয়ার খেদটা তার আর রইল না, মনে হল এটা যেন তার কাছে আশীর্বাদ।'

পকেটে টাকা ছিল রঘুর। তবু খোয়াই থেকে সড়ক পথে সে পিকরাই যায়নি। কেন জানি না মহারাজগঞ্জ বাজারে এসে কয়েকজন পাহাড়ি ও বাঙালিকে

পেয়ে গেল যারা আশারামবাড়ি – বিদ্যাবিল হয়ে লাম্বুছড়া অব্দি যাবে। এক দুইজন রূপসপুরের যাত্রীও ছিল। ওদের ধারনা গাড়িতে গেলে একদিনে রূপসপুরে যাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে পায়ে হাঁটা পথ দুর্গম হলেও বিকেলের আগেই ওরা পৌঁছে যেতে পারবে, পয়সাও বাঁচবে। রঘু মোটরস্ট্যান্ড থেকে সোজা ওদের পিছু নিল।

এই দলটায় কুড়ি পঁচিশ জন লোক আছে। তাদের জাত পাত এক নয় বটে, তবে একটা জায়গায় ওদের খুব মিল। শ্রেণীগত দিক দিয়ে ওরা সবাই হয় মজদুর নতুবা কৃষক। চারিদিকে ফসলের সবুজ খেত পেরিয়ে ওরা পৌঁছে গেল পাহাড়ের ঢালে। নানা রকমের গল্প, গান, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে পুরো দলটা এগোতে লাগল। মাঝের কয়েকটা বছরে এই অগম্য পাহাড় যেন তার হৃদয় খুলে দিয়েছে মানুষের জন্যে। এখন আর ততটা নির্দয়, দুর্গম, নিষ্ঠুর মনে হয় না এই পাহাড়কে। সেই বটের দাড়ি দেখবে বলে ওরা যেমন পাহাড়ি এলাকায় পথ হারিয়েছিল, সেই রকমের দুর্গম পাহাড় যেন আবার উন্মুক্ত হচ্ছে রঘুর সামনে। পাহাড়ের এক অপরূপ সৌন্দর্য আছে দূর থেকে যা সহজে উপভোগ করা যায়। কিন্তু পাহাড়ের ভেতরে চলে এলে রূঢ় বাস্তবটা সামনে চলে আসে। ফলে সৌন্দর্যটা হারিয়ে যায় আগন্তুকের মন থেকে। কিন্তু রঘুর মনে হল পাহাড়ের অভ্যন্তরেও একটা আলাদা পরিবেশ আছে। একটা অচেনা অজানা জগৎ লুকিয়ে আছে। যারা এই অনুভবকে ছুঁতে পারে বাচ্চু চৌধুরীর মতো তারা এক অজানা মদিরায় আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে পাহাড় ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারে না। রঘুর মনে হল এই পাহাড়ের প্রতি সে নিজেও গভীর ভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। যখনি সে পাহাড়ে আসে তখনি তার ভেতরটা যেন উথাল পাথাল হয়ে যায়। কেমন এক অদ্ভুত টান রঘুকে বেসামাল করে ফেলে। নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারে না সে। এই টান যে অনেকটাই তৈরি হয়েছে আইচুকতির জন্যে সেটা রঘু বোঝে। এখন পাহাড় মানেই শুধু নৈসর্গ নয়, শুধু আইচুক নয়, পাহাড় তার ভালোবাসা, তার চেতনাও।

পিক্‌রাই বাজারে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাজারে ঘুরতে ঘুরতেই রণজিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রণজিৎ পিক্‌রাই বাজারে লাউ নিয়ে এসেছে বিক্রির জন্য। কিন্তু এতো বছর পর রঘুকে পেয়ে লাউ সবজি ফেলে সোজা এসে জড়িয়ে ধরল রঘুকে। রণজিৎ বয়েসে বড় রঘু ও তার বন্ধুদের চাইতে। তবু তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ঘাটতি ছিল না। রণজিৎ বিয়ে করে এখন পুরোমাত্রায় সংসারী। বাজারে সামান্য চা বিস্কুট খেয়ে ওরা বাড়ি চলে এল।

রাতের অন্ধকারে পুরানো কলাবাগানকে খুঁজে পেল না রঘু। মানুষের মধ্যে বাঘের ভয় আর নেই। এতো বাড়ি ঘর ও নতুন কাঁচা রাস্তা হয়েছে, কোন রাস্তা ধরে রঘু রণজিতের বাড়ি চলে এল বুঝতেই পারল না। স্কুলে যাওয়ার পুরোনো রাস্তা ধরে রূপসপুর গেলে আগে রণজিতের বাড়ি। কিন্তু পিকরাই বাজার থেকে ফিরলে আগে পড়বে সমর কুসুমদের বাড়ি। কিন্তু ছোট এই গ্রামটিও যেন এক

গোলক ধাঁধা।

রঘুকে দেখতে পেয়ে রণজিতের মা ও গ্রাম্য লাজুক বধূটি আপ্যায়নে ত্রুটি করলেন না। রঘু তার শার্ট, প্যান্ট ছেড়ে লুংগি পরে বারান্দায় রণজিতের সাথে গল্পে মজে গেল। এই গল্প যেন আর কোনোদিন শেষ হওয়ার নয়। উঠোন পেরিয়ে রান্না ঘর। রান্না ঘরের ব্যস্ত শব্দ সব কানে আসছে। আর এদিকে দুই বন্ধু মিলে শৈশবের সব স্মৃতি ফিরে ফিরে দেখছে। গল্পের মাঝখানেই ভাত চলে এল। কুপি বাতিটার সামনে বসে দুই বন্ধু মিলে তৃপ্তি ভরে খেয়ে নিল।

রঘুর কলাবাগানে ফিরে আসার খবরটা যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল। এ বাড়ির পিসিমা, ও বাড়ির কাকিমা, দিদা, ঠানদি, ছেলে পিলেরা ভিড় করতে লাগল রঘুকে দেখতে। একটু পরে রেণু ও সুজিত এলো। রেণু এসে বলল, 'কিরে আমাকে চিনতে পেরেছিস?'

রঘু হেসে বলল, 'তুই আগের মতোই ঘোড়ী হয়ে রয়েছিস রেণু? মানুষ আর হবি না?'

রঘুর কান ধরে রেণু বললে, 'বড়দের সম্মান দেওয়া এখনও শিখলি না বান্দর।'

'এই - সব কটার বিয়ে হয়ে গেল, তোর এখনও বিয়ে হয়নি কেন রে?'

'আমার বিয়ে? কি করে হবে? আমার মার খাওয়ার জন্য কে আসবে আমাকে বিয়ে করতে?'

'কেন আমি তো রাজি ছিলাম বললেই পারতিস?'

সবাই হা হা করে হেসে উঠল। রেণু রঘুর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'কুসুম আসবে আগামিকাল সকালে।'

কুসুমের প্রসঙ্গ আসতেই রঘুর ঝলমলে চেহারায় হঠাৎ ছায়া নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে বসে রইল রঘু। রেণু ডাকতেই চমকে উঠল সে। রেণু বুঝতে পারল ক্ষতস্থানে আঘাতটা আবার লেগেছে অনেকদিন পর। রেণু খোঁচা দিয়ে বলল, 'কিরে এখনও এতো জোরে লাগে বুকে?' রঘু হাসল।

'আমি যাব ওদের বাড়িতে। সকালে আমার বাড়িটা দেখতে যাব। সেখান থেকে চৌধুরী বাড়িতে ঢুকব।'

'বেশ তাই হবে।'

'তুইও থাকিস রেণু।'

'কেন? ভয় লাগছে এখন অন্যের বউ হয়ে গেছে বলে?' সবাই হাসল।

'ঠিক আছে তুই ক্লান্ত এখন ঘুমিয়ে পড়। আমরা আসছি।'

পরদিন সকালে ঝলমলে রোদ উঠেছে পুবের আকাশে। রণজিতের উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল। যদিও রণজিতের বউটি অনেক ভোরে উঠে বাড়ি ঝাড়পোছ করে, লেপে গোবর জল ছিটিয়ে দিয়ে এখন রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। রঘু উঠোন

থেকে হাঁক দিয়ে ডাকল রণজিতকে। রণজিৎ উঠতেই চা খেয়ে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে ধলাই নদীতে। ধলাইর বালুচরে এসে দুজনেই দাপাদাপি শুরু করে দিল। রঘুকে হঠাৎ একটা প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলে দিল রণজিৎ। তারপর এমন ভাবে ওকে চেপে ধরল কিছুতেই রঘু উঠতে পারছে না। পরিশ্রমী রণজিতের শরীর পেশি মজবুত, কিন্তু রঘুরও তো ভাল শক্তি ছিল। ওদের দলে কেউ রঘুকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস দেখাত না। হতে পারে মাঝখানের বছরগুলিতে তেমন শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যেস রঘুর ছিল না। রঘু হঠাৎ এক উল্টো প্যাঁচ মারতেই রণজিৎ আবার নিচে পড়ে গেল। তারপর দুজনে হাসতে হাসতেই দুজনকে ছেড়ে দিল। রণজিৎ হেসে বলল, 'দেখলাম দলনেতা হওয়ার ক্ষমতা তোর এখনও রয়েছে কি না?'

'কি দেখলি?'

'না ঠিক আছে চলবে।'

রঘু ও রণজিৎ নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে রঘু বলল, 'চল রণজিৎ বাম্বু দাসের আখ খেয়ে আসি।'

'চুরি করে?'

'হ্যাঁ।'

'চল।'

কিন্তু ওদিক থেকে আজ আর কোন প্রতিরোধ এলো না। রঘুদের পরে এতো দুষ্টু ছেলে বোধ হয় আর জন্মেনি এই গ্রামে। অথবা এতো সাহসী ডানপিটে ছেলেরও আকাল হতে পারে। বাম্বু দাস ও তার ছেলেপিলেদের একটা সময় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল রঘু ও তার দলের ছেলেরা। আখ চুরি করে, নষ্ট করে, মাঠের পর মাঠ ওরা ধ্বংস করে দিত। বাম্বু দাস ও তার ছেলেরা এখন নিশ্চয় খুব শান্তিতে আছে। তবে রঘুদের অভাবও ভীষণ অনুভব করবে। দুজনে দুটো আখ নিয়ে নদীতে আবার নিঃশব্দে নেমে এল। নদীতে চান করে দুজনে যেন ঝকঝকে শরীর মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। বালুচরে ওদের দু জোড়া পায়ের চিহ্ন শুকনো বালুতে স্পষ্ট ভেসে রইল। রঘু আবার শৈশবকে ছুঁতে পেরে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এতো সুখ আর কোথায় আছে এই গ্রাম ছাড়া। এতো দুঃখও আর কে দিয়েছে এই গ্রাম ছাড়া। তাই তো এই মাটি তার এতো আপন। এখানকার মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ তার অনুভবের সাথে মিশে যায়।

রঘুদের বাড়িটা আগাছায় ভরে গেছে। এমনকি ভিটিটা পর্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ। নারিকেল সুপারি গাছগুলির সাথে কিছু আম কাঁঠালের গাছ এখনও আছে বটে, কিন্তু বাহারি গাছগুলি সব মরে গেছে। রণজিৎ বলল, 'রঘু তুই আমাকে দায়িত্ব দিয়ে যা বাড়িটা পরিষ্কার করে আমি চাষাবাদ করব। ভাল ফসল হবে তোদের এই জমিতে। আমি ভাগেরটা রেখে বাকিটা তোকে পাঠিয়ে দেব।

'সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু কাকার জ্বালায় পারবি তো?'

'তোর কাকার আর আগের রমরমা নেই রঘু। তলানিতে এসে ঠেকেছে সব। তুই শুধু বলে যা দুজনকে সাক্ষী রেখে বাকিটা আমি সামলে নেব।'

'বেশ তাহলে তাই হবে।'

রঘু পুরোনো বাড়িটার উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই কে যেন ডাকল পেছন থেকে। অস্পষ্ট কিন্তু পরিষ্কার যেন রঘুর বাবা ডাকলেন। ক্ষণিকের জন্য থেমে গেল সে। এটা কি মনের ভুল, না সত্যি? রঘু ঘরের বারান্দা, রান্না ঘর, পড়ার ঘর, শোবার ঘর কোথায় ছিল খুঁজতে লাগল। স্মৃতিগুলি একের পর এক ভিড় জমাতে লাগল রঘুর মনে। এই তো এখানেই মা বসে মশলা বাটতেন। বাবা এই জায়গায় বসে অবসর সময়ে হুঁকো টানতেন। কুসুম আর রঘু এখানে বসে পড়ত। এই পড়ার ঘরেই কুসুম ও রঘুর অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কেটেছে বেশি। ভাবতে ভাবতেই শান্তিবাবুর শ্মশানের কাছে চলে এল রঘু। ঝুঁকে প্রণাম করল ঘাসে, আগাছায় ভরা, ক্ষয়ে যাওয়া মাটির বেদীকে। ইদানীং কোন দুঃখই আর বেশি নাড়া দেয় না রঘুকে। দুঃখ সইতে সইতে তার মধ্যে অদ্ভুত এক কাঠিন্য চলে এসেছে। কিন্তু আজ আর পারল না সে। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রঘু। আর তখনি পেছন থেকে নারী কণ্ঠে কে যেন ডাকল, 'রঘুদা-।'

চোখের জলটা সামলে রঘু ফিরে তাকাল। কুসুম তার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুসুমকে দেখে রঘুর সমস্ত শরীর থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। তার শ্বাস প্রশ্বাস অস্বাভাবিকভাবে বইতে শুরু করল। ঘাবড়ে গেল কুসুমও। রণজিৎ কুসুমকে দেখে ইচ্ছে করেই একটু দূরে সরে গিয়েছে। কুসুম এগিয়ে এসে ধরল রঘুকে।

'রঘুদা শরীর খারাপ লাগছে?'

'না না ঠিক আছে। আসলে আমার শরীরটা তেমন ভাল নয়। কিছুদিন জেল খেটে ফিরেছি তো।'

'জেল খেটেছিস?'

'হ্যাঁরে। আমাকে ফালতু থানায় ধরে নিয়ে গেল।'

'তোর গায়ে এতো মারের দাগ?'

'ঐ পুলিসেরই কর্ম।'

'ইস্‌ মা।' এই মারগুলি যেন কুসুমের গায়ে লাগল। ব্যথায় মুখ কোঁচকাল কুসুম। রঘুও চেপে গেল আইচুকতির কথা। 'চল কুসুম ফিরে যাই।'

'হ্যাঁ তাই চল।'

রণজিতের হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিল রঘু বাড়ির কাজের জন্যে। রণজিৎ রাজি না হলেও রঘু জোর করে টাকাটা দিল। তারপর কুসুমের সাথে চৌধুরী বাড়িতে ফিরে এসে বসল। একসময় গমগম করা চৌধুরী বাড়িটা এখন একদম ফাঁকা। কুসুমের কাকা আগরতলা শিফ্‌ট করেছেন দুবছর আগে। পিসিদের সব বিয়ে হয়ে গেছে, এখন কুসুমের মা বাবা ছাড়া কুসুমের দাদু মহিম চৌধুরী থাকেন এই বাড়িতে। রঘুকে দেখে সরোজিনী এগিয়ে এসে কুশল বিনিময় করলেন।

তিনি রঘুর উপস্থিতিতে খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। ফলে প্রথমেই সামান্য তাল কেটে গেল।

কুসুম রঘুকে ঘরে একা বসিয়ে চলে গেল। কুসুমের এই সামান্য অনুপস্থিতিতেও অধৈর্য্য হয়ে পড়ল রঘু। কি কি বিস্ফোরণ রঘুর জন্য অপেক্ষা করে আছে কে জানে। তরুবালার কথা, কুসুমের কথা সব শোনার জন্য তার আর তর সইছিল না। তাছাড়া এখানে দীর্ঘ সময় বসে থাকাটাও যেন কেমন অস্বস্তিকর। কুসুমকে দীর্ঘদিন পর পেয়ে ভাল লাগছে। কিন্তু অসুবিধেও হচ্ছিল তার চেয়ে বেশি। কিছুতেই নিজেকে সহজ করে নিতে পারছে না রঘু। যতই স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে ততই ধরা পড়ে যাচ্ছে। এখনও কুসুমের পতিদেবের সাথে দেখা হয়নি। উনি বড়লোক - আবার শিক্ষকও বটে। এসেই হয়তো অবজ্ঞাভরে রঘুর সবরকমের দরিদ্রতার দিকে তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকাবেন। রঘু প্রায় উঠতেই যাবে তখনই ছবিটার দিকে চোখ আটকে গেল। কুসুম ও রঘুর সাদা কালো জয়েন্ট ফটো। ছবিটা কৈশোরের। চড়ক মেলায় গিয়ে ওরা আমতলী বাজারে একটা স্টুডিওতে ফটো তুলেছিল।

অন্যদিকে কাঠের শো-কেসে কুসুম ও তার স্বামীর ছবি। নবপরিণীতা কুসুমকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা ছবি। শো-কেসের উপরে সিঁদুরের কৌটা, চিরুণি ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী। এদিকে ওদিকে ঠাকুর দেবতার ক্যালেন্ডার ছড়িয়ে আছে। কুসুমের মার হাতে সেলাই করা একটা বাণীও বাঁধানো আছে দেওয়ালে। 'সূর্য বিনে আলো নাই। পতি বিনে গতি নাই। নারীর জীবনে। সরোজিনী।' রঘু প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখছে এই কারণে যে এই পছন্দ অপছন্দের মধ্যেই মানুষের মনটা লুকিয়ে থাকে। যে কুসুমকে রঘু চিনে তার নিজের কোন আলাদা ঘর ছিল না।

হঠাৎ পর্দা ঠেলে কুসুম ভেতরে এল। ওর দু হাতে খাবারের প্লেট। এই খাবার তৈরি করা স্বল্প সময়ের কাজ নয়। রঘু ফিরেছে খবর পেয়ে নিশ্চয় কুসুম এতগুলি আইটেম রেডি করেছে। ঘরে কাঠের একমাত্র চেয়ারে রঘু বসেছিল। উল্টো দিকে কুসুম বিছানায় বসল মুখোমুখি। কুসুম বসেই স্বভাবসুলভ ভাবে হাসল।

কুসুম আগের চাইতে মোটা হয়ে গেছে। তবে ওর চেহারা ও স্বাস্থ্যে আভিজাত্য ফুটে উঠেছে প্রবলভাবে। আগের ছিপছিপে পাতলা ইষৎ চঞ্চল মেয়েটি কুসুমের মধ্যে মরে গেছে। এখনকার কুসুম অনেক ধীর স্থির হিসেবি। রঘুর কেমন যেন অপিরিচিত মনে হচ্ছিল কুসুমকে। তাছাড়া শান্তিবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে স্বেচ্ছায় কুসুম থেকে দূরে সরে গিয়েছিল সে। ফলে মাঝখানের দিনগুলিতে দূরত্ব যে অনেক বেড়েছে আজ কাছে এসে স্পষ্ট বুঝতে পারল।

কোত্থেকে কথা শুরু করবে, কি বলবে কুসুমকে যেন কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না। তাছাড়া কুসুমের সামনে এসে ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেল সে। কথা বললেই হয়তো তার তোতলামি এসে যাবে। ফলে নীরবে কুসুমের দেওয়া খাবারগুলি মাথা

নুইয়ে খেতে লাগল সে। নীরবতা ভাঙল কুসুম, 'কেমন আছিস, রঘুদা?'

আচমকা প্রশ্ন শুনে রঘু তাকাল, একটা যুতসই উত্তর কি দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। কুসুম আবার প্রশ্ন করল, 'তোর রেজাল্ট আউট হয়ে গেলে কি করবি?'

এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া অনেক সহজ। তাই ঝটপট উত্তর দিল রঘু। 'এখনো কিছু ভাবিনি।'

'বরুণদার কাছ থেকে তোর খবর আমি পেয়েছি। আমার স্বামীকে বলেছিলাম তোর সাথে দেখা করব। কিন্তু শরীরটা হঠাৎ এতো খারাপ করল ফলে আর যাওয়া হয়নি।'

'কি হয়েছিল তোর কুসুম?'

'সে অনেক রোগ, ভাল হয়ে উঠব সে আশা আমার মা বাবাও করেনি।'

'এখন সুস্থ হয়ে উঠেছিস তো?'

'এই আছি। তবে তোর সাথে যখন দেখা হয়ে গেল তখন এবার সত্যি বলছি ভাল হয়ে উঠব।'

'তোর পতিদেবকে দেখছি না। উনি বাড়ি নেই?'

'উনি তো এখানে নেই – পানিসাগরে। দুয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো আবার ফিরবেন।'

রঘু যেন জোর বাঁচা বেঁচে গেল। একটু হেসে বলল, 'তোর ছেলে?'

'ঘুমোচ্ছে। সে ওর বাপের মতোই হবে। অলস। সারাদিন বাপ ব্যাটা মিলে শুধু ঘুমোতেই পছন্দ করে।'

'তোর ছেলেকে একটু দেখাবি?'

'ঘুম থেকে উঠুক, তারপর দেখবি। এখন তোর কথা বল, কেমন আছিস?'

'এই তো চলে যাচ্ছে।'

'আরও পড়াশোনা করবি, না এবার চাকরি নিবি?'

'বাঁচার জন্য একটা চাকরি তো নিতেই হবে। তবে আগে রেজাল্ট দেখে তারপর ভাবব পড়াশোনা আর করব কিনা।'

'বিয়ে থা করবি না?'

'এখনো কিছু ভাবিনি। তবে এবার মা'র কাছে যাব। মার সাথে বসে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবব।'

'আইচুকতির সাথে দেখা হয়েছে তোর?'

কথাটা শুনে সাংঘাতিক চমকে উঠল রঘু। আইচুকতির কথাও কুসুম জানে? রঘু কুসুম থেকে দুরে সরে যেতে চাইলেও কুসুম রঘুকে দুরে সরিয়ে দেয়নি। রঘু হেসে বলল, 'বরুণ তাহলে তোকে কিছুই গোপন করেনি।'

'কি করে করবে আমি তো ওকে উকিলের মতো জেরা করতাম। তা আইচুকতিকে অবশেষে পেয়েছিস?'

'নাহ্। আইচুক কোথায় চলে গেছে। তার বাড়িতে গিয়েও তার কোন

সন্ধান আমি পাইনি। আজ প্রায় পাঁচ বছর হল তার সাথে আমার দেখা হয়নি।'

'সে কিরে! কোথায় গেল মেয়েটা?'

'আমি জানি না।'

'মেয়েটাকে হিংসে করতাম আমি। কিন্তু এখন দেখছি সে আমার চাইতেও কপালপোড়া। আমি সারাটা জীবন তপস্যা করেও তোকে পাইনি। আর এই মেয়েটা তোকে পেয়েও ধরে রাখতে পারল না।'

'এসব কথা থাক কুসুম। মা'র চিঠিগুলি আমাকে দে।'

'পিসিমার চিঠিগুলির জন্যই এসেছিস তুই আমি জানি। আচ্ছা রঘুদা আমাকে এতোদিনে একবারও তোর দেখার ইচ্ছে হয়নি?'

'তোর কি মনে হয়?'

'তোকে ভীষণ অপরিচিত লাগছে। যেন কিছুতেই আগের তোকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

কুসুমের ছেলেটাকে নিয়ে কুসুমের মা ভেতরে এলেন। ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি তখন ভয়ঙ্কর চিৎকার করছে। কুসুম ওকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে বলল, 'তুই বোস রঘুদা, আমি ওকে একটু ঠান্ডা করে নিই। ঘুম থেকে উঠে আমাকে পায়নি তো, তাই মেজাজ করছে।'

সরোজিনী এসে বসলেন রঘুর পাশে। হেসে বললেন, 'কেমন আছিস রে রঘু?'

'এই আছি মামি, কোনরকমে চলে যাচ্ছে।'

'তোদের রান্নাবান্না কি ঐ পাগলীটাই করে?'

রঘু একটু অবাক হয়ে তাকাল 'পাগলী' কথাটা শুনে। ঐ শব্দটা উচ্চারণের সময় সরোজিনীর মুখে এতো তাচ্ছিল্য ছিল রঘুর ভালো লাগেনি। রঘু হেসে বলল, 'হ্যাঁ মামি, আমরা একসাথেই রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করি।'

'এই রাস্তার পাগলীটাকে কেন ঘরে তুললি বাপু? মানুষ কি বলবে কে জানে?'

রঘু অসহায় চোখে তাকাল। সরোজিনী কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হ্যাঁরে রঘু, তুই নাকি আগরতলায় রিক্সা চালাতিস?'

'হ্যাঁ গো। আমি প্রায় দুই বছর রিক্সা চালিয়েছি আগরতলায়। তারপর মানুষের বাড়ির কাজ, হোটেলে বয়ের কাজ সব করেছি। তাছাড়া টাকার অভাবে গোলবাজারে দোকানের বারান্দায় বিহারি শ্রমিকদের সাথে শুয়ে কাটিয়েছি।'

'আমি সব শুনেছি। কিন্তু এসব কাজ তুই করতে গেলি কেন?'

'কি করব মামি ভাল কাজ করার কোন যোগ্যতা যে আমার ছিল না।'

'ছিঃ ছিঃ রঘু। তুই এতো মেধাবী ছেলে এসব কাজ না করলেও পারতিস। জমিদার বংশের ছেলে হয়ে তুই বংশের নাক কেটে দিলি?' রঘু হাসল। তার আত্মবিশ্বাসী হাসি দেখে সরোজিনীর যেন পিত্তি জ্বলে গেল।

'দেখ রঘু তোর এতোই যদি টাকার অভাব থাকতো তোর মা'র কাছ থেকে নিলেই পারতি। তোর মা তো এখন যাত্রা দলে কাজ করে ভাল টাকা রোজগার করেন।'

একটা 'শপাং' করে চাবুকের ঘা খাওয়ার মতোই যেন ভেতরটা জ্বলে উঠল রঘুর। মা যাত্রা দলে কাজ নিয়েছেন! কেউ যেন 'ছ্যাৎ' করে এক কড়াই টানটান গরম তেল তার কানে ঢেলে দিল। রঘুর মাথাটা যেন ভোঁ - ভোঁ করে ঘুরতে লাগল। কুসুম ঘরে এসে সরোজিনীর সাথে তর্ক জুড়ে দিল। রঘুর কান দিয়ে তখন আর কিছুই ঢুকছে না। নিজেকে দ্রুত সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল রঘু। তার চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। নিজে অনেক উত্থান পতন সয়েছে জীবনে। ফলে নিজেকে সামলাতে তার বিশেষ সময় লাগেনি। সে হেসে বলল, 'টাকার অভাব তো আমার ছিল না পিসিমা। দেশে আমাদের যে প্রপার্টি এখনও আছে, তার কেয়ারটেকার মসন্দর চাচা প্রতিমাসে দু হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। আমি সেই প্রস্তাবে রাজি হইনি।'

'দু-হাজার টাকা। তুই রাজি হোসনি কেন?'

'ঐ টাকা পেলে আমি হয়তো ধনবান হতাম কিন্তু মানুষ হতে পারতাম না। তাছাড়া আমার বাবা, আপনার স্বামী সবাই এই পাড়ে এসে কি করে সংসার চালিয়েছে আপনি হয়তো ভুলে গেছেন। এগুলি আবার মনে করবেন তাহলে রিক্সা চালানোটা মোটেই নীচু কাজ মনে হবে না।' সরোজিনী কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে উঠে চলে গেলেন। রঘুও উঠে দাঁড়াল।

'কুসুম আমি আজ উঠি; বিকেলে আগরতলা যেতে হবে।'

'সেকি! তোর সাথে কোন কথাই তো হল না। এসেই চলে যাবি?'

'নারে মাথাটা ধরেছে। শরীর ভালো লাগছে না।

'তোর আজ ফেরা হবে না রঘুদা। বিকেলে আমি রেণুর বাড়ি যাব। তুইও ওখানেই থাকবি। আমি অন্য কোন কথাই শুনব না।'

'মা'র চিঠিগুলি দিবি কুসুম?'

কুসুম সুতো দিয়ে বাঁধা চিঠিগুলি রঘুর হাতে দিল। রঘু ঝোলানো ব্যাগে চিঠিগুলি রেখে কুসুমের ছেলেকে কোলে তুলে নিল। কি ভারি ছেলেটা! তবে খুব মিষ্টি দেখতে, তার নাম সাগর। মার বুকের অমৃত খেয়ে বেচারা এখন খুশি। বছর তিনের ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে রঘুর যেন অদ্ভুত এক তৃপ্ত হল। কুসুম হেসে বলল, 'ওকে আশীর্বাদ করিস যেন তোর মতো মানুষ হয়।'

রঘু হেসে বলল, 'তাহলে আজ আসি কুসুম।'

'না আজ আসি নয়, এখন যাচ্ছ যাও, বিকেলে দেখা হবে। আমার কথাগুলি তোকে বলতে হবে রঘুদা। আর তোর কথাগুলিও আমাকে জানতে হবে।'

রেণুদের বাড়িতে কুসুম আগে থেকে গিয়ে বসে বসে রঘুর জন্য অপেক্ষা

করছিল। রণজিতের ঘরে খেয়ে রোদটা মরে যাওয়ার পর রঘু রেণুর বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় পড়ল শৈশবের 'ডাংডুং' খেলা কাঠগোলাচি ফুলের গাছ। ডাংডুং ভাইয়ের নাগাল এড়িয়ে ধুপধাপ ওরা গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কতো ঘটনা, স্মৃতি, এই গ্রামের রাস্তায় মাঠে ঘাটে এখনও ছড়িয়ে আছে। রঘুর মনে হয় যেন এই তো সেদিনের কথা। সামনেই কৃষ্ণচূড়া গাছটি, যার নিচে দাঁড়িয়ে কুসুম প্রথম জানতে চেয়েছিল, রঘু সত্যিই কুসুমকে নিয়ে ভাবে কি না। আর সেই রাধা বোষ্টমী নেচে গেয়ে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে তাদের গল্পের নেশা ধরানো আমেজটাই মাটি করে দিয়েছিল। রঘু মনে মনে ভাবল, কুসুমের রঘুর প্রতি টানটা আরও তীব্র হয়েছে ইদানীং। রঘুকে না পাওয়ার জ্বালাটা এখনও ভুলতে পারেনি সে। স্বামী সন্তান নিয়ে তার ভরা সংসার অথচ তারপরও কুসুমকে দেখলে আজও বড্ড কাঙাল মনে হয়।

রেণু, কুসুম ছাড়াও রেণুর বৌদি মিলে তখন জমাটি আড্ডা চলছে। রঘু দরজায় এসে দাঁড়াতেই রেণু ডাকল। রেণুর বৌদি চা আনতে চলে গেলেন রান্না ঘরে। রেণু বলল, 'কুসুম - তোর রঘু এল।'

কুসুম হেসে বলল, 'তাই তো দেখছি।'

'তাহলে দেরি কেন হিসেব মিটিয়ে নে।'

'আসলে যে তিনজন পুরুষের সাথে মেয়েদের নাড়ির বাঁধন থাকে আমার ক্ষেত্রে তিনটাই ওর দখলে।'

'মানে?'

'যেমন ভাই, পতি এবং পিতা এই তিনটি পদ সে গায়ের জোরে দখল করেছিল। বাড়িতে একা একা বসে ভাবি কি শাসনটাই না সে আমাকে করতো বাবা।' রেণু কি বুঝল কে জানে, তবে রঘু বুঝল কুসুমের মনের কথাটা। কুসুম বলতে লাগল, 'তাদের বাড়িতেই তো খেয়ে পরে বড় হয়েছি, অথচ তাদের বিপদের দিনে কিছুই করতে পারলাম না। এই দানবটা আমার সব অধিকার হরণ করে নিয়ে গেল। আমি বলি কি রঘুদা তুই যদি এখনও বলিস আমি ঘর সংসার, স্বামী সন্তান সব ছেড়ে তোর সাথে চলে যাব।'

রেণু এক চিৎকার দিয়ে বলল, 'এই তোর মনোবাসনা কুসুম?'

'হ্যাঁ। তুই জিজ্ঞেস কর রঘুদাকে সে রাজি কিনা?'

'কিরে রঘু তুই রাজি তো?'

রঘু বলল, 'কুসুম তুই আগে চঞ্চল ছিলি বটে তবু অনেক লাজুক ছিলি। কিন্তু বিয়ের পর তোর মুখের খিল্ আলগা হয়ে গেছে। যা মুখে আসে তাই বলছিস। যদিও অধিকাংশ লাজবতী মেয়েরাই বিয়ের পর এমন হয়ে যায়।'

'আমার কথাটা এড়িয়ে যাবি না।'

'হ্যাঁ রঘু, কুসুমের প্রস্তাবটা তুই মেনে নিবি কিনা বল?' রেণু জিজ্ঞেস করে।

রঘু বলল, 'এই তোর বরকে আমি সবকিছু বলে দেব।'

'ওসব ছাড় কুসুম। রঘুর কথা আগে শুনি। রঘু তোর কথা বল, পাহাড়ি মেয়েটা কি যেন নাম?'

কুসুম ঝটপট উত্তর দিল, 'আইচুকতি'।

'হ্যাঁ আইচুকতির সাথে তোর কি করে ভাব হল?' রেণু জানতে চাইল।

'প্লীজ রেণু ওর প্রসঙ্গটা থাক।'

'কেন ও কি মোমের পুতুল যে নাড়াচাড়া করলে ভেঙে যাবে?

কুসুম এতো রাগ দেখিয়ে কথাটা বলল মনে হবে যেন আইচুকতির সাথে একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছে তার। কুসুমের অর্থহীন আচরণের মধ্যে একটা পাগলামি বারবার ফুটে উঠছে। ওর বেপরোয়া কথাবাতা রেণুকেও মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে।

রেণুর বৌদি চা ও সুজি করে নিয়ে এলেন। রঘু নিজেকে গড়তে এবং পয়সা বাঁচাতে গিয়ে না খেয়ে, কম খেয়ে থাকলেও বাইরের খাবার খেতে কোন কার্পণ্য করে না। ফলে সবটা সুজি প্লেট থেকে চেটেপুটে খেয়ে নিল সে। তারপর কুসুম দেরি না করে নানান বাহানা দেখিয়ে ঝটপট রঘুকে নিয়ে রেণুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

গোধূলির আকাশে সূর্যের শেষ রক্তিম আভা নৌকার রঙিন পালের মতো আটকে আছে। পাড়াটার পূর্বদিকে উত্তর বাহিনী নদী ধলাই। যা কলাবাগান সহ সারা কমলপুরের হৃদয় ছুঁয়ে ওপাড় বাংলায় হারিয়ে গেছে। কুসুম ও রঘু কথা বলতে বলতে নদীর পাড়ে চলে এল। রঘু জিজ্ঞেস করল, 'কিরে কুসুম, তুই এখন যেন আরও ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছিস?',

'আমি তো এমনই। তবে এটা ঠিক তোকে দেখার পর থেকে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না।'

'কেন?'

'তোর প্রত্যাখান আমি এখনও মেনে নিতে পারিনি রঘুদা। কি কষ্ট পেয়েছি আমি তোকে বলে বোঝাতে পারব না। আর অকারণে অনেক কষ্ট দিয়েছি নিজেকে, আমার পতিকেও।'

'এটা তোর বাড়াবাড়ি কুসুম।'

'আমি বুঝি, তবুও নিজেকে সংশোধন করতে পারি না যে।'

'তুই কতো ভাল মেয়ে কুসুম, আর এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারবি না?'

'সবই পারব, যদি একটি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই।'

'কি প্রশ্ন?'

'খুব ভেবে উত্তর দিবি কিন্তু, কারণ এই যে আমি বেঁচে আছি কেন জানিস? শুধু মরতে পারি না বলে। স্বামী সংসার কিছুতেই আমার মায়া নেই। শুধু ছেলেটা

এসে আমায় বেঁধে ফেলেছে। বেঁচে আছি একটা লোভে কারণ আমি জানি তুই এখনও আমার – শুধুই আমার। যেদিন অনুভব করব তোর অস্তিত্ব আমাকে আর নাড়া দেয় না সেদিন ঠিক ভুলে যাব তোকে।'

'তোর প্রশ্নটা বলিসনি।'

'ও হ্যাঁ। আচ্ছা রঘুদা কেন প্রত্যাখান করেছিলি তুই আমাকে? কি অপরাধ ছিল আমার? কেন আমাকে এমন নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলি তুই?'

রঘু অবাক হয়ে তাকাল কুসুমের দিকে। কুসুম এখন অনেক পরিণত, বর্তমানটা কি সে ভালোই বুঝতে পারে। তবু কৈশোরের আবেগ থেকে এখনও সে মুক্ত হতে পারেনি। ওকে কি উত্তর দেবে রঘু? যা খুশি একটা বলে দিলে কুসুম ছাড়বে না। সে যথেষ্ট সিরিয়াস। রঘু তখন হাসতে শুরু করল। কারণ পালিয়ে যাওয়া ছাড়া রঘুর কাছে আর কোন পথ খোলা নেই।

'তুই হাসছিস কেন রঘুদা?'

'আমি অত্যন্ত সাধারণ মানের ছেলে কুসুম। কোথায় তুই আর কোথায় আমি। মামি বললেন না রিক্সা চালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছি। এভাবে তুই বাঁচতে পারতিস?'

'কেন পারব না? আমাকে দুর্বল অযোগ্য ভেবেছিলি?'

'না তা নয়।'

'তাহলে?'

'তুই তো এখনও ফুলের পাপড়ির মতো মোলায়েম, কোমল, সতেজ। তোর জীবনে কঠোর আঘাত আসুক আমি চাইনি।'

'সত্যি কথাটা আমাকে বল তুই রঘুদা। না হলে মরে গিয়েও জীবনে শান্তি পাব না। এই একটা প্রশ্নের উত্তর আমি আজও খুঁজে পাইনি।'

'কেন মিথ্যে জেদ করছিস কুসুম? তোকে আমার নিজের করে না পাওয়া আমার জীবনের সবচাইতে দুর্ভাগ্য। তুই হয়তো ভাববি আমি মজা করছি, তবু সত্যি বলছি আমার এখনও সবচাইতে দুর্বল জায়গাটা তুই, কুসুম।'

'আমি জানি। বরুণদা আমার কুৎসা করেছিল বলে তুই ওকে ধমকেছিলি, বলেছিলি ওকে অনেক কিছু।'

'বরুণ সব বলেছে তোকে?'

'হ্যাঁ।'

'তোকে না পেয়ে কতো রাত একা একা আমি কেঁদেছি তোকে বলে বোঝাতে পারব না। অন্তত দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি।'

'রঘুদা!'

'কিন্তু সফল হইনি শুধু তুই ও মা'র কথা ভেবে। সান্ত্বনা পাওয়ার মতো, বেঁচে থাকার মতো চোখের সামনে। তবু একটা কথা ভেবেই ভালো লাগতো যে নিজের সর্বকিছু হারিয়েও আমি তোকে সুখি করতে পেরেছি। আমি সত্যি মনে

প্রাণে তোকে ভালবেসেছিলাম কুসুম। তোর মঙ্গল ছাড়া জীবনে কখনো কিছু ভাবিনি।'

কুসুমের চোখ ছলছল করে উঠল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মানুষকে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির এই আড়ালটাই যেন খুঁজছিল কুসুম। আচমকা নিবিড়ভাবে রঘুকে জড়িয়ে ধরল সে। রঘুর বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, 'আমি তোকে হারাতে চাই না রঘুদা। তোর জীবনে যে কোন মেয়ে আসুক তুই শুধুই আমার। আমার জায়গাটা তুই আর কাউকে দিবি না বল।'

রঘুর ভালো লাগছিল বটে তবে লজ্জাও লাগছিল। কুসুম আর আগের পনের বছরের মেয়েটি নয়। ওর শরীর এখন আনকোড়া মেয়েদের ভাষায় কথা বলে না। রঘু বলল, 'চল কুসুম।'

'না আমি তোকে ছাড়ব না। আগে আমাকে কথা দে।'

'কি কথা?'

'ঐ যে বললাম তুই শুধুই আমার।'

'তোর আমার সম্পর্ক একই রকম থাকবে।'

দুজনে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। কুসুম রঘুর একটা হাত ওর বুকে চেপে ধরে বলল, 'আমার হার্টবিট পাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'দেখ এখনও আমার হৃদয় শুধু তোর কথাই বলে।'

'পাগলামি ছাড় কুসুম কেউ দেখে ফেলবে।'

'একটু পাগলামি করতে দে না রঘুদা, আত্মাটা জুড়িয়ে নেই। কতোদিন পর আমার কাছে তুই ফিরে এলি। আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত সুখ তোর সাথে আমার কাছে ফিরে এসেছে।'

'তোর পতিকে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল।'

'হাঁদারাম। বয়েসটা যেমন বেশি তেমনি গোবর গণেশ। চাকরি আর ব্যবসা ছাড়া কিছুই বোঝে না।'

'তোকে ভালোবাসে তো?'

'কি জানি, জানি না। তবে তোর কথা আমি সব বলেছি ওকে।'

'কেন?'

'ওকে লুকানো ঠিক হোত না। যাই হোক পতি তো। আমি ওকে বলেছি, রঘুদা চাইলে আমি তোমাকে ছেড়ে ওর কাছে চলে যাব।'

'ছিঃ ছিঃ কুসুম।'

'সে কি বলে জানিস?'

'কি বলে?'

'না বলবো না।'

রঘু হাসল, কুসুমও হাসল। কারণ ছাড়া দুজনেই হাসছে ওরা। প্রাণখুলে

ওদের হাসতে ইচ্ছে করছে আজ। অনেক দিনের অবিশ্বাস মলিনতা প্রতিটি হাসিতে যেন ঝরে পড়ল।

অন্ধকারে জোনাকিরা আলো দিয়ে ওদের চারপাশে ঘুরছে। সূর্যহীনা এই পৃথিবীকে আলো দেওয়ার দায়িত্ব ওদের কে দিয়েছিল? ওদের ক্ষীণ আলোকে আশপাশটা আলোকিত হল কি না কে জানে। তবে হাজার রঙে রাঙিয়ে গেল কুসুমের মন। নীরবতা ভাঙল কুসুম, 'চিঠিগুলি পড়েছিস রঘুদা?'

'না রে আগরতলা গিয়ে পড়ব।'

'পিসিমা আর আগের মতো নেই। অনেক বদলে গেছেন তিনি।'

'কেমন?'

'পিসিমার বড় ভাই মানে ওনার মেজদা তো একটা যাত্রা দলের মালিক। তিনি পিসিমাকে একাকিত্ব ঘুচানোর জন্য যাত্রা দলে অভিনেত্রী হিসেবে ঢুকিয়েছেন।'

'ভালোই তো।'

'এ পর্যন্ত ভালোই ছিল। কিন্তু তোর মামারা এখন পিসিমার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। পিসিমার ইচ্ছে নেই তবু শেষ পর্যন্ত কি হয় কে জানে।'

রঘুর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। কুসুমের কথাগুলি যেন বিষমাখা তীরের মতো রঘুর দুটি কান জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সমস্ত ভালোলাগা আচমকা জল হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেল রঘু।

'কি হল রঘুদা?'

'না কিছু না।'

'পিসিমার কথা শুনে মন খারাপ করছিস? এসব আমি অনুমান করে বলেছি। চিঠিগুলি পড়ে দেখ এখানে সবকিছু স্পষ্ট লেখা থাকবে।'

'কুসুম প্লীজ মা'র প্রসঙ্গে আর কোন কথা নয়।'

'তাই ভাল। হ্যাঁ এখন বল কবে চলে যাচ্ছিস আগরতলা?'

'আগামিকাল সকালে।'

'কেন এত তাড়াহুড়ো? আরও দুটো দিন থেকে যা না।'

'না রে একদম সময় নেই হাতে। অনেকদিন হয়ে গেল আগরতলার বাইরে আছি। চাকরিটা আছে কি না কে জানে? তাছাড়া পাগলীটা কেমন আছে বলতে পারব না। তুই শ্বশুরবাড়ি কবে যাচ্ছিস?'

'যাব, যদি যেতে ইচ্ছে হয়।'

'মানে? শোন কুসুম পাগলামি করিস না। এখানে পড়ে না থেকে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কর্তাকে সামলা।'

'তোর জন্যই তো পড়ে আছি মাটি কামড়ে, তোর সাথে দেখা হওয়ার লোভে।'

'ওহ তাই।'

'আসলে পিসিমার চিঠিগুলির কথা লিখেই বুঝেছিলাম তুই এবার নির্ঘাৎ

আসবি।'

'আমি এখন আসি কুসুম।'

'সেকি চলে যাবি?'

'যাব না?'

'না। তোকে ছাড়তে মন চাইছে না। তারায় ভরা এই মিষ্টি আকাশ, জোনাকীর মৃদু আলোয় আমি যেন তোকে জীবনের সবচাইতে কাছে পেয়েছি আজ। তুই আবার কবে আমার সাথে দেখা করবি রঘুদা?'

'সে তো জানি না।'

'না তোকে কথা দিতে হবে প্রতি বছর পুজোতে এই গ্রামে চলে আসবি। আমিও আসব।'

'ঠিক আছে কথা দিলাম।'

'এভাবে নয় আমার মাথা ছুঁয়ে বল।'

'এসব কি ছেলেমানুষি করছিস কুসুম।'

কুসুম রঘুর হাত ওর মাথায় নিয়ে বলল, 'এই তো আমার মাথা ছুঁয়ে কথা দিলি।'

'তুই সেই ছোট্ট মেয়েটাই রয়ে গেলি এখনও।'

'বরুণদার কাছ থেকে তোর ঠিকানা আমি পেয়েছি। আমার ঠিকানা আমি তোকে দেব রঘুদা, নিয়মিত কিন্তু চিঠি লিখতে হবে।'

'এবার ঘরে যা - মামিকে ঐ যে দেখা যাচ্ছে।'

'রঘুদা।' কুসুমের চোখ জলে ভরে গেল।

'কুসুম তুই এতো উতলা হয়ে গেলে আমিও যে দুর্বল হয়ে পড়ব।'

'আমাদের পথ আজ দুই দিকে আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু হৃদয় আরও কাছাকাছি এসেছে রঘুদা। এটা অনুভব করিস?'

'হ্যাঁ করি কুসুম।'

'তাহলে যারা বলে বিয়ে না হলেই প্রেমটা মরে যায় তারা যে ভুল বলে তা বুঝিস তুই? আমি তোকে ছাড়া বাঁচতে পারব না রঘুদা। আমার সংসারেও অনেক জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে তোকে বলে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তবু যেটুকু টাটকা মুক্তির বাতাস আমি পাই তা ঐ তোর কথা ভেবেই। তুই আমাকে আর ঠকাবি না বল? আমি ডাকলে সাড়া দিবি তো?'

'কেন দেব না?'

'আমি খুব খুশি হয়েছি রঘুদা। তোর জন্য আরও কাঙাল হয়ে গেলাম।'

'এবার আমি আসি কুসুম। মামি এদিকেই এগিয়ে আসছেন।'

'দাঁড়া তোকে আরও একটু দেখি। আবার কবে দেখা হবে কে জানে।'

কুসুম হাঁ করে তাকিয়ে রইল রঘুর দিকে। যত দেখছে সে রঘুকে ততই যেন মুগ্ধ হচ্ছে। মনে মনে ভাবল, কুসুমের ভালোর জন্যে হলেও বা রঘু তাকে

ভয়ানকভাবে বঞ্চিত করেছে। আর কি কাউকে কুসুম মন দিয়ে কখনো ভালবাসতে পারবে? কুসুম দুহাতে রঘুর মুখটা নিজের সামনে টেনে নিয়ে এল। রঘু শুধু আস্তে করে বলল, 'কুসুম!' কুসুম নিজের ঠোঁটে সজোরে চেপে ধরল রঘুকে। রঘু কুসুমকে আবার ডাকল, 'কুসুম ঘরে চল।'

কুসুম এবার ছেড়ে দেয় রঘুকে। নিজেকে রঘুর বড্ড অপ্রস্তুত লাগছিল। কুসুম তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'যদি সত্যি কালকে চলে যাস সকালে দেখা করে যাবি।'

'তুইও ভাল থাকিস। তোর যে কোন কষ্ট মানেই আমাকে কষ্ট দেওয়া মনে রাখিস। আর জেদটা একটু ছাড়। পতি ও সন্তানের প্রতি নজর দে। তুই সুখি হবি। আসি কুসুম।'

রঘু দ্রুত পা ফেলে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। কুসুম বাঁশের বেড়াতে ঠেস দিয়ে রঘুর চলে যাওয়ার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। সরোজিনী কাছে এসে দেখলেন কুসুম কাঁদছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, হায় ঈশ্বর, এটাও কি সম্ভব!

রাত তখন অনেক। লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে রয়েছে রঘু। ঝোলা ব্যাগের মধ্যে চিঠিগুলি রয়েছে। কতগুলি রঘু গুনে দেখেনি। রঘু তারিখ অনুযায়ী চিঠিগুলি পর পর সাজিয়ে নিল। কি আছে এই চিঠির মধ্যে কে জানে। এক অজানা আতংকে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল রঘু। পাশাপাশি ঘরগুলিতে রণজিতরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু রঘুর চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না।

অবশেষে তরুবালার সর্বশেষ লেখাটা রঘু খুলে ফেলল। এই হাতের লেখাগুলি রঘুর খুব চেনা। রঘুর মনে হল তার মা যেন তার পাশেই বসে আছেন।

স্নেহের রঘু,

একের পর এক চিঠিতে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি। তারপরও মার উপর তোমার অভিমান কমিল না। কুসুমের কাছ থেকে তোমার সামান্য সংবাদ পাইতেছি বটে, কিন্তু তাহা আমার কৌতূহল মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তুমি অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া কলেজে পড়িতেছ এবং সামনেই তোমার ফাইনাল পরীক্ষা শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। তুমি এই পরীক্ষায় সফলতার সাথে কৃতকার্য্য হইবে এই আশা ও আশীর্বাদ রহিল। পরীক্ষা শেষ হইলে পরে তুমি কলিকাতায় আমার কাছে চলিয়া আসিবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া তোমাকে দেখি না। আমার হৃদয়ের হাহাকার কাউকে বোঝাইতে পারি না। যে স্বপ্ন ও সুখের আশায় আমি ও তোমার পিতা এ পাড়ে ঘর বাঁধিয়াছিলাম তাহা যেন পদে পদে ব্যর্থ হইতেছে। বিধাতা যেন আমাদের বিড়ম্বনার শেষ দেখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

গত দুই বৎসর যাবৎ দেশের বাড়ি থেকে আর কোন টাকা পয়সা না আসায় আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া গিয়াছিলাম। পাকিস্তান সরকার শত্রু সম্পত্তি আইন করিয়া আমাদের বসত বাড়ির জমি সব দখল করিয়া নিয়াছে। মসন্দর

আসিয়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়া কাঁদিয়া আমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় কিছু একটা কাজ জোগাড় করিবার জন্যে আমি হন্যে হয়ে পথে পথে ঘুরিতেছিলাম। পূর্বের চিঠিগুলিতে তোমার মামা ও মাসিদের জমি নিয়া বিবাদ ও নানাহ কেলেঙ্কারির কথা আমি বিস্তারিত লিখিয়াছি। ফলে ওরা জমির লোভে আমাকেও প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করিয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও ওদের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারি নাই।

ফলে একমাত্র তোমার মেঝমামা ছাড়া কাহারও সাহায্য আমার কপালে জুটিল না। তোমাকে পূর্বেই লিখিয়াছি একটা যাত্রা দলে নিয়মিত কাজ করিয়া আমি এখন দিনাতিপাত করিতেছি। এই সংবাদ পড়িয়া নিশ্চয় তুমি আঘাত পাইয়াছ। সে সময় কোন উপায়ন্তর না দেখিয়া আমার মেঝদার যাত্রা দলের শরণ নিয়াছিলাম। তবে আমি এখন আর এই দলের অভিনেত্রী শুধু নই। মেঝদা গতবছর গত হওয়ার পর আমি এই দলের মালিক হইয়া গিয়াছি। কারণ মেঝদার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ফলে এই দলের ভাল মন্দ, আয় ব্যয় সব আমায় দেখিতে হইতেছে। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটিলেও রাতে যখন ঘরে ফিরি তখন মনটা শুধুই কলাবাগানে চলিয়া যায়। তোমার শৈশব থেকে কৈশোরের দিনগুলি চোখের সামনে ছবির মতো ভাসিতে থাকে। অসহায়ভাবে রোদন করা ছাড়া আমার তেমন কিছু করার থাকে না।

ইদানীং এক নতুন উপদ্রব আমাকে নির্যাতন করিতেছে। স্বামী পুত্রের অনুপস্থিতিতে একজন একাকী নারীর জীবন যে অতিশয় যন্ত্রণায় ভরা তা তোমাকে লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং ভ্রাতা ও ভগিনীগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত আমার পুনঃবিবাহের আয়োজন করিতেছেন। একজন পাত্র সঙ্গে নিয়া তারা বারংবার আমার ভাড়া বাড়িতে আসিতেছেন। আমি বাধা দিয়া ক্লান্ত হইয়া যাইতেছি। ঐ লোকটাও বেহায়ার মতো বারবার আমার কাছে আসিতেছেন। আমার লিখিতে লজ্জা লাগিলেও সত্য কথা পুত্রের নিকট না বলিয়া কোন উপায় নাই। যদি তুমি আগামী তিনমাসের মধ্যে আমার কাছে ফিরিয়া না আস তাহলে ওদের আমি আর কতদিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব নিজেই জানি না। তাছাড়া আমি এটাও ধরিয়া নিব যে তুমি আর কোনদিন আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না।

তবে আমি অকপটে এখনও স্বীকার করিতেছি একজন অপরাধীকে শাস্তি দিয়া আমি কোন অপরাধ করি নাই। কুসুমের কাছে জানিতে পারিয়াছি ঐ অপরাধী অবশেষে মরে নাই। সে যাই হোক, তুমি ফিরিয়া আস খোকা, তুমি আমার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে আমি কি নিয়া বাঁচিব? চিরদিনের মতো আরও দূরে চলিয়া যাওয়ার পথ তুমি প্রশস্ত করিয়া দিও না।

ইতি
তোমার মা।

চিঠিটা শেষ করে উদাস ঝাপসা চোখে রঘু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা তাকে স্পর্শ করে আরও নিঃসঙ্গ করে দিতে লাগল। এই পৃথিবীতে কে যে কার আপন সেটাই রঘুর সামনে এখন বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। বরুণ, খোকা, রণজিৎ, পাগলী ও গৌর সাহা তো এখন তরুবালার চাইতে কম আপন নয়। এই শেষ চিঠিটা তরুবালা প্রায় পাঁচ মাস আগে লিখেছেন। অতএব এই কদিনে তরুবালার জীবনে নতুন অতিথি হয়তো এসে গেছেন। তরুবালা তার অনিচ্ছার কথা বারবার লিখেছেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ ছ-সাত বছর একজন একাকী নারী কতোটা পথ অতিক্রম করতে পারবেন? জীবনের একটা যুগ পেরিয়ে গেলেও বাকি যে দিনগুলি রয়ে গেছে তাও তো কম নয় । রঘুর মাথা ভন-ভন করে ঘুরতে লাগল। এক এক করে হ্যারিকেনের নরম আলোতে সবগুলি চিঠিই পড়ল সে। তরুবালার প্রথম দিকের চিঠিতে যতোটা ছেলের প্রতি আকুতি ছিল, তা বছরের পর বছর কমেছে। পরের চিঠিগুলিতে তার অসহায়তার কথা বারবার লিখেছেন। তিনি যেন সেই ক্ষেত্রই প্রস্তুত করে চলেছিলেন যেন কোনদিন রঘু মাকে দায়ী করলেও তিনি সেই দায় থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। পুত্রের প্রতি স্নেহ ভালবাসা পরের চিঠিগুলিতে যেমন ক্রমশ কমছে তেমনি কমেছে পুরানো বাড়ির কথা। তরুবালা শেষের চিঠিগুলিতে নিজের অভিনেত্রী হিসেবে সাফল্য এবং মালিক হিসেবে নাট্য কোম্পানির সফলতার কথাই বেশি লিখেছেন। কোলকাতার ঝাঁ চকচকে রূপকথার মতো সমাজ, রূপালী জীবনের হাতছানিকে তিনি যে এড়িয়ে চলতে পারছেন না সেটাও লিখেছেন। পতি হিসেবে যে লোকটার কথা বারবার লিখেছেন সেই লোকটা এই কোম্পানির ম্যানেজার। তরুবালা লিখেছেন তার মা বাবা দাদারা একজন পাত্র সঙ্গে নিয়ে বারবার তার ভাড়া বাড়িতে আসছেন। তিনি বাধা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না রঘুর। ম্যানেজার তো মালিকের পাশেই থাকে সারাক্ষণ, তাকে অন্যদের বয়ে নিয়ে আসতে হবে কেন? মা কি তাহলে নতুন সংসার গুছিয়ে রঘুর কাছ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছেন। তবে এটা স্পষ্ট এই লোকটির সমর্থন না পেলে কোম্পানির একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাও তরুবালার পক্ষে মুশকিল। রঘু ভাবতে লাগল তরুবালার নতুন জীবনে রঘুর আর কোন অস্তিত্ব আছে কি?

বাস্তব বড় কঠিন, বড় নিষ্ঠুর। রঘু জানে জীবনে কিছুই অধরা থাকবে না তার। যা চাইবে তাই হয়তো সে ছুঁয়ে দেখতে পারবে, তাই সে অর্জন করতে পারবে। কিন্তু মাঝখানে চলে যাবে একটা দীর্ঘ সময়। সেই সময়ের অতল গহ্বরে এক এক করে হারিয়ে যাবে কুসুম, আইচুকতি, তরুবালার মতো আপনজনেরা। সময় গিলে খেয়েছে রঘুর সমস্ত সুখের মুহূর্তগুলিকে নীরবে নিভৃতে।

রঘুর বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। মাটির কলসিতে রাখা জল খেয়ে তার তেষ্টা যেন কিছুটা মিটল। কুসুমকে হারিয়ে, আইচুকতিকে খুঁজে না পেয়ে যতোটা একা হয়েছিল সে, তার চাইতেও যেন হাজার হাজার গুণ বেশি

একা হয়ে গেল আজ। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রঘুর উদাসী মনোভাবই দায়ী। কোন সম্পর্কই উভয় তরফ থেকে সমানভাবে সাড়া না পেলে দীর্ঘদিন টেকে না। রঘু কুসুমকে দুরে ঠেলে দিয়ে প্রাণভরে কেঁদেছিল। কিন্তু আইচুকতিকে না পেয়ে, মাকেও হারাতে বসে তার চোখ দিয়ে জল এলো না। সে বিছানায় শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। তবে একটা কথা ভেবে রঘুর ভাল লাগল। বাবার সঙ্গে ঘর বেঁধে এই গ্রামে এসে কঠোর পরিশ্রম করেও মা তো জীবনে নিঃস্বই রয়ে গেলেন। তার যে প্রতিভা, অপরূপ সৌন্দর্য্য তার কিছুই তিনি দেখাতে পারেননি। এবার মার কাছেও নিজেকে প্রমাণ করার অনেক সুযোগ থাকবে। যার কিছু প্রমাণ তিনি ইতিমধ্যেই দিয়েছেন। তাছাড়া কোলকাতার মতো জায়গায় একটা যাত্রা কোম্পানির মালিক হওয়াও তো সহজ কথা নয়। সেটা মা যে কোন মূল্যে হাসিল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যে কোন ভাল কাজ করতে গেলে মানুষকে কিছু ছাড়তে হয়। মা হয়তো সে ক্ষেত্রে রঘুকেই হারানো শ্রেয় মনে করেছেন। তরুবালার উপর যত অভিমান তা যেন রঘুর মন থেকে মুহূর্তেই মুছে গেল। সম্পর্কতো একটা ক্ষণিকের ব্যাপার মাত্র, কে কি মহৎ কাজ করল সেটাই দেখার। কে কতোটা উঁচুতে উঠতে পারে সেটাই মানুষ দেখবে। রঘুও তো তার মার মতোই সবাইকে ভুলে নিজেকে উপরে উঠানোর চেষ্টা করছে। সে নিজেও তো তার মাকে কাছে ধরে রাখার চেষ্টা করেনি। তাহলে শুধু তরুবালাকেই আজ দায়ী করা ঠিক হবে না।

পরদিন ভোরবেলা কুসুম এসে দেখে রঘু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নতুন বধুটি উঠোনে গোবর জল লেপে স্নান করে ফিরে এসেছে। বাড়ির বাকিরা সবাই ঘুমোচ্ছে। কুসুম বুঝতে পারল গত রাতে রঘুর উপর দিয়ে ভয়ানক ঝড় বয়ে গেছে। কারণ সারা ঘরময় তরুবালার চিঠিগুলি ছড়ানো। কুসুম সব চিঠি গুছিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে রঘুর ঝোলায় রেখে দিল।

ঘুমের মধ্যে রঘুকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। রাজপুত্রের মতো চেহারা তার। চোখগুলি তলোয়ারের মতো ধারালো। যার দিকে তাকায় তার অন্তর পর্যন্ত বিঁধে যায় এই জোড়া ফলায়। গালের অবিন্যস্ত দাড়ি, লালচে ঠোঁট যে কোন নারীর ভেতর নাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কুসুম বিছানায় রঘুর পাশে বসল। রঘুর চুলে মাথায় হাত দিয়ে আদর করে কুসুম মনে মনে হাসতে লাগল। পাশ ফিরে রঘু নিজেই জেগে উঠে বসল। তারপর বোকার মতো কুসুমের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কুসুম জিজ্ঞেস করল, 'কি রে স্বপ্ন দেখছিস নাকি? ঘুম ভাঙেনি এখনও?'

'তুই কখন এলি কুসুম? একা বসে বসে কি করছিস?'

'তোকে দেখছি।'

'আমাকে? কি দেখছিস?'

'যত দেখছি ততই যেন মুগ্ধ হয়ে আবিষ্কার করছি।'

'কি?'

'কৈশোরের থেকেও তুই এখন অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তোকে দেখলেই আমার ভেতরটা কেমন করে ওঠে। তুই সত্যি খুব সুন্দর রঘুদা।'

'আমিও তো তাই বলতে চেয়েছিলাম তোকে - যতদিন যাচ্ছে কুসুম তুইও ততই আরও সুন্দরী হয়ে উঠছিস।'

'পুরুষরা ঘুম থেকে জেগে উঠে সব মেয়েকেই পৃথিবীর সেরা সুন্দরী মনে করে।'

রঘু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে বিয়ে করবি কুসুম?'

'চল রঘুদা পালাই দুজনে।'

'ছেলে স্বামী কারো সাথেই সম্পর্ক রাখতে পারবি না।'

'তাহলে এই ছোট্ট বাচ্চাটার কি হবে রঘুদা?'

'আমি কি বলব।'

'না ওকে নিয়েই তোর সাথে ঘর করব।'

রঘু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'এই হল মা। মায়েরা জানিস সাধারণত সন্তানকে ফেলে যায় না। তুই যা চাইছিস এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ক্ষেত্রেই ব্যাতিক্রম হয়ে যায় সব কিছু। আসলে আমি বেঁচে থাকব কি লক্ষ্য নিয়ে সেটাই বুঝি না। সবাই আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তুই, আইচুক, মা। কেন বলতো?'

রঘু হাত মুখ ধুতে চলে গেল। কুসুম বসে বসে ভাবতে লাগল, ঠিকই তো রঘুর জীবনটা যেন এক ভাসমান নৌকা। স্রোতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু ঠিক কোথায় গিয়ে থামবে কেউ জানে না। কোন জায়গায় সে যেতে চায় তাও জানে না। চলার পথে সবাই ওকে কাছে টেনেও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কুসুম ওকে দূরে সরিয়ে দেয়নি বরং কুসুমকে রঘু দূরে ঠেলে দিয়েছিল। কুসুম শুনল, রঘু একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। রণজিৎ ঘরে নেই, সামনেই ওর জমি আছে সেখানে দেখা করে নেবে। মাসিমা রণজিতের বউ বারবার ওকে খেয়ে যেতে অনুরোধ করল কিন্তু রঘু শুনেনি। সোজা ঘরে এসে ট্রাউজারের উপর ফতুয়া গলিয়ে ঝোলা কাঁধে নিয়ে তৈরি হয়ে গেল।

'এবার যে আমাকে যেতে হবে কুসুম।'

'কোথায় যাবি?'

'আপাতত আগরতলায়।'

'তারপর?'

'তার আর পর কি বল, পড়াশোনা করা ছাড়া আর কোন কাজই বোধয় আমি ভাল করতে পারব না। অতএব পড়াশোনাই করতে হবে আজীবন। তাছাড়া বইকে ঠিকঠাক ভালোবাসলে অন্য সবাইকে ভুলে থাকা যায়। এখন সেটাই করার চেষ্টা করব।'

'উচ্চ শিক্ষা নিবি তো?'

'হ্যাঁরে ভাবছি বিজ্ঞানের উপর রিসার্চ করব। অবশ্য যদি ফাইনালে ভাল নম্বর পাই।'

'কোথায় পড়বি?'

'কলিকাতা ছাড়া তো উপায় নেই।'

'পিসিমার সাথে দেখা করবি না?'

'জানি না। যে মাকে আমি কাছে পেয়েছি, যার কোলেপিঠে বড় হয়েছি, আপাতত তাকেই মনে লালন করতে চাই। নতুন মা আমাকে কতটুকু চাইছেন সেটাও বুঝতে হবে।'

'আমাকে চিঠি লিখলে আমি কি উত্তর দেব পিসিমাকে?'

'লিখে দিস তোর ইচ্ছে মতো।'

'রঘুদা, পিসিমার উপর তোর অনেক রাগ তাই না?'

'কেন? রাগ করব কেন? যার জীবনটা তো শুধুই যার। সেখানে তার পছন্দ অপছন্দের অধিকার তো থাকবেই।'

'পিসিমার কষ্টটা একবারও যাচাই করার চেষ্টা করলি না?'

'ওসব ছাড় কুসুম অন্য কথা বল।' দুজনেই চুপ করে রইল। চা মুড়ি খেয়ে তৈরি হয়ে গেল রঘু।

'আবার দেখা হবে তো রঘুদা?'

'এই পাগলী কাঁদিস না। আমি আসব - শুধু তোর জন্যই আসব। আমার বাবার স্মৃতির জন্য বারবার আসার চেষ্টা করব পূজার সময়। তোকে কথা দিলাম দেখিস।'

'ঠিক আসবি তো?'

'হ্যাঁরে।'

'তুই বিয়ে থা যাই করিস না কেন বউকে আগেই বলে দিবি আমার কথা।'

'ঠিক আছে বলব। এবার চল বেরিয়ে পড়ি।'

রঘু বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ধলাই নদীর তীর ধরে এগিয়ে যেতে যেতে সে হঠাৎ আবার আনমনা হয়ে গেল। সেই শৈশবের দিনগুলি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাবা, মা, রঘু আর কুসুম এই চারজনকে নিয়ে যে সুখের সংসার নীল ছাদের তলায় তৈরি হয়েছিল, তা আর পৃথিবীর কোথাও কোনদিন খুঁজে পাবে না রঘু। কুসুম তার পাশেই আছে বটে তবু সে অনেক দুরের মানুষ। আর বাকি দুজনের নাগাল হয়তো আর কোন দিন রঘু পাবেই না।

'কি ভাবছিস রঘুদা?'

'নাহ্ কিছু না।'

'সামনের পুজোয় আসিস কিন্তু, আমি তোর অপেক্ষায় থাকব।'

একটা খালি রিক্সা পেয়েই লাফিয়ে উঠল সে। কুসুমের দু চোখ গড়িয়ে টলটলে জল পড়তে লাগল।

'কুসুম আমি যেখানেই থাকি তোকে ঠিকানা দেব, তুই নিয়মিত চিঠি লিখিস। আমার উপর আর কোন ক্ষোভ মনে রাখিস না, আমাকে ক্ষমা করে দিস। আমাদের সম্পর্কটা যেন আজীবন থেকে যায় আমি সেই চেষ্টাই করব। ভালো থাকিস।'

'তোর ঝোলায় একটা জিনিস রেখেছি।'

'কি?'

'খুলে দেখিস। তুই চিঠি দিস ভুলে যাস নে।'

'আসিরে কুসুম।'

প্যাডেলে চাপ পড়তেই রিক্সাটা সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। দূরে আরও দূরে কুসুম হারিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। এভাবেই কুসুম বারবার হারিয়ে যায় রঘুর জীবন থেকে। যেমন রঘুও হারিয়ে যায় বারবার। অথচ বারবার ফিনিক্স পাখির মতো মরে গিয়েও ওদের সম্পর্কটা আবার জেগে ওঠে, এ সম্পর্কের যেন শেষ নেই। অম্লান এই সম্পর্ক চলতেই থাকে অনন্তকাল ধরে এর শেষ হতে নেই।

১৪

মোটরস্ট্যান্ড গাড়ি থেকে নেমে রঘু সোজা রিক্সা ধরে গৌর সাহার দোকানে চলে গেল। খোকার দোকান রাস্তায় পড়লেও সেখানে যায়নি রঘু। অনেকদিন হল সে ডিউটিতে যায়নি, হঠাৎ তার চাকরিটার প্রতি মায়া হল। তাই সোজা হোটেলে চলে এল। বিকেলবেলা হোটেলে ভিড় নেই বটে তবে কর্মচারীরা প্রায় সবাই ছিল। রঘু হোটেলে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। ম্যানেজারের চেয়ারটি আলো করে বসে আছে বরুণ। সে রঘুকে দেখে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'আরে রঘু তুই! এতোদিন পর কোত্থেকে এলি? আমরা তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। তুই কোথায় ছিলি?'

'জেলে।' রঘু হেসে বলল।

'জেলে!' চুপ হয়ে গেল বরুণ। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'জেলে গেলি কি করে?'

'সে অনেক কথা। পরে বলব। এখন ওসব বলতে ভাল্লাগছে না।'

'বাড়িতে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'কুসুমের সাথে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁরে - ওর সাথে দেখা করতেই তো গেছি।'

ওদের কথাবার্তার ফাঁকেই একটা ছেলে এসে বরুণকে বলল, 'দাদা সাহার দোকানে রাতে দুটো মাংস মিল যাবে।'

বরুণ বলল, 'হ্যাঁ লেখা আছে, তুই কাজ করগে যা।'

ছেলেটি চলে গেল। সেদিনও এই হোটেলের ম্যানাজার ছিল রঘু কথাটার আজ যেন আর কোন মানে নেই। যদিও বেশ কয়েকটা নতুন ছেলে এই হোটেলে এসে কাজে জুটেছে। পুরোনোদের কয়েকজন আছে, আবার অনেকেই নেই। হোটেলে টেবিল চেয়ারের পজিশান, ম্যানোজারের জায়গা সবকিছু বদলে গেছে। এই দুই আড়াই মাস সময় অনেক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে রঘুর দুনিয়াতে। বরুণ চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'রঘু আয় এদিকে বোস।'

'না না তুই বসে কাজ কর। ভালই তো সাজিয়েছিস টেবিলগুলি বেশ নতুন নতুন লাগছে।'

'আসলে কি জানিস, তুই না থাকায় গৌরকাকু বড় সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। তার এতোগুলি ব্যবসা আর একা সামলাতে পারছিলেন না। তাই

আমাকে একদিন ডেকে বললেন তুই না আসা অব্দি সামলাতে। এমনিতেও ঘরে বসে আছি তাই লেগে গেলাম। এখন তুই এসে গেছিস আমার ছুটি।'

'এই না না আমি আর হোটেলে কাজ করব না। রেজাল্ট আউট হলে কি করব আমি নিজেই জানি না। ফলে কাজটা তুই ছাড়িস না। তোর হাতে কাজটা থাকা মানে আমারও লাভ। বিপদে পড়লে তুই আমাকে সাহায্য করতে পারবি।'

দুজনে হাত পা ছড়িয়ে পাশাপাশি চেয়ারে বসে গল্প করতে লাগল। বরুণ ম্যানেজারের চেয়ার ছেড়ে এসে রঘুর পাশে বসল। বরুণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা রঘু কুসুমের সাথে কি কথা হল?'

'অনেক কথা হয়েছে। বলতে পারিস যে দূরত্ব আমার মনে ছিল তা আর নেই।'

'বন্ধুদের সাথে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ সবার সাথেই দেখা হয়েছে।'

'কিন্তু তোর মনটা এতো খারাপ কেন দেখাচ্ছে রঘু?'

'না এমনিতেই। তবে তোর চেহারাটাও খুব শুকনো দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার?'

একটু অবাক হয়ে তাকাল বরুণ। তার মানে রঘু কি কিছুই জানে না? 'কিরে খোকা তোকে কিছু বলেনি?'

'না আমি এক্ষুনি এলাম, খোকার সাথে আমার দেখা হয়নি।'

বরুণ কি ভেবে হঠাৎ চুপ মেরে গেল। রঘু বারবার অনুরোধ করেও কি হয়েছে কিছুই জানতে পারল না। নানারকম ভাবনা তার মাথায় এসে গিজ্ গিজ্ করতে লাগল। হোটেল থেকে সোজা ঘরে ফিরে এলো সে। ভাল করে চোখ মুখ ধুয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় একা হাঁটতে হাঁটতে নিজের জন্য ভীষণ হাসি পেল রঘুর। সত্যিই রঘুর ভাগ্যটা বড়ই লুকোচুরি খেলছে তার সাথে। এতো উত্থান পতন কতোজনের জীবনে হয় তা এক বিস্ময়। এই যে নিশ্চিত চাকরিটা ছিল তাও চলে গেল। সে ইচ্ছে করলেই এটা আবার ফিরে পেতে পারে। কিন্তু তা কি ঠিক হবে? তার নিশ্চিত জীবন আবার অনিশ্চয়তায় ভরে গেল। রঘু জানে খোকার দোকান আছে, গৌর সাহা আছেন, ফলে তার খাওয়া, পরার অভাব হবে না। তবুও কর্মহীন জীবন যাপনের মতো চরম শাস্তি বোধ হয় আর কিছু নেই।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ আইচুকতির কথা মনে পড়ে গেল। এই একটা মানুষ পৃথিবীতে আছে যাকে নিজের করে এখনও ভাবা যায়। যদিও সে কোথায় আছে, আদৌ রঘুর অপেক্ষায় আছে কিনা একটা ধোঁয়াশা রয়েই গেছে। সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল রঘুর কাছে। একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে গেলে রঘুর সুবিধে হোত। তবে মনে মনে ভাবল নিজে থেকে আইচুকতি কাছে ডেকে না নিলে সে আর আইচুকতিকে খুঁজবে না।

রাত প্রায় দশটার দিকে খোকা ও বরুণ গৌর সাহাকে সাথে নিয়ে ঘরে

ফিরে এল। বাড়ির কেউ খবর পায়নি রঘু কখন এসে ঘরে চুপিচুপি শুয়ে পড়েছে। গৌর সাহা এসে নাম ধরে ডাকতেই একে একে প্রতিটি ঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। রঘু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই জানে না। বেকার বাউন্ডুলে লোক কোন কাজ হাতে নেই, ফলে ঘুমিয়ে পড়াটাই একমাত্র কাজ ছিল। ক্লান্ত শরীরটা আর ধকল যেন সইতে পারছিল না।

হারিকেন জ্বালিয়ে দরজা ঠেলে বাইরে এসে রঘু দেখে তার ঘরের সামনে রীতিমতো জমায়েত। প্রশ্নের শেষ নেই। এতোদিন কোথায় ছিল রঘু? কেন না বলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল? সেটা জানার জন্য সবাই কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইল। গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ খবর পেয়ে চলে গিয়েছিল বলে সবাইকে রঘু বোঝাল। এতো নিরামিষ খবরের জন্য কেউ অপেক্ষায় ছিলেন না। যাই হোক অযথা সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেওয়ার জন্য বাড়ি শুদ্ধ সবাই রঘুকে গালমন্দ করে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

ঘরে একে একে সবাই এসে ঢুকলেও রমলা নেই। খটকা লাগল রঘুর। সে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে খোকা, রমলা কোথায়?'

সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু কেউ কিছুই বলল না। গৌর সাহা খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'একটা খারাপ খবর আছে রঘু। তোকে বলতে ভয় পাচ্ছে তাই সবাই ইতস্তত করছে।'

'আমার সব খবরই খারাপ। আপনি বলুন।'

'অবশ্য একটা ভাল খবরও আছে।'

'খারাপ খবর শুনতে আর ভালো লাগছে না। ভাল খবরটাই বলুন শুনি।'

'বিরল একটা ঘটনা ঘটেছে রঘু, জানিস রমলার স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে। সে তার বাড়িতে ফিরে গেছে।'

'তাই নাকি!' আনন্দে রঘু প্রায় লাফিয়ে উঠল। গৌরবাবু, বরুণ, খোকা সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'এটাতো খুব ভাল খবর কাকু। ওর বাড়ি কোথায়? কে কে ওকে নিতে এসেছিল। স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়ে সে আপনাদের চিনতে পেরেছিল? আমার কথা কিছু বলেছে?'

'না।' খোকা বলল।

গৌরবাবু বললেন, 'আমাদের কাউকেই সে চিনতে পারল না। চলে যাওয়ার আগের দিন আমার কাছে কিছু টাকা ও ঠিকানা চেয়ে নিয়ে গেছে। আমি বড় অবাক হয়েছি জানিস রঘু, এই যে আমরা সবাই মিলে ওর জন্য এতো কিছু করলাম, তার কিছুই মনে করতে পারবে না সে কোনওদিন? সবাইকে বেমালুম ভুলে যাবে?'

খোকা বলল, 'কিন্তু আমরা ওকে ভুলতে পারব না কাকু। সেদিন থেকে এই যে বোতলে মন দিয়েছি আজও ছাড়িনি। তুমি আমাকে মাপ করে দিও কাকু।'

খোকার কথা শুনে গৌর সাহা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'রঘুকে পেয়ে মনটায় বড় কষ্ট হচ্ছে আজ। ধ্যাৎ কেন যে তোদের সাথে মিশতে গেলাম? বড় ভালো ছেলেরে তোরা সব। টাকা পয়সা অনেক রোজগার করেছি কিন্তু কাঁদতে পারিনি মানুষের জন্য। কিন্তু তোদের সাথে মিশে রাস্তার পাগলের জন্যও কাঁদতে ভালো লাগছে।'

মনের যত বেদনা, না বলা কথা সবাই উজাড় করে দিচ্ছে। কিন্তু রঘু মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল। রমলার কথা ভাবতে লাগল সে আনমনে।

'রমলা ওর ঘরে ফিরে গেছে এটাই আমাকে বড় আনন্দ দিচ্ছে। তবে একটু ভয়ও হচ্ছে, অসুস্থ শরীরে সে বাড়িতে ঠিকঠাক পৌঁছতে পেরেছে কিনা। তার পরিবারের লোকেরা এতোদিন পর পেয়ে ওকে আপন করে নেবে কিনা?'

রঘুর কথা শুনে হঠাৎ চটে গেলেন গৌরবাবু, 'নেবে নেবে – না হয় আমাদের সাহায্য চাইত। সব ঠিক হয়ে গেছে বলেই মেয়েটা আমাদের খবর নেয়নি। তোর জন্য এতো করল যারা, তাদের একটা চিঠি পর্যন্ত তুই দিলি না। এই বুঝি তোর মনুষ্যত্ব? শয়তান – শয়তান।'

'এভাবে বলবেন না কাকু। আমরা কি কিছু পাবার আশায় ওর জন্য কিছু করেছি? করিনি। আমরা ওকে সুস্থ দেখতে চেয়েছি। সে সুস্থ হয়েছে এতেই আনন্দ।'

'সব বুঝি ভাই সবই বুঝি, আমরা তো মানুষ, দেবতা নই। এই যে খোকা রমলা চলে যাওয়ার পর নিয়ম করে প্রতিদিন কাঁদছে – কেন? প্রতিরাতে গিলছে – কেন? সে তো তোর মতো লেখাপড়া করেনি, তাই সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারে না। ও যে আঘাতটা পেল তার জন্য কি মেয়েটা দায়ী নয়? যাবি যা না, আমাদের সাথে কথা বলে যা।'

একটা অচেনা অজানা রাস্তার পাগল মেয়ের জন্য রঘুর ভেতরটাও যে মোচড় দিয়ে উঠতে চায়। রঘুও কি কম ভালোবেসেছিল তাকে। প্রায় তিনটে চারটে বছর একসাথে কাটিয়েছে ওরা। এই ক্ষণিকের সংসারেরও একট টান আছে। যাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।

গৌরবাবু রঘুর মুখোমুখি এসে বসলেন। 'শোন রঘু শুনেছি তোদের রেজাল্ট বেরিয়েছে। কোলকাতার সবাই রেজাল্ট জেনেও গেছে। বরুণ বলল আগামিকাল সকালে বা দুপুরে তোদের কলেজে রেজাল্ট এসে যাবে। যদি তোদের রেজাল্ট ভাল হয় আমি তোদের পেট পুরে খাওয়াব। রঘু তুই তো ভাল ছাত্র তোর সুযোগ আছে, কখনোই হার মানবি না। নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে যা যেন কখনোই নিজেকে দীন হীন অবাঞ্ছিত মনে না হয়। তুই আরও পড়াশোনা কর। আমি সব খরচ দেব। তুই কিছুই ভাবিস না। তোরা আমার ছেলের মতো।'

বরুণ বলল, 'রঘু আমি সকালেই খবরটা পেয়েছি। আমার ভীষণ ভয় করছে রে আমি বোধ হয় পাশই করব না। কিন্তু তোর রেজাল্ট খুব ভাল হবে দেখিস। তোর রেজাল্ট ভাল হলেই আমি সবচাইতে খুশি হব। আমার চেষ্টাতেই

তুই ফিরে এসেছিস আবার পড়াশোনায়। আমার বিশ্বাস তোকে নিয়ে সবাই যেন গর্ব করতে পারি সেই রাস্তাটা খুলে দিবি।'

'আমরা দুজনেই ভাল রেজাল্ট করব বরুণ। তুইও তো ভাল ছাত্র। আমরা গরিব বলে কেউ আমাদের চেনে না। এবার চিনবে।'

'তুই বলছিস - আমিও?'

প্রতিবাদ করলেন গৌরবাবু, 'এই রঘু নিজেকে কখনো গরিব বলবি না। কেন আমার টাকা পয়সা কম আছে নাকি। তোর যা ইচ্ছে পড় গে যা। যত টাকা লাগে আমি দেব। তবু ওভাবে কথা বলিস না।'

কখন কে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। রাত প্রায় শেষ। রঘু পুরোনো অভ্যাসে অন্ধকারে ঘরের জানালা খুলে দিল। এই আকাশ পথে মহাজাগতিক সংসারটা রঘুর সামনে চলে এল। কি বিশাল এই বিশ্বব্রহ্মান্ড। কতো সৃষ্টি ও ধ্বংসের খবর আদৌ মানুষ কখনোই পায় না। তার এক ক্ষুদ্র পৃথিবীই মানুষের কাছে কতো বিশাল। মানুষের উপলব্ধির চাইতেও বিশাল এই সৃষ্টি। তার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে পারে শুধু মানুষের মন। এই যে তারা, গ্রহ, চাঁদ তার প্রতিটি কোণে লুকিয়ে আছে কতো ঘটনা। বিরামহীন নিরন্তর এই ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহ মানুষের চেতনার সীমারেখা থেকেও অনেক দূরে অজানায় থেকে যায়। সেখানে এই বিশ্বের এই সব দিনরাত্রির আবেগ দুঃখ এর কোন মূল্য আছে কি? কেন কাঁদছে রঘু আজ, কেন কাঁদবে সে? এই যে তোমার আমার সংসার - আপন পর সব কিছুই প্রতিনিয়ত পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে নিজের ঘর, নিজের এলাকা, পরিবেশ, আপনজন, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। কার জন্য কাঁদবে রঘু, কে তার পরম আপন, আর কে নয়? একটা বিশ্বজনীন অনুভূতি নিয়েই রঘু এসেছে এই পৃথিবীতে। ফলে ছোট ছোট ঘটনাকে নিয়ে বিমর্ষ হলে চলবে না। এ থেকেই শিক্ষা নিয়ে এগোতে হবে। এই জগৎ সংসার একটা বিরাট পাঠশালা। সে প্রতিদিন মানুষকে শিক্ষা দেয়। যদিও এই আবেগগুলিকেও উপেক্ষা করা যায় না, ভেতরে লালন করতে হয়। অণু পরমাণু থেকেই তো সৃষ্টির সৃষ্টি।

রঘুর রেজাল্ট বেরিয়েছে। প্রফেসর চ্যাটার্জী তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তার রেজাল্ট দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। খেটে খাওয়া একটা ছেলে নিজের চেষ্টায় এতো ভাল রেজাল্ট করতে পারে তিনি ভাবতেই পারেননি। রঘুর আত্মবিশ্বাস ছিল সে ভাল রেজাল্ট করবে কিন্তু এতো ভাল সেও ভাবতে পেরেছিল কি? প্রফেসর রঘুকে বিদেশে গিয়ে গবেষণা করার উৎসাহ ও পরামর্শ দিলেন। সাধারণ বাঙালিদের মতো দশটা পাঁচটার সুখি জীবন বেছে না নেওয়ার কথা বললেন। তিনি চোখে বড় স্বপ্ন দেখার, বড় মানুষ হওয়ার কথা বারবার বোঝালেন। যদি রঘু গবেষণা করতে চায় সব ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারত সরকারের একটা স্কলারশিপও পাবার সুযোগ সেক্ষেত্রে থাকতে পারে। রঘু ভাবতে লাগল কি করবে? তার তো আর কোন পিছুটান নেই তাই ভাবল চলেই

যাবে কিনা? জীবনে যে স্বপ্নগুলি সব সময় দেখতো সে তার একটা অন্তত পূরণ হবে। এদিকে রঘুর রেজাল্টের খবর পেয়ে হৈ হৈ করে ছুটে এল বরুণ ও গৌর সাহা। বরুণও পাশ করেছে বলে খুশির আর অন্ত নেই ওদের।

রঘুর জীবনে আচমকাই যেন অনেক পরিবর্তন চলে এল। কোথাকার কোন এক ছেলে এমন রেজাল্ট করে ফেলবে কেউ ভাবতেই পারেনি। যারা রঘুর অতীত জানতো, তাদের অনেকেই রঘুকে গুরুত্বই দিত না। তার উপর রঘুর বয়সও ছিল খানিকটা বেশি। কলেজের সহপাঠি ছেলেমেয়েরা রঘু ও বরুণকে পাত্তাই দিত না। ক্লাশের এক কোণে সে ও বরুণ প্রায়শই বসে থাকতো। নিজেদের সবার থেকে দুরে সরিয়ে রেখেই যেন ওরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো। ভাড়া বাড়িতে থেকে মুটে মজুরের কাজ করে যারা পেট চালায় তাদের হয়তো উঁচু স্বপ্ন দেখতে নেই। উঁচুদরের ছেলেমেয়েদের সমান তালে তাল ঠুকতে নেই। যার হৃদয় কাচের দেওয়ালের মতো বারবার ভেঙে যায় তার স্বপ্ন হাতের মুঠোয় না এলে উল্লসিত হতে নেই। এই রকম গুটিয়ে থাকা একটা অচেনা অজানা ছেলের অভাবনীয় সাফল্যে সবাই যেন তাজ্জব বনে গেল। যে সকল সহপাঠিরা তাকে গুরত্বই দিত না তারাও প্রায় প্রতিদিন কুশল বিনিময় করতে লাগল। কলেজের শিক্ষকদের একটা অংশও রঘুর মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন বটে, তবে এতোটা আশা করতে পারেননি। বাড়ির এবং এলাকার ছেলে বুড়ো অনেকেই তখনও বুঝতে পারেননি ঠিক কি হয়েছে। তবে রঘু যে সাংঘাতিক কিছু একটা করেছে সেটা বুঝতে কারোর অসুবিধে হয়নি।

প্রফেসার চ্যাটার্জি অনেক খাটুনি করলেন বটে কিন্তু বিদেশ যাওয়া আর রঘুর হল না। যদিও এ নিয়ে রঘুর তেমন আক্ষেপও নেই। এই মাটি এই দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে তার মনটা চাইল না। তাছাড়া অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে এতোটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হতো না। পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছিল সে, চিকিৎসা শাস্ত্রেও পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সবকিছু থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মা বাবার ইচ্ছে মতো কলিকাতায় আইন নিয়ে পড়তে ভর্তি হয়ে গেল। রঘু তাতে খুশিই হল, যত অভিমানই থাক তার তরুবালার উপর, তার পাশে আছে ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। যদি খুব ইচ্ছে হয় তাহলে তরুবালার সাথে দেখা করতে পারবে।

কলিকাতা চলে যাওয়ার পর থেকে রঘু ও কুসুমের মধ্যে ঘন ঘন পত্র বিনিময় হতো। রঘুও মন খুলে সব কথাই লিখতো কুসুমকে। রঘু কলাবাগান থেকে শেষবারের মতো ফিরে আসার সময় কুসুম যে ঠিকানা লেখা কাগজটা তার ঝোলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেখানে আদৌ কোন ঠিকানা লেখা নেই শুধু কয়েকটা শব্দ ছাড়া। কুসুম লিখেছিল, 'আমার ঠিকানা মানেই তুই।' রঘু শব্দগুলি পড়ে কাগজটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। মনে মনে ভাবল কুসুমটা আরও পাগল হয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলার ধীর স্থির অহংকারী কুসুম যেন হঠাৎ মরে গেছে। এই কুসুম বড়ই

চঞ্চল, যা ইচ্ছে হয় তা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে সে। কিছুটা রিক্ততা, কাঙালিপনাও ইদানীং এসেছে কুসুমের মধ্যে। অথচ কি নেই কুসুমের? ওর বর সুশিক্ষিত, বড়লোক, ওর শ্বশুরবাড়ির বিরাট নামডাক চারিদিকে। তারপরও কোন মেয়ের কোন চাহিদা থাকতে পারে কি? বারবার প্রশ্ন জেগেছে রঘুর মনে, কেন কুসুম এতোদিন ধরে পড়ে আছে বাপের বাড়িতে? রঘু প্রতিটি চিঠিতে কুসুমকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কুসুম কিছুই বুঝতে চায় না। মাঝে মাঝে কুসুম তার মনের সব দরজা জানালা খুলে দিলেও একটা অদৃশ্য পর্দা তুলে দেয়, ফলে অবশেষে স্পষ্ট তাকে দেখা যায় না। অবিরাম এই লুকোচুরি খেলায় ডুবে রইল তারা দুজন।

এখানে আসার পর থেকেই তার ইচ্ছে হোত, মাকে একবার অন্তত দেখার। ইস্ যদি কখনো মার সাথে তার দেখা হয়ে যায়! রাস্তায় চলতে গিয়ে সে বোকার মতো এদিক ওদিকে তাকিয়ে থাকে। তার মামার বাড়ির ঠিকানা তার কাছেই আছে, ইচ্ছে করলেই সে ট্রেন ধরে চলে যেতে পারে সেখানে। তাদের কাছ থেকে তরুবালার ঠিকানা নিয়ে সে দেখা করতেই পারে। কিন্তু পারল না সে নিজেকে নিয়ে যেতে তরুবালার কাছে। বারবার মন ছুটে যায় তরুবালার কাছে, একটিবার মাকে কাছে পাওয়ার জন্য সে ছটফট করতে থাকে। তার অন্তর জ্বলতে থাকে দাবানলের মতো সারাদিন সারারাত সারাবছর ধরে। তবু কি এক অভিমানে নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে এলো সে। দাঁতে দাঁত চেপে মাথা গুঁজে পড়ে রইল সে বইয়ের জগতে।

এই বইয়ের জগৎটা বড়ই অদ্ভুত। তাকে সহজে কিছুতেই কাছে নিয়ে আসা যায় না। ধীরে ধীরে প্রেমে পড়া, তারপর ডুবে যাওয়া এবং দিনরাত তার মধ্যে ডুবে থেকে হাবুডুবু খাওয়া। রঘুও যেন তাই চাইছে মনে প্রাণে। ভুলে যাও সবকিছু, শুধু আলটিমেট ডেস্টিনির দিকে নির্মমভাবে ছুটে যাও। এই সেদিনও যে সম্পর্কগুলি তাকে ভাবাতো, সবসময় কষ্ট দিত, তার সম্বন্ধে ইদানীং সে যেন কেমন নিস্পৃহ হয়ে গেল। আগরতলা, কলাবাগান, ভরত চৌধুরী সবই তার অ্যালবাম থেকে জরাজীর্ণ হয়ে খসে পড়ে হারিয়ে যেতে লাগল। শুধু কর্তব্যের খাতিরেই কুসুম, গৌর সাহা, খোকা ও বরুণের কাছে চিঠি লিখতো।

মানুষ দুর্নিবার গতিতে শুধু ছুটছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে, নিজেকে অসাধারণ এক উচ্চতায় তুলে ধরতে। তরুবালা, আইচুকতি, রঘু সবাই তো তার পেছনেই ছুটছে। আইচুকতি চেয়েছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যোগ্য হয়ে রঘুর সামানে এসে দাঁড়াতে। সেই রঘু যখন কলেজ পড়িয়ে রঘু হল, তখন আইচুকতির মন টলে গেল। নিজের যোগ্যতা ও আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে, নিজেকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে এক প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ে গেল সে। অথচ একসময় আইচুকতি চাইতো শুধুই তার ছোট মাজনকে কাছে পেতে। রঘুও তাই চেয়েছে - আরও যোগ্য হতে, ফলে

তার প্রেম, তার মা সবকিছু ভুলে গেল সে। সে সঠিক সময়ে ফিরে যায়নি আইচুকতির কাছে, ফিরে যেতে পারল না তার মার বাপের বাড়ির সুশিক্ষিত সভ্যদের মাঝে তার সমস্ত দারিদ্র নিয়ে। এই যে হেরে যেতে না চাওয়ার অদম্য বাসনা তাই কি এগিয়ে দেয় মানুষকে দুর্নিবার গতিতে? এই পারস্পরিক সহাবস্থান থেকেই কি দিশা পায় আমাদের তুলনামূলক এগিয়ে যাওয়া?

আইচুকতি আবার খোয়াই শহরে ফিরে এলো প্রায় পাঁচ বছর পর। রঘুর সাথে তার দেখা নেই প্রায় এক যুগ হয়ে গেছে। না আর কোন হীনমন্যতা নেই আইচুকতির মনে। প্রকৃত শিক্ষা যা ওর আকাঙ্ক্ষা ছিল তা সে পেয়ে গেছে। তাছাড়া দারিদ্রের সাথে লড়াই করে একা একটি মেয়ের সঠিক পথে চলে সফল হওয়ার কঠিন ব্রতের দীক্ষাও সে পেয়ে গেছে। ফলে এখন সে অনেক পরিণত। খোয়াইতে ফিরেই সে রাজনীতিতে আবার নিজেকে জড়িয়ে ফেলল। ত্রিপুরার আকাশে বাতাসে এখন শুধুই পরিবর্তনের হাওয়া। মুক্তির পথ খুঁজছে সর্বস্তরের মানুষ, দিনবদলের গান গেয়ে গেয়ে ওরা ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলছে। সুদীর্ঘ শীত ঘুমের পর গ্রাম পাহাড়ের গরিব সচেতন মানুষেরা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

পরিবর্তনের মাদকতায় দুলে ওঠা তাপের আঁচ এসে লাগল আইচুকতিদের শরীরে। খাদ্য আন্দোলন করতে গিয়ে কমলপুরে পুলিশের গুলিতে মরে গেল এক কিশোর। আর সাথে সাথে জ্বলে উঠল সমগ্র ত্রিপুরা। আইচুকতি কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারল না। রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আইচুকতি আরও জড়িয়ে গেল সেই কাজেই।

একদিন দুপুরে খোকার দোকানে একটা পাহাড়ি মেয়ে এসে খোকার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। খোকা ভাবল, এ আবার কে রে? খোকার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলল, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

খোকা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে। ভাবতে লাগল শাড়ি পরা, স্মার্ট, সুন্দরী এই পাহাড়ি মেয়েটা কে হতে পারে? খোকা মনে মনে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন হদিশ পেল না। 'না আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

একগাল হাসি মুখে ছড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'আমি আইচুকতি – আইচুকতি দেববর্মা।'

খোকা বিস্ফারিত চোখে তাকাল আইচুকতির দিকে। এই সেই মেয়ে যাকে খুঁজতে খুঁজতে চারিদিক চষে ফেলেছে তারা। কি নিখুঁত সুন্দরী আইচুকতি! তাকে আজীবন খুঁজতেও কোন ক্লান্তি আসার কথা নয়। খোকার বাক্‌রুদ্ধকর অবস্থা দেখে আইচুকতি হেসে বলল, 'কি খোকাদা, বসতে বলবেন না?'

তড়িঘড়ি খোকা একটা চেয়ার টেনে বলল, 'আরে তাইতো, বস বস আইচুকতি। তারপর কেমন আছো বল?'

আইচুকতি চেয়ার টেনে বসে বলল, 'এই তো চলে যাচ্ছে। শিলচরে কলেজ শেষ করে এখন একটা কাজের খুঁজে আছি।'

খোকা তার ছেলেদের চা, মিষ্টি দিতে বলল তাড়াতাড়ি। তারপর হেসে বলল, 'রঘু আইন নিয়ে পড়ছে, তুমি জান?'

'হ্যাঁ জানি।'

'কি করে জানলে?'

'কেন প্রতাপদা আছেন, ওনার কাছ থেকে আমি আপনাদের সবার সব খবর পেয়ে যাই নিয়মিত।'

'ওহ্ প্রতাপদার সাথে তোমার যোগাযোগ আছে। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই এটাও জান রঘু কবে ফিরছে?'

'হ্যাঁ জানি তো।'

'বাঃ বেশ, তাহলে ভালোই হয়েছে। তোমাকে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে আইচুক। একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। তোমাকে খুঁজে না পেয়ে দিশাহীন হয়ে গেছিল রঘু। আমি আজকেই তাকে চিঠি লিখে বিস্তারিত জানাব।'

'এই না না, এটা করবেন না খোকাদা, দোহাই আপনার। ছোট মাজন অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে, আমি তার ফোকাসটা নষ্ট করতে চাইছি না। আমার খবর পেলে সে হঠাৎ উতলা হয়ে উঠতে পারে, তার পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে।'

'কিন্তু আমি যে নিজেকে স্থির রাখতে পারছি না।'

'বোনের জন্য আপনার এইটুকুন করতেই হবে খোকাদা। আপনি ছাড়া আর কেউ যেন না জানে আমার ফিরে আসার কথাটা। যে কেউ জানলেই কথাটা ছোট মাজনের কানে চলে যাবে।'

'ঠিক আছে তাই হবে তুমি যখন বলছো।

'আরও একটা কাজ আপনাকে করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'আপনাকে কাল বা পরশু আমাদের বাড়িতে আসতে হবে।'

'কোথায়?'

'খোয়াই। আমার মা, বাবা, দা-বুড়া আপনার সাথে কিছু কথা বলবেন।'

'বেশ তো যাব। তোমাদের ঠিকানাটা লিখে দাও।'

একটা কাগজে খস্ খস্ করে লিখে ফেলল আইচুকতি। তারপর উঠে দাঁড়াল সে। খোকার মনটা খুশিতে ভরে গেল। বিদায় নিয়ে আইচুকতি চলে গেল। খোকা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তখনও তাকিয়ে রয়েছে আইচুকতিব চলে যাওয়ার দিকে। একরাশ আলো নিয়ে মেয়েটা এসে খোকাকে আলোকিত করে যেন চলে গেল।

বরুণ কলাবাগানে ফিরে এসেছে কিছুদিন হল। সরকারি চাকরির আশায় দিন কাটছে তার। যদিও তহশীলদারের জন্য যে কল-লেটার পেয়েছে সে তার

কাগজপত্র জমা হয়ে গেছে। হয়তো যে কোনওদিন অফার চলে আসবে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিড়ম্বনাও কম নয়। প্রতিদিন চিঠি থেকে পদ্মপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পড়ার জন্য লোক বাড়িতে চলে আসে। প্রথমদিকে কাজটা খারাপ লাগত না বটে, তবে ধীরে ধীরে তা বিরক্তিকর হয়ে উঠল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে বরুণ চৌধুরী বাড়িতে চলে এল। কুসুম বাড়িতেই ছিল, বরুণকে দেখে সে এগিয়ে এল। 'হঠাৎ কি মনে করে বরুণদা?'

'তুমি কেমন আছ দেখতে এলাম।'

'ভাল আছি গো বেশ ভাল আছি। অনেকদিন পর বেশ হালকা লাগছে আমার। আমি যেন বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছি।'

বরুণ কিছু না বুঝেই বলল, 'কি হাল্কা হল কুসুম?'

'দাঁড়াও বলছি। আগে চা খেয়ে নাও।' কুসুম রান্না ঘরের দিকে চলে যেতেই সরোজিনী বরুণের দিকে এগিয়ে এলেন।

'কেমন আছিস রে বরুণ?'

'ভাল আছি কাকিমা। আপনি কেমন আছেন?'

'এমনিতে ভালই আছি। কিন্তু --।' হঠাৎ থেমে গেলেন সরোজিনী। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলেন কুসুম কাছাকাছি নেই তো? বরুণ জানতে চাইল, 'কি হয়েছে কাকিমা?'

'আর বলিস না বাবা লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, ঘেন্নায় শরীরটা গুলিয়ে উঠছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বিয়ে হয়ে গেছে এতোটা বছর হল এখনও এসব সাজে? ভরা সংসার তোর, কি নেই? টাকা পয়সা, এতো ভাল জামাই? কম বয়সে যা করেছিস করেছিস। এখন বুড়ো বয়সেও কি এসব মানায়?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বরুণ। সরোজিনী আঁচলে চোখের জল মুছে উদাস হয়ে তাকালেন। বরুণ তখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে কাকিমা? আমি আপনার কথা বুঝতে পারিনি।'

'কি আর বলি বল? তোরা রঘুকে একটুখানি সামলা। কি বিশ্রী কান্ডকারখানা বাপের জন্মেও এসব কথা শুনিনি।'

বরুণ অবাক হল এসব কথা শুনে। রঘুর সাথে প্রায়শই পত্রালাপ চলছে তার কিন্তু এ ব্যাপারে কোন কথা তো হয়নি। বরুণ কুসুমের মার কথাগুলি ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। সে বলল, 'কি জানি কাকিমা এসব কথা আমি তো আগে কখনো শুনিনি।'

কুসুমের মা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন, 'তোরা সবকিছুই জানিস, আমদের সামনে কিছু বলছিস না। মেয়ের কতো বড় সাহস দেখলি আগরতলা ওর কাকার বাড়িতে গিয়ে রঘু কোথায় থাকবে সব দেখে এসেছে। এতো বড়লোক জামাই আমার তাতেও ওর মন ভরল না। শেষ পর্যন্ত কিনা হা-ভাতের ছেলের সাথে গাটছড়া বাঁধবে? কলিকাতা গিয়ে মা ছেলে মিলে যুক্তি করে আমার কুসুমকে

ফাঁসিয়েছে। তুই ভাবতে পারিস বরুণ, বাচ্চাটার জন্মের পর এতোটা বছর হয়ে গেল কুসুম একবার মাত্র শ্বশুরবাড়ি গেছে। ওর বর বারবার এসে নিতে চায় কিন্তু সে যায় না। ওমা এবার মেয়ে বলে কি জানিস? জামাই এলে এবার স্পষ্ট ছাড়াছাড়ির কথা বলবে। জামাই যদি রাজি না হয় তখন মামলা করবে। আমার তো বাপু পায়ের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে ওর কথা শুনে, কোন অনর্থ না কখন হয়ে যায় সে কথাই দিনরাত শুধু ভাবি।'

'আপনি কুসুমকে বুঝিয়ে বলুন, সে নিশ্চয়ই ওর ভালোটা বুঝতে পারবে।'

'বোঝাইনি মানে দিন রাত শুধু বুঝিয়েই চলেছি। কিন্তু মেয়েতো কিছুতেই বোঝে না। আসলে বাইরে থেকে ইন্ধন পাচ্ছে তাই ওর পাখা এতো গজিয়েছে। এসব কথা বাইরের কাউকে বলিস না বাবা। আর তোর বন্ধুকে ভাল করে বোঝা, এসব কি চাইছে সে।'

কুসুম চা নিয়ে ফিরেছে দেখে সরোজিনী ব্যস্ততা দেখিয়ে চলে গেলেন। কুসুম চায়ের প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে পাশে বসল।

'কেমন আছ বরুণদা?'

'এই ভাল।'

'আগরতলা কবে নাগাদ ফিরছো?'

'এদিকে কিছু কাজ আছে শেষ করে তবে ফিরব। রঘুর সাথে তোমার যোগাযোগ আছে নিশ্চয়?'

কুসুম মুচকি হাসল, 'এই মাঝে মাঝে চিঠি লিখে ওর খবর জানায়।'

'শ্বশুরবাড়ি কবে যাচ্ছ?'

একটু সময় চুপ করে রইল কুসুম। তারপর সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, 'হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? নিশ্চয় মা তোমায় কিছু বলেছে।'

'না না কাকিমা কিছু বলেননি।' তারপর বরুণ জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা যা চাইছ তা কি সম্ভব?'

লজ্জা পেয়ে গেল কুসুম। 'এসব কে ছড়াচ্ছে বরুণদা? রঘুদা তোমাকে এমন কিছু বলেছে?'

'না না রঘু কিছুই বলেনি আমাকে। আমি এমনিই ভাবছিলাম, ধর, যদি রঘু চায় তাও কি সম্ভব?'

'না না তা কি করে সম্ভব? আমি বিবাহিতা, ধ্যাৎ কি যে বল না তোমরা! তাছাড়া রঘুদা এমন চাইবেই বা কেন?'

'ধর যদি আইচুককে আর ফিরে পাওয়া না যায়। আইচুক যদি রঘুর অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে নিজেই রঘুকে ভুলে সংসারী হয়ে যায়। তখন?

'ওসব কথা ছাড় বরুণদা, নাও চা খাও।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রঘু বলল, 'কুসুম কি যেন বলছিলে আগে - তোমার হাল্কা লাগছে?'

'ও কিছু না আমার শাশুড়িটা খুব দজ্জাল। ওদের পয়সা আছে বটে তবে মন বলে কিছু নেই। আমি আমার পতিদেবকে বলেছি, তোমার মা যতদিন বেঁচে আছেন আমি আমার ইচ্ছে মতন পানিসাগর যাব। তুমি একদম জোর জবরদস্তি করতে পারবে না।'

'তোমার পতি কি বললেন?'

'সে আর কি বলবে। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বলল, সে তোমার ইচ্ছে।'

'তোমার বাড়ির সবাই এ নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। তুমি কি চাইছো তা বোধয় তোমার কাছেও স্পষ্ট নয়।'

বরুণ উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল কুসুমও, বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলল, 'জান বরুণদা, এই একটা কথা নিয়ে আমি রাতদিন ভেবেই চলেছি।'

'কোন কথাটা কুসুম?'

'রঘুদা যদি তাই চায় তখন আমি কি করব?'

'কি করবে?'

'সেটাই তো ভাবছি , তার শেষ চিঠিতে সে লিখছে যদি আইচুকতিকে সে ফিরে এসে না পায়, আমাকেও কাছে না পায়, তাহলে সাধু হয়ে যাবে।'

'বল কি?'

'হ্যাঁ গো। ওর এই কথাটাই আমার ভেতরটা নাড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। আমার স্বামী আমাকে না পেলে আবার অন্য কারো সাথে ঘর বাঁধবে। কিন্তু রঘুদা? কি করবে সে? এই জীবনে তো কিছুই পেল না শুধু একরাশ দুঃখ ছাড়া।'

'শেষ পযর্ন্ত কি ভাবলে কুসুম?'

'এই ভাবনার পরিধি সাগরের মতো বিশাল। তাই এখনও ভাবনাটা রয়ে গেছে বুকে।

বরুণ হেসে বলল, 'যাই করবে ভেবেচিন্তে করবে। প্রতিটি ভুলের জন্য কিন্তু মাশুল গুনতে হবে তোমাকেই।'

কুসুম গেটে হেলান দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইল আনমনে। বরুণ ঘরে ফিরেই কুসুমের মার উৎকণ্ঠার কথা বিস্তারিত লিখল রঘুকে। কিন্তু দীর্ঘ দুই মাস কেটে গেলেও রঘুর কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তর পায়নি সে।

রঘুর আগরতলায় ফিরে আসটা নানা কারণে আবার পিছিয়ে গেল। এল এল বি ডিগ্রি ঝুলিতে পুরে সে আবার কলিকাতায় একজন বড় উকিলের জুনিয়র হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়ে থেকে গেল। রঘুর ফিরে আসাটা পিছিয়ে গেলেও কুসুমের আর তর সইছিল না। সে ছেলেকে মার কাছে ফেলে রেখে কাকা শাণু চৌধুরীর বাড়িতে আস্তানা গেড়ে বসল। গৌরবাবু নিজের রামনগরের বাড়িটা রঘুর থাকার জন্য খালি করে দিলেন। কুসুম সেই বাড়িটা গোছানোর জন্য দিনরাত

খাটতে লাগল। বাড়ি পরিষ্কার করা, দরজা জানালার পর্দাগুলি ঘরের দেওয়ালের সাথে কালার ম্যাচ করে ঝুলিয়ে দেওয়া। ফুলের টবগুলিতে কি জাতের ফুল হবে সেটা নির্বাচন করা। গোলাপ নাকি ডালিয়া না রজনীগন্ধা? কোন্ টবগুলি কোথায় সেট্ হলে ভালো লাগবে তাই নিয়ে কুসুম ভাবতে লাগল। বিছানার জন্য বেডশিট্, বেডকভার, পিলুকভার এক একদিন এক একটা বিছিয়ে পরখ করে দেখে ফাইনাল করতে হল। কিচেনের সেটগুলি কি হবে তা নিয়ে রঘুর নিশ্চয় মাথা ব্যথা থাকবে না। ছোটবেলা থেকেই রঘুর একটাই স্বভাব খিদে পেলে খেতে দাও, বেশ তাহলেই হল। রঘু ভীষণ অগোছালো, ফলে কুসুম নিজের হাতে গুছিয়ে না দিলে রঘু কোনদিন ভাবতেই পারত না গুছিয়ে রাখা ঘর কেমন হয়। এসব নিয়ে ভেবে কুসুমের দিনগুলি খুশিতেই কেটে যাচ্ছিল।

শক্ত দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে ছোট একখানা পেরেক বসিয়ে দিল কুসুম। তার মধ্যে শৈশবের সেই রঘু কুসুমের ফ্রেমে বাঁধানো ছোটবেলার একটা ছবি টাঙিয়ে দিল নিজে পছন্দ করে। রঘু যে ঘরে তার ক্লায়েন্টদের সাথে কথা বলবে সে ঘরটা ও সাজিয়ে ফেলল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। প্রতিটি চেয়ার টেবিল, পেপার ওয়েট্, পেন্ স্ট্যান্ড, পেন্, ক্লায়েন্টদের বসার চেয়ার সে নিজের হাতেই গোছাতে লাগল। বাইরে গেটে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল সোনার জলে কাজ করা নেমপ্লেটটি, 'আর. পি. রায়, অ্যাড্ভোকেট',

কুসুম আপনমনে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে গুছাতে লাগল বাড়িটিকে। কিসের টানে দিনরাত পড়ে আছে এখানে সে নিজেই জানে না। মেয়ের পাগলামিতে বিরক্ত হয়ে রাণুবাবু, সরোজিনী কুসুমের ছেলেটাকে সাথে নিয়ে আগরতলায় চলে এলেন। কিন্তু না কিছুতেই কিছু হল না। কুসুম সবকিছু ভুলে দিনরাত পড়ে রইল তার সাজানো বাগিচায়। রঘু কি নেবে আর কি ছুঁড়ে ফেলে দেবে তা একান্তই রঘুর নিজস্ব ব্যাপার। তবুও কুসুমের মনে হল এখান থেকে একটা জিনিসও সরিয়ে দেবে না সে, এমন কি নিজেকেও না। জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট সয়েছে রঘু নিশ্চই বাকি সময়টা সে সুখই খুঁজবে।

একদিন হঠাৎ এই বাড়িতে খোকা ও গৌর সাহাকে সাথে নিয়ে চলে এলেন তরুবালা। তাদের পেছনে অন্য আরেকজন পুরুষও আছেন। সেই পুরুষটি কে কুসুমের বুঝতে অসুবিধে হল না। সধবার বেশে তরুবালাকে দেখাচ্ছিলও দারুণ। অবাক চোখে কুসুম তাকিয়ে রইল পিসিমার দিকে। শৈশবের কৈশোরের পরিচিতা পিসিমার চাইতেও যেন বয়সে তরুণী এই মহিলা। বিয়ের পর থেকে কুসুম শুধু বুড়ো হয়েছে, আর তরুবালা যেন হয়েছেন ঠিক তার উল্টো। দারুণ স্মার্ট, আধুনিকা এই মহিলাকে দেখে কুসুম ঘাবড়ে গেল। তরুবালা কাছে এসে কুসুমকে জড়িয়ে ধরলেন, 'কিরে চিনতে পারছিস?' কুসুম আকাশ পাতাল ভেবে বলল, 'হ্যাঁ গো।'

সবাই ঘরে গিয়ে বসলেন। কুসুম তড়িঘড়ি চা করে নিয়ে এল। চায়ের

প্লেটটা হাতে নিয়ে তরুবালা ফিরে এলেন রান্নাঘরে। কুসুম তখন প্রতিটি চায়ের বাসন কোসন সাবান জলে ধুয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে রাখছিল। তরুবালা কুসুমের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

'তোকে যে এখানে পাব আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কুসুম। কি ভাল যে লাগছে তোকে দেখে আমি বোঝাতে পারব না।'

'আমারও খুব ভাল লাগছে তোমাকে পেয়ে পিসিমা।'

'তা হ্যারে, তোর মা, বাবা, স্বামী, ছেলে সবাই ভালো আছে তো?'

'হ্যাঁ সবাই ভাল আছে। তুমি কেমন আছ পিসিমা?'

'এই ভাল - চলে যাচ্ছে।'

'কদিন থাকবে তো?'

'না রে কুসুম বেশিদিন থাকা তো হবে না। ওর শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। তাছাড়া অফিসের অনেক কাজ পড়ে আছে। ফলে কয়েকদিন থেকেই চলে যাব। তা হ্যারে কুসুম, রঘু কি পরশুদিন ঠিকই আসছে?'

'হ্যাঁ পিসিমা চিঠিতে তো তাই লিখেছে।'

'তাহলে ভালই হল দেখা হয়ে যাবে। তারপর ফিরে যাব।'

'কলাবাগানে যাবে না পিসিমা?'

'কলাবাগান! ওহ্ কমলপুরের কথা বলছিস তো? হ্যাঁ গেছি তো, আমার পেনশানের কিছু কাগজে সই করা বাকি ছিল। এবার সেগুলি ফাইনাল করে নিয়েছি। এখন ওরা টাকাটা আমার ঠিকানায় ট্রান্সফার করে দিতে পারবে।'

কুসুম জিজ্ঞেস করল, 'কলাবাগানে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় তাহলে নিশ্চই তোমার হয়নি?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে স্থির হয়ে বসে রইলেন তরুবালা। একটু সময় কি যেন ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল তার। কলাবাগানে কি করে ফিরবেনই বা তিনি? জ্যোতিবাবু যে আশঙ্কার কথা বলে তরুবালাকে আটকাতে চেয়েছিলেন তাই তো বাস্তবে পরিণত হল। তাছাড়া কিই বা ফিরে পাওয়ার আছে ওখানে একরাশ ব্যথা ছাড়া। তিনি আস্তে করে বললেন, 'না রে কুসুম, এবার আর সময় হয়নি, পরে যাব। এখন তোর কথা বল কুসুম, তোর ছেলে কতো বড় হয়েছে? তোর বর তোর ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছে বুঝি? কখন ফিরবে?'

কুসুম কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তরুবালার দুর্বলতা আছে কুসুমের প্রতি চিরকাল। তরুবালার জীবনের সাথে তার ভাবনার কাকতালীয়ভাবে একটা মিল খুঁজে পেল কুসুম। ইচ্ছে হচ্ছিল মন খুলে সব কথা খোলে বলে তাকে। কিন্তু পারল না। কারণ এই মহিলা যে অন্য কেউ। কলাবাগানের পিসিমা নন। তবুও রঘুর মা তো বটেই, যদি তার আশীর্বাদটাও পাওয়া যায় তাই বা কম কিসে?

'ছেলে মার কাছে আছে, আর তার বাপ পানিসাগরে। প্রায় আট বছর হল আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

'সেকিরে! তার মানে তোদের ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

'হয়নি এখনও। তবে রঘুদা ফিরে আসুক কথা বলি, সে কি চায় বুঝে সিদ্ধান্ত নেব।'

'তার মানে রঘু এখনও তোকে চাইছে?'

বিস্ফারিত চোখে তাকালেন তরুবালা। তিনি যে খুব খুশি হতে পারেননি সেটা ভালই বুঝতে পেরেছে কুসুম। তাও মাথা নেড়ে সলজ্জ হেসে সায় দিল সে। তরুবালা ঢোক গিলে বললেন, 'তাহলে তো ভালই হল। আমার দায়িত্ব কমে গেল। তোদের অপূরণীয় ইচ্ছেটা ঈশ্বর পূর্ণ করে দেবেন।'

কুসুমের দুচোখ ভরে জল চলে এল।

'আমি আরও রঘুর জন্য মেয়ে দেখে রেখেছিলাম। না না এনিয়ে তোর দুর্ভাবনার কিছু নেই। তোদের মনোবাসনা পূর্ণ হোক, আমার সম্পূর্ণ সমর্থন থাকবে। তা হ্যাঁরে কুসুম, আমার কথা কিছু বলেছে রঘু?'

'না পিসিমা।'

'তুই আমার ঠিকানাটা রঘুকে দিসনি?'

'দিয়েছিলাম, কিন্তু সে নিতে চায়নি ।'

'আমার উপর খুব রেগে আছে, তাই না?'

'না না। তা কেন হবে?'

'কলিকাতায় এতোদিন সে কাটিয়ে এলো আমাকে তোরা কেউ জানালি না? রঘুও একবার দেখাটি পর্যন্ত করল না আমার সাথে? আমি তো তার মা, ভুল যদি করেও থাকি তাকে একটিবার দেখার অধিকার পর্যন্ত থাকবে না আমার?'

'রঘুদা আমাকে একবার বলেছিল যোগ্য না হয়ে তোমার সামনে আর দাঁড়াবে না সে।'

'কলেজে সে পড়ছে জানলে আমিও তাকে সাহায্য করতে পারতাম। আমি তোর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে চানমণিদাকে চিঠি লিখেছিলাম। তার কাছ থেকে কদিন আগে চিঠি পেয়ে আমি বিস্তারিত জেনেছি। তিনি বরুণের সাথে দেখা করে সবকিছু জেনে খোকা ও গৌরবাবুর ঠিকানাটা দিলেন।

'তুমি এখানেই থেকে যাও পিসিমা, পরশুদিন তো রঘুদা ফিরছে, খুব মজা হবে।'

তরুবালা চিন্তিত চোখে খানিক সময় তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। নিজেকে মজবুত করার জন্য তিনি ঘর বেঁধেছিলেন। তখন তিনি জানতেন রঘু এটা মেনে নেবে না। তারপরও তিনি তার সিদ্ধান্ত বদল করেননি। কিন্তু আজ ভিখিরির মতো রঘুকে কুসুমকে কাছে পাওয়ার জন্য তার মনটা উতলা হয়ে উঠল। রঘু যে বংশের ছেলে, রঘু যে ধাতে তৈরি তাতে মার পাশে পরপুরুষ সে সহ্য করবেই না। তরুবালা সামান্য হেসে বললেন, 'আমরা গৌরবাবুর হোটেলে আপাতত উঠেছি। রঘু ফিরে আসুক, তারপর ভাবব কি করব।'

তরুবালার স্বামী তাড়া দিতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কুসুম দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখল সেই পিসিমাকে যিনি কলাবাগানের দিনগুলি কাটিয়েছিলেন লড়াই করে, দুঃখে কষ্টে। কিন্তু এখন তিনি যথেষ্ট সপ্রতিভ, ঝলমলে, সুখি। তাই তো হওয়া উচিত। জীবন তো একটাই যেখানে সুখ সেখানেই মানুষের ডুবে যাওয়া উচিত।

রঘু চিঠিতে জানিয়েছে সে ফিরবে আজ। আখাউড়া ষ্টেশনে নেমে সোজা আগরতলা আসবে। গৌরবাবু, খোকা, বরুণ সবাই রঘুর অপেক্ষায় সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু কুসুম সেদিকে যায়নি। ঘরটা বারবার ঝাড়পোঁছ করে ভেজা কাপড়ে মুছে মেঝেগুলি ঝকঝকে করে রেখেছে। প্রতিটি বেড্ কভার টান টান মসৃণভাবে জড়িয়ে রেখেছে বিছানাকে। টেবিল ক্লথ, ফুলদানি, সবকিছুই সঠিক জায়গায় নিখুঁতভাবে রাখা আছে। কিছু সতেজ ফুলও একটা চিনামাটির বাটিতে জল দিয়ে রেখেছে কুসুম। কোথাও কোন ত্রুটি যেন না থাকে। নিজের হাতে বাজার থেকে মাছ, সবজি, মাংস কিনে এনেছে। তারপর এক এক করে সব রান্না করে গুছিয়ে রেখেছে নতুন ডিজাইনের বাটিতে। শুধু ভাতটাই পরে করবে ভেবেছিল, কারণ রঘু ঠান্ডা ভাত একদম পছন্দ করে না। তবু উপায় নেই। রঘু ফিরে আসার আগেই চলে যেতে হবে তাকে। তাই ভাত রান্না হয়ে গেলে সবকিছু ঢেকে রেখে চলে গেল কুসুম। রঘু ফিরে আসুক তারপর সে ঠিক করবে আর কি কি দিয়ে তার ঘর সে সাজাবে।

কাকার বাড়িতে ফিরেই কুসুমের মেজাজ বিগড়ে গেল। দরজায় তার পতি রাখাল দাঁড়িয়ে রয়েছে গম্ভীর মুখ করে, তার পেছনেই কুসুমের মা। তার তো এই অসময়ে আগরতলা আসার কথা নয়। মুহূর্তে চোখ মুখ পাল্টে গেল কুসুমের, সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল তার সরোজিনীর উপর। কিন্তু রাগকে সংবরণ করে এক গাল হেসে বলল, 'কখন এসেছো?'

'এই তো দুপুরে। কোথায় ছিলে সারাদিন?'

'কেন তোমার শাশুড়ি মাতা বলেননি?'

সরোজিনী কোন উত্তর দিলেন না। তিনি সোজা ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। ওদের দুজনকে একা ছেড়ে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন।

রাখাল হেসে বলল, 'কি হল, নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ মনে হচ্ছে। চোখের নিচে পুরো কালি জমেছে তোমার, দুশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না নাকি?'

'কেন? আমার দুশ্চিন্তা হবে কেন? কি বলতে চাইছ তুমি?'

রাখাল তাকিয়ে রইল নিজের স্ত্রীর দিকে। তার উপস্থিতি যে কুসুম মোটেই পছন্দ করছে না তা বুঝতে তার অসুবিধে হল না। সে কুসুমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো তোমার রঘুদা আসেনি?'

'না।' ছোট্ট উত্তর দিল কুসুম। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে?'

রাখাল বাধা দিয়ে বলল, 'না না দোহাই তোমার এতো কষ্ট তুমি করতে যেও না। আমি চা খেয়েছি। তুমি বরং একটু বিশ্রাম করে ফ্রেশ হয়ে নাও।'

'এভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলবে না তো। কি বলতে চাও স্পষ্ট বলে ফেল।'

রাখাল সটান তাকাল তার স্ত্রীর দিকে। এতোদিন কুসুম তার স্বামীর কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছে। সব বিষয়েই তার মতামতই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু আজ রাখালকে দেখে কেমন যেন মনে হচ্ছে, সে কঠোর হবার অভিপ্রায় নিয়েই তৈরি হয়ে এসেছে। তার দিকে যেন তাকানোই যাচ্ছে না। রাখাল স্পষ্ট করে বলল, 'শোন - আজ আমরা বাড়ি চলে যাব।'

'আমরা মানে?'

'আমি, তুমি আর সাগর।'

'আমি যাব না।'

'আজ আট বছর ধরে তুমি অনেক তালবাহানা করেছ। তুমি বাড়িতে ফিরতে চাও না কেন আমি কি বুঝি না ভেবেছ? অন্য লোক হলে এতো দিনে বিয়ে থা করে নতুন সংসার করতো। আমি তোমার সব অত্যাচার মাথা নুয়ে সহ্য করেছি। তবে আর একটা দিনও বরদাস্ত করব না। যদি তুমি ফিরে না যাও আমি ও সাগর চলে যাব। তুমি আর কখনোই ওবাড়িতে ফেরার কথা ভাববে না।'

'তুমি যাবে যাও। সাগর আমি এখন যাব না।' কথাটা বলেই কুসুম হঠাৎ ঘরে চলে গেল।

'সাগর আমার ছেলে। তার গায়ে তোমার নোংরা ছায়া আমি কোনোদিন আর পড়তে দেব না।'

রাখাল তখনও বলে যাচ্ছে, 'আমি এখানে আসতে চাইনি কুসুম। পুরুষ হিসেবে আমারও একটা আত্মমর্যাদা বোধ আছে। তোমার মার চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে আমাকে। আমি জোর করে তোমাকে বিয়ে করিনি। দুপক্ষের ইচ্ছেতেই বিয়েটা হয়েছে। একতরফা আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না তোমার সাথে। তাই ঘৃণায় এতোদিন দূরত্ব বজায় রেখেছি শুধু ছেলেটার জন্যে। আর তার প্রয়োজন হবে না। আর কখনোই আমার কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করবে না।'

রাখাল আচমকা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে দুপদাড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছোট্ট সাগর 'মা -মা' করে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। শ্বশুর, শাশুড়ি অনেক ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু রাখাল কোন কথাই শুনলো না। এলাকার লোকেরাও চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু সে একগোঁয়ে গোয়াড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেল। কুসুম বারবার পায়ে ধরে অনুরোধ করে ওকে বোঝাতে চাইল। হাতে ধরে টেনে আটকাতে চাইল, কিন্তু পারল না। রাখাল ধাক্কা দিয়ে কুসুমকে ফেলে দিয়ে গাড়িতে উঠে কোথায় চলে গেল। রাখালের এই আচরণ মোটেই তার স্বভাবসুলভ নয়। যুগপৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল কুসুম।

হঠাৎ কুসুম যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। সাগরের 'মা - মা -' বলে ডাক বারবার তার কানের মধ্যে বাজতে লাগল। বুকের ভেতরটা কেন জানি না মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল। এদিক ওদিক থেকে শুধু 'মা' 'মা' ডাক সে প্রতিধ্বনির মতো শুনতে লাগল। দুচোখে জলের ধারা অনবরত ঝরতে লাগল, সারারাত আর থামল না।

সরোজিনী তারপরও অনেক কথাই বলে গেলেন, কিন্তু কোন কিছুই যেন তার মাথায় ঢুকল না। কারো কাছ থেকেই সামান্য সহানুভূতিটুকুও সে পেল না। এই আঘাতটা যেন তার জন্য অবধারিত ছিল বলেই সবাই মেনে নিল। অনাগত এক ভবিষ্যতের স্বপ্নও তার কাছে একেবারেই তেতো হয়ে গেল। রঘুকে পাবার আশায় নিজের স্বামী, সন্তান, মা, বাবা, সবাইকে অতি তুচ্ছ মনে করেছিল কুসুম। সেই একটা মানুষ যার হাতে নিজেকে সমর্পণ করবে বলে এতদিন ধ্যান করেছে তা আজ হঠাৎ অত্যন্ত নগণ্য হয়ে গেল। আজ তার মনে হল সাগরই তার সবচাইতে প্রিয়জন, যাকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব।

শেষ বিকেলে একরাশ মালপত্তর নিয়ে রঘু বাড়িতে ঢুকল। এই কটি বছরে রঘুর যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। গোঁফহীন সেভ্ করা গাল। মাথার একপাশে চুলগুলি পাট করে বসানো। চোখে ভারি চশমা, শ্যুট্ শার্ট পরা রঘুকে দেখলে সমীহ হয়। তার বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি, মার্জিত কথাবার্তায় শিক্ষার ছাপ ফুটে উঠেছে। বাড়িতে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল সে, 'এটা কার বাড়ি?'

গৌরবাবু পিঠে চাপড় মেরে বললেন, 'ওসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। এখন পসরা জমাও তারপর গুনে গুনে দামটা দিয়ে দিও। আমি ভাই সাহা পয়সা ছাড়া কিছুই দেব না।' সবাই হেসে উঠল। রঘু উঠোনে পা দিয়ে বলল, 'বাঃ সত্যিই খুব সুন্দর বাড়ি।'

'সুন্দর বাড়ির পেছনে রয়েছেন একজন সুন্দরী নারী। যিনি দিনরাত খেটে এই ঘরখানা তোর বসবাস যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন।' বরুণ কথাটি বলেই ডাকল, 'কুসুম- এই কুসুম-'

রঘু অবাক হয়ে তাকাল। তার মানে কুসুম এখানেই আছে! গৌরবাবু হেসে বললেন, 'এই মেয়েটা বড়ই সাংঘাতিক ভাই। তোর ঘর গোছানোর জন্য এক হপ্তা ধরে এখানে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। নিজের ঘর সংসার ফেলে বন্ধুর জন্য এতো আত্মত্যাগ করতে আমি কাওকে দেখিনি।'

বরুণ এদিক ওদিক খুঁজে এসে বলল, 'কিন্তু তিনি সম্ভবত পলায়ন করেছেন। রান্নাঘরে ভাতের ডেকচি এখনও গরম আছে।'

রঘুর খিদে পেয়েছে। সে তড়িঘড়ি উঠে বলে উঠল, 'এই চলো, খেয়ে নিই, আমার ভাই খিদে পেয়েছে।'

গৌরবাবু বললেন, 'না রঘু আমি এখন খাব না। তুই খেয়ে বিশ্রাম করে

রাতে চলে আয় হোটেলে। তোর সাথে বিশেষ একটা ব্যাপারে কথা আছে।'

খোকা আর বরুণও তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতে চাইল। রঘু সবাইকে বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়া দাঁড়া খোকা, কাকু তুমিও একটু দাঁড়াও। তোমাদের জন্য কয়েকটা জিনিস এনেছি দেখতো কেমন হয়েছে।'

রঘু শার্ট, প্যান্ট, পাজামা ইত্যাদি বিছানায় ছড়িয়ে দিল। খোকা বলল, 'তুই এসব আবার আনতে গেলি কেন? এমনিই তোর টানাটানি চলছে।'

রঘু হেসে বলল, 'এগুলি কি আমার পয়সায় এনেছি নাকি। তোদের পয়সা দিয়েই তো এসব এনেছি। শোন কাকু খোকার কথা, তোমাদের পয়সায় পড়াশোনা করলাম আর তোমাদের জন্য এটুকু করব না।'

গৌরবাবু বললেন, 'রঘু তোর হিসেব করার এই সহজ পদ্ধতিটাই আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা শোন্ একটা বড় খবর আছে।'

রঘু মুখে ভাত দিয়ে বলল, 'বল কি খবর?'

'তোর মা ওরা এসেছেন। ওনার পেনশানের কিছু ঝামেলা ছিল সেগুলি অবশ্য ঠিক করে নিয়েছেন কমলপুরে গিয়ে। এখন তোর সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষায় আছেন।'

মুখের ভাতটা গালেই আটকে গেল রঘুর। হঠাৎ ঘরের আবহাওয়া যেন পাল্টে গেল। এতক্ষণের আনন্দ মুখর সন্ধ্যাটা আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল। গৌরবাবুর 'তোর মা ওরা -' কথাটা যেন কানের ভেতর ঢুকে হুইসেল মারতে লাগল। মার নতুন সাথীটিও তাহলে এসেছেন। তরুবালা এখানে তার পেনশানের টাকা রেগুলার করতে এসেছেন। রঘু ভাবল, তরুবালা শান্তিবাবুকে স্মৃতি থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু ফ্যামিলি পেনশানের টাকাটা নিতে সুদুর কলিকাতা থেকে ছুটে আসতেও তার কষ্ট হয়নি। রঘু জানতে চাইল, 'কোথায় আছেন তিনি?'

'আমার হোটেলেই এসে উঠেছেন। তুই একবার চলে আয় রঘু, তোকে দেখার জন্য তিনি খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

খেতে খেতে কিছুটা সময় দম নিয়ে নিল রঘু। তারপর সবাইকে বিস্মিত করে বলল, 'ঠিক আছে। আমি মার কাছে যাব, মাকে বাড়িতে নিয়ে আসব। মা হোটেলে থাকবেন কেন? নিজের ছেলের বাড়িতেই থাকবেন।'

'খুব ভাল হবে রঘু।' আর কথা হল না। রঘুকে একা ছেড়ে দিয়ে সবাই যে যার কাজে চলে গেল।

হোটেলেই ছিলেন গৌরবাবু, রঘুকে দেখেই উঠে এলেন। রঘু অবাক হয়ে দেখল তার পরিচিত হোটেলটাও অনেক পাল্টে গেছে। আগরতলা শহরটা যেমন অপরিচিত লাগছে তার কাছে, ঠিক তেমনি হোটেলটাও। কয়েক বছর আগে যে হোটেলে সে কাজ করে গেছে তার সাথে এই হোটেলের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছে না। রঘু হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। গৌরবাবু ডাকলেন, 'কিরে রঘু কি

ভাবছিস?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঘু বলল, 'না কাকু রমলার কথা মনে পড়ে গেল। কেমন আছে সে এখন কে জানে?'

গৌরবাবুও কেমন যেন আনমনা হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'কিরে চল।'

রঘু বলল, 'হ্যাঁ কাকু চল।'

গৌরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারও বয়স হয়েছে, তারপরও এতো ঘটনার সন্নিবেশ কারও জীবনে হতে তিনি দেখেননি। দোতলায় কি দৃশ্য তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কে জানে? রঘু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'কাকু আমাকে আবার একবার ভরত চৌধুরী পাড়ায় যেতে হবে।'

'তোর মার সাথে যা কথা আছে আগে শেষ করে নে। তিনি তো বললেন চলে যাবেন।'

ওরা দরজার সামনে দাঁড়াল। গৌরবাবু এক পলক তাকিয়ে দেখলেন না রঘু একদম স্বাভাবিক আছে। দরজায় নক্ করতেই অপরিচিত লোক দরজা খুলে বললেন, 'কি চাই?'

তরুবালা ভেতর থেকে রঘুকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, 'রঘু!'

রঘু ডাকল, 'মা।'

এই 'মা' ডাকের মধ্য দিয়ে অনেক দিনের অভিমান গ্লানি সব ঝরে পড়ে গেল। কারও মুখেই কোন কথা সরল না। দুজনেই নিশ্চল পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তরুবালা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। রঘু মাকে প্রণাম করতেই তিনি রঘুকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। কোন ফাঁকে গৌরবাবু তরুবালার পতিটিকে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন ওরা বলতেই পারলেন না। তরুবালা চোখের জল মুছে বললেন, 'তুই ফিরে এসেছিস মার কাছে এটাই যথেষ্ট, আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে বাবা।'

রঘু হেসে তরুবালার সামনে বসল। 'তুমি ভাল আছো তো মা? আর কেঁদো না।'

তরুবালা প্রশ্ন করলেন, 'মার উপর তোর অনেক রাগ এখনও জমে আছে রঘু? কোনদিন মাকে আর ক্ষমা করবি না?'

'এসব কি বলছো তুমি মা? তোমাকে ক্ষমা করব আমি? কেন? তুমি আমার মা, তোমার উপর কোন রাগ নেই আমার।'

'তাহলে তুই এতোদিন কলিকাতায় পড়াশোনা করে এলি আমি সামান্য খবরটুকুও পেলাম না। বারবার কুসুম চানমণিদাকে চিঠি লিখেও তোর কলিকাতা যাবার খবরটা আমি পাইনি। এতোদিন পরে আগরতলা এসে জানতে পারলাম তুই কলিকাতা থেকে ফিরছিস। আমি তো অবাক হয়ে গেছি শুনে। কেন একবারও যাসনি তুই আমার কাছে? একটিবারের জন্য মাকে দেখার ইচ্ছে হলো না তোর?

রঘু হেসে বলল, 'চা খাবে মা?' তরুবালার নীরব সম্মতি পেয়ে রঘু অর্ডার দিয়ে ফিরে এলো।

'দেখো মা, তোমাকে খুশি করার জন্য অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি কথাটাই বলব। দেখো নতুন যে জীবন তুমি শুরু করেছ সেখানে আমি ইচ্ছে করেই যেতে চাইনি। আমাকে কতোখানি গ্রহণ করার ইচ্ছে তোমার আছে সে তো আমি জানতাম না। তবে তুমি একদিকে ভালোই করেছো। দেশ বিভাগ, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বসতি স্থাপন, আবার ঘর পুড়ে যাওয়ায় নবগ্রামে আসা, কাকার অত্যাচার, সব মিলিয়ে তোমার জীবনটা শুধুই কষ্টে ভরা। আমার বাবা তোমাকে কোন সুখই দিতে পারেননি। আর আমি এখন শুরু করব জীবনের সিঁড়ি বাইতে। অথচ এখন তোমার পয়সা, প্রতিপত্তি, সম্মান সবই আছে, একদম ঠিক কাজ করেছো তুমি।'

রঘুর খোলামেলা বিশ্লেষণ শুনে তরুবালা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই রঘু সেই ছোট্ট খোকাটি আর নয়। সে অনেক পরিণত। এতোদিন পর দেখা, তাও রঘুর কোন উচ্ছ্বাস নেই মাকে নিয়ে। রঘু খুশি হল না দুঃখ পেল কিছুই বোঝা গেল না। তার নিস্পৃহ মনোভাব তরুবালাকে নিশ্চিত করে দিল রঘুর মনের খোঁজ হয়তো তিনি আর এ জীবনে পাবেন না। অনেক রাগ, অনেক অভিমান জমে আছে তার ভেতরে যা আর কোনদিন রঘুর মনকে পরিচ্ছন্ন করে দেবে না। তাছাড়া রঘুর মনে আগের আবেগ আর নেই। রঘু কেমন যেন পাল্টে গেছে। সে অনেকটা মেশিনের মতো গুছিয়ে কথা বলে। তার কথা শুনে তার অন্তরের খোঁজ পাওয়া যায় না।

তরুবালা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'একটা আশা নিয়ে এসেছিলাম রঘু, তিনিও বারবার বলেছেন তোকে অনুরোধ করতে।'

'বল মা।'

'তোকে আমাদের সঙ্গে নিয়েই আমরা ফিরব কলিকাতায়। এতো ভালো পড়াশোনা করেছিস তুই অথচ ত্রিপুরায় পড়ে থাকবি তা কি হয়? কি ভবিষ্যত আছে এখানে তোর? তুই চল কলিকাতায়। ওখানে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। জীবনে অনেক বড় হবি তুই, যেমনটা আমি স্বপ্ন দেখতাম।'

'না মা তা কি করে হয়?'

'কেন হয় না রঘু? এই শোন না তোর জন্য খুব বড়লোকের একটা সুন্দরী মেয়ে আমি দেখে রেখেছি। তুই পছন্দ করলেই ফাইনাল কথা হবে।'

রঘু মুচকি হাসল। 'বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই মা। আমি জীবনে বড় হলে তুমি খুশি হবে না?'

'তুই বুঝতে পারছিস না রঘু। কলিকাতায় এতোদিন থেকেও তোর কোন পরিবর্তন হল না।'

'এই মাটিতে খেয়ে পরে বড় হলাম। এখন নিজের সুখের জন্য সব ভুলে দূরে চলে যাব তা হয় না। তুমি তোমার মতো সুখে থাকো। আমি থাকব এখানেই,

এই ত্রিপুরার পাহাড়ে, সমতলে, বাতাসে, ঝর্ণায় আমি যে সুখ পাই পৃথিবীর কোথাও তা আর পাব না। আর একটা কথা শোন, আইচুকের কথা তোমাকে বলা হয়নি। পাহাড়ি মেয়ে। ওকে ভালবেসেছিলাম, যদিও বহুদিন হল ওর সাথে কোন যোগাযোগ নাই। আইচুককে সত্যি যদি খুঁজে না পাই তবে হয়তো এমনও হতে পারে আমি কুসুমকেই বিয়ে করব। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করে যেও মা।'

তরুবালা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। রঘুর চিন্তাভাবনা, ওর কথাগুলি বড়ই সেকেলে। বিরক্ত সুরে তিনি বললেন, 'বিবাহিত মেয়েকে আবার বিয়ে করবি তুই? ছিঃ রঘু আমি এটা মেনে নিতে পারব না।'

রঘু মাথা নুইয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'বিবাহিত মহিলাদেরও আজকাল বিয়ে হচ্ছে মা।'

হঠাৎ কি ভেবে চুপ করে ফেললেন তরুবালা। তিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি হয়তো আগামিকালকেই ফিরে যেতে পারি। অনেক কাজ জমে গেছে না হয় পরে ঝামেলা হয়ে যাবে। তুই একবার ভেবে দেখিস আমার কথাটা।'

'কতো বড় একটা কোম্পানি চালাও তুমি, ওখানে তোমার কতো কাজ। যাবেই তো, তোমাকে তো যেতেই হবে।'

রঘুর তির্যক উত্তর তরুবালার বুকে গিয়ে বিঁধল। কোন আলোচনাই যেন সৌজন্যমুলক কথাবার্তার বাইরে গেল না। গৌরবাবু ও তরুবালার স্বামী ফিরতেই রঘু কাজের বাহানা করে তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তরুবালা ও তার স্বামী অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন

পরদিন সকালে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল তার। এতো ভোরে কে এসেছে? কুসুম হবে হয়তো। চোখে মুখে জল দিয়ে দরজা খুলে রঘু অবাক হয়ে যায়, তরুবালা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। হাতে পুজোর থালা, পরনে গরদের শাড়ি। বহুদিন পরে নিজের মাকে আবার যেন খুঁজে পেল সে। কি বলবে সে? কোন অভিযোগ করার অভিপ্রায় তার আর নেই। মার জীবনটা মা নিজেই পছন্দ করে নিয়েছেন। তার সাথে রঘুর কোন সম্পর্ক নেই। মা যদি খুশি হোন তাহলে রঘুও খুশি। তবে তার অভিমান আছে, এক পাহাড় অভিমান জমে রয়েছে বুকের কোণে, কিন্তু মুখে কিছুই না বলে ঝুঁকে প্রণাম করল।

'এসো মা, ঘরে এসো।'

তরুবালা সেই কাকভোরে চলে গিয়েছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি। সেখানে পুজো দিয়ে তিনি ফিরেছেন রঘুর কাছে। তার পতি আসেননি তার সাথে। রঘু শান্তিবাবুর যে সিংগেল ছবিটা কলিকাতা নিয়ে গিয়েছিল, সেটাই পোট্রেট করিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। রাত্রে ঘরে ফিরে জামা কা পড় গোছাতে গিয়ে ছবিটাও টেবিলে রেখেছিল মালা পরিয়ে। শান্তিবাবু ছবিতে মৃদু হাসছেন। তরুবালা ঘরে ঢুকে শান্তিবাবুর ছবিটার সামনে দাঁড়ালেন। তার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল।

চোখ আঁচলে মুছে বললেন, 'আগামিকাল আমি ফিরব।'

রঘু কিছুই বলল না। সে হাত মুখ ধুতে চলে গেল। গামছায় হাত মুখ মুছে ঘরে ঢুকে দেখে তরুবালা শান্তিবাবুর ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কতো কিছুই হয়তো ভেবে চলেছেন তিনি।

'তোর বাবার কথা খুব মনে পড়ছে রঘু। আজ তিনি থাকলে কি খুশিই না হতেন। তোকে নিয়ে কতো আশা ছিল তাঁর। কতো স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কমলপুর যাওয়ার পথে আমাদের গ্রামটা নজরে পড়েছিল। কি সুন্দর লাগছিল দূর থেকে! অথচ একদিন কতো কষ্ট করেই না এই পাহাড়কে আমরা আবাদ করেছি। তোর বাবা, তুই আর কুসুম সবুজ ধান খেতের ভেতর দিয়ে ঝিলের পাড়ে পালিয়ে যেতিস ডাহুক ধরতে। একটা ডাহুক হয়তো ফাঁদে পড়েছে তাই চেঁচিয়ে উঠল। আর তার সাথে সাথেই তোদের দৌড়। আমার মনে হল গাড়ির জানালা দিয়ে সেই দৃশ্যটা যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তোর মনে আছে রঘু ছোটবেলার কথা?'

রঘু এবারও চুপ করে রইল। তরুবালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলেন, 'তোর কথা, তোর বাপের, কথা আমি একমুহূর্তও ভুলতে পারি না। বেঁচে থাকার যা কিছু রসদ আমার ওখানেই লুকিয়ে আছে। ভুল হয়তো আমি করেছি বাবা কিন্তু কেন করেছি তোকে এখন বলব না। যদি কোনোদিন তোর মা হওয়ার অধিকার আবার ফিরে পাই সেদিন বলব। জীবনে এতোখানি নিঃস্ব আর কখনো হইনি আমি, গতরাতে যতোটা হয়েছি। তার চাইতে তোর সাথে দেখা না হওয়াই ভাল ছিল।'

তরুবালার চোখের জল আর বাঁধ মানল না। রঘুর চোখ ছলছল করে উঠল। এই তো তার মা যার মুঁখে হাসি দেখার জন্য জীবন দিয়ে দিতেও আনন্দ হতো। আর আজ তার সামনেই নিজেকে চিনতে পারছে না রঘু। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না সে। কাতর কণ্ঠে বলল, 'এসব কি ভাবছো তুমি মা? এই তো আমি তোমার রঘু।'

তরুবালার চোখের জল মুছে একটু থেমে বললেন, 'কুসুমকে তুই বিয়ে কর রঘু, আমি আর বাধা দেব না। কুসুমকে হারিয়ে কষ্টের যে দিনগুলি আমরা মা ছেলে মিলে কাটিয়েছিলাম তার কিছুটা হয়তো ফিরে পাব আমরা।'

কুসুম দরজায় দাঁড়িয়েই ছিল। এবার নিঃশব্দে এসে ঢুকল ঘরে। তরুবালা কুসুমকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কুসুমের উপর দিয়ে যে একটা ঝড় বয়ে গেছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কুসুম তরুবালার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। তরুবালা বুঝিয়ে কুসুমকে শান্ত করে বললেন, 'কেন কাঁদছিস কুসুম? রঘু তো তোকেই চাইছে, তোরা বিয়ে করে সুখি হয়ে যা।'

কুসুম অবাক হয়ে তাকাল তরুবালার দিকে। রঘু মিটমিট করে হাসছে তখন কুসুমের দিকে তাকিয়ে। তরুবালা কুসুমকে ডেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। কুসুমের মনে তখনও সাগরের জন্য মনটা বারবার কেঁদে উঠছিল। কিন্তু যতবার তরুবালার

কাছে সাগরের কথা বলতে চেয়েছে ততবারই তরুবালা অন্য প্রসঙ্গো চলে গেছেন। রঘুর সাফল্য, কলাবাগানের দুঃস্বপ্নের দিনগুলি থেকে কলিকাতার ঝা-চকচকে জীবন সবই এলো ঘুরেফিরে। কুসুম গল্প করতে করতে ডুবে যাচ্ছিল বারবার নতুন জীবনের মধুর আলিঙ্গানে। কুসুম আবার ডুবে গেল এখানে। তরুবালা কুসুমকে বারবার বোঝাতে লাগলেন রঘুকে বিয়ে করে কুসুম যেন চলে যায় কলিকাতায়।

রঘুর হঠাৎ মনে পড়ল আইচুকতির কথা। কোথায় আছে আইচুকতি কে জানে। যদি আবার ফিরে আসে সে রঘুর কাছে, আর এসে দেখে কুসুম দখল করে নিয়েছে তার সবকিছু। তখন কি বলবে রঘু আইচুকতিকে? কিন্তু রঘুই বা কি করতে পারতো? কেন আইচুকতি হারিয়ে যায় আর কুসুম ফিরে এলো তার কাছে। সে ভাবল এটাই হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা তাই ঘুরে ফিরে কুসুম চলে আসে তার জীবনে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথেই চেনা পরিচিত লোকেরা আসতে লাগলেন। ঘরটায় এখন প্রচুর মানুষ। গৌরবাবুর স্ত্রী, মেয়ে, রসময় পাল, তার স্ত্রী ও বড় দুই মেয়ে এবং তাদের প্রতিবেশীরা রঘুকে দেখতে এসে উপস্থিত হল এই বাড়িতে। গৌরবাবু বরুণ আগেই এসেছে। তাছাড়াও পাড়ার কিছু লোক এতো লোক বাড়িতে দেখে এমনিতেই এলো। সবাই মিলে বাড়িতে হৈ চৈ জুড়ে দিল।

খোকা এল সবার পরে। খোকা এসেই চেঁচিয়ে ডাকল, 'রঘু -রঘু - দেখ কে এসেছে? এই রঘু -।'

খোকার চিৎকার শুনে রঘু সহ বাড়ির সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এলো। খোকা ঠিকই বলছে কেউ একজন এসেছে বটে, যে খোকার পেছেনে লুকিয়ে রয়েছে। রঘু আন্দাজ করার চেষ্টা করল কে হতে পারে? তবে নির্ঘাৎ মেয়ে, কারণ তার শাড়ির আঁচল চোখে পড়ছে। কিন্তু কে সে? রেণু নয়তো? সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। খোকা হঠাৎ সামনে থেকে সরে গিয়ে বলল, 'এই দেখ চিনতে পারিস কিনা?'

রঘু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে। এতো আইচুকতি মুচকি হেসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুটা নার্ভাস দেখালেও এই আইচুকতি সেই পাহাড়ি চঞ্চল মেয়েটার থেকে অনেক বেশি আধুনিকা। তার পোশাক সাজ সজ্জায় পাহাড়ের ছোঁয়া নেই বললেই চলে। তবে সে আগের মতোই নজরকাড়া সুন্দরী। সবাই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তখনি আইচুকতির চোখের কালো উজ্জ্বল তারাগুলি চিকমিক করে ফুটিয়ে তাকাল রঘুর দিকে।

'ছোট মাজন আমাকে চিনতে পেরেছো?'

অস্ফূট স্বরে নিজের মনেই যেন বলল রঘু - 'আইচুক!'

তারপর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। হাজারো চম্‌প্রেঙের শব্দ যেন বেজে উঠল তার মনের মধ্যে। কুথ্‌ইমনিরগখুমের বুনো গন্ধ, অজস্র ঝর্ণার জল কল কল শব্দে চারিদিক মুখরিত করে তুলল। পাহাড়ের সমস্ত পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গেল মেঘের আড়ালে। জঙ্গালের সমস্ত প্রাণী আনন্দে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে

ছুটে যেতে লাগল। মন মাতানো পাহাড়িয়া আকাশ বাতাস যেন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল রঘুকে। এই জীবনে কেউ কোন কথা রাখেনি, সবাই ছেড়ে চলে গেছে তাকে এক এক করে। শুধু আইচুকতিই হারিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছে আবার রঘুর কাছে।

আইচুকতি আবিষ্কারের আনন্দে গৌরবাবু, বরুণ, খোকা সবাই হৈ হৈ করে উঠল। এতো লোকের সামনে আচমকা জড়িয়ে ধরায় আইচুকতির ফর্সা গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। অনেকে কিছু বুঝতে না পেরে আইচুকতিকে দেখতে ভিড় জমে গেল।

এদিকে বারান্দার এক কোণে তখন একা দাঁড়িয়ে আছে কুসুম। বিস্মিত নয়নে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে আইচুকতি ও রঘুর দিকে। হাজার হাজার ধলাইয়ের স্রোত প্রবল আক্রোশে তখন যেন আছড়ে পড়ছে কুসুমের বুকে। এক অদ্ভুত তুফানের ভয়ঙ্কর আওয়াজ চারিদিক তছনছ করে তার দিকেই যেন ধেয়ে আসছে, বারবার বিপর্যস্ত করে দিতে লাগল তাকে। কুসুম তাকিয়ে দেখে তার পাশে আর কেউ নেই, তাকে নিয়ে কোন আগ্রহও কারও নেই। উঠোনের ওই প্রান্ত থেকে বারান্দাটা যেন শত যোজন দুরে। কুসুমের চোখের সামনেই এতো কিছু ঘটে যাচ্ছে তাও সে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। সে যেন এক অসহায় চোরাবলির নিষ্ঠুর টানে অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছিল।

উঠেনের দুই প্রান্ত যেন দুটি ভিন্ন জগৎ। সবাই ছুটে গেছে আইচুকতিকে দেখতে। উদাস চোখে দুরে বহুদুরে তাকাল কুসুম। তার পাশে সত্যিই এখন আর কেউ নেই। কখন মেয়ের খোঁজে সরোজিনী এখানে এসেছিলেন কে জানে? তার ডাকে কুসুম যেন নিজেকে ফিরে পেল, 'চল্ কুসুম বাড়ি যাই।'

দুজনে নীরবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। একবার, শুধু একবার কুসুম ফিরে তাকাল স্বপ্নের মানুষটির দিকে। কিন্তু সে তখন এতোই ব্যস্ত তার দিকে ফিরে তাকানের ফুসরৎ তার নেই। কেন এমন হয়? কেন বারবার রঘুকে কাছে পেয়ে হারিয়ে ফেলে কুসুম। আজ আর কি নিয়ে ফিরে যাবে সে ঘরে। স্বামী কলঙ্ক গায়ে লেপে দিয়ে রাগ করে চলে গেছে। ফেরার রাস্তা খোলা রেখেছে কি না কে জানে? আর সন্তান, তাকেও বুকের পাশে জড়িয়ে ধরতে পারবে না কুসুম। সব হারিয়ে সরোজিনীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কুসুম। সরোজিনী আজ আর ভর্ৎসনা, গঞ্জনা কিছুই করলেন না।

কুসুমের দুচোখ বেয়ে সামান্য জলের ধারা বয়ে গেলেও তেমনভাবে কাঁদতে আজ আর ইচ্ছে হল না তার। যা হওয়ার তা হয়তো ভালই হয়েছে। উথাল পাতাল করা নদীতে তখন ভেসে চলেছে তার টলমল করা ছোট্ট ডিঙা। মধ্যগগনের সূর্যও উদাস চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।□